

স্বাস্থ্য ব্যবসায়ী ও সাম্রাজ্য

গণ স্বাস্থ্য সংকলন

স্বাস্থ্য ব্যবসায়ী ও সাম্রাজ্য

গণস্বাস্থ্য সংকলন-২

সম্পাদনা

জনবিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য তথ্যকেন্দ্র

বাউলমন প্রকাশন

২৮, বালিগঞ্জ গার্ডেন্স

কলিকাতা-৭০০০১৯

প্রকাশক
দেবব্রত ভট্টাচার্য
বাউলমন প্রকাশন
২৮, বালিগঞ্জ গার্ডেন্স
কলিকাতা-৭০০০১৯

প্রথম প্রকাশ : ১৫ই আগস্ট ১৯৮৭
প্রচ্ছদ : সমীর ঘোষ

মুদ্রণ :
লিপিমালী
টি. ঘোষ
২জি, নীলমণি মিত্র রো
কলিকাতা-৭০০০০২

মূল্য : ১৮ টাকা

সংকলনটি সম্বন্ধে দু-চার কথা

বাঙলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'মাসিক গণস্বাস্থ্য' পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি নিয়ে এ সংকলন। এ সংকলনটির নাম 'গণস্বাস্থ্য সংকলন' না রেখে 'স্বাস্থ্য ব্যবসায়ী ও সাম্রাজ্য' রাখা হল। এ নামটি রাখার উদ্দেশ্য বইটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে পাঠকদের একটু আভাস দেওয়া।

মার্কীণ সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে বহুজাতিক সংস্থাগুলি তৃতীয় বিশ্বকে লুণ্ঠনের জন্য যে কোনো রকম ধূর্ততা, প্রবঞ্চনা, ছল চাতুরী মিথ্যাচার, নির্বিচারে হত্যা সব কিছুই চালিয়ে যাচ্ছে অবলীলাক্রমে। এ লুণ্ঠনের সাকরেদ হিসেবে এদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করে চলেছে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দালাল পুঁজি।

মানুষের সব চাইতে বড় সম্পদ তার স্বাস্থ্য। সেখানেও এদের দাঁত নখের আক্রমণ অব্যাহত। 'গণস্বাস্থ্য সংকলন-১' বইটিতে বহু বিষয়ে এই সব লুঠেরাদের মুখোশ খুলে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় সংকলনটির উদ্দেশ্যও তাই।

এই সব স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীরা আধুনিক বিজ্ঞাপনের দৌলতে সাদাকে কালো, বিষকে অমৃত বলে চালাতে চাইছে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলিতে। মাসিক গণস্বাস্থ্য থেকে নেওয়া প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে দেখান হয়েছে এই সব তথাকথিত দরদীদের মুখোশের আড়ালে রয়েছে হিংস্র দাঁত নখ।

আমাদের আশা প্রথম সংকলনটির মতে দ্বিতীয়টিও পাঠক সাধারণের কাছে সমাদৃত হবে।

দেবব্রত ভট্টাচার্য

বিষয় সূচী

সুর্মার চোখে

সুর্মা বাংলাদেশে মেয়েদের সাজবার এক পরিচিত উপাদান। দীর্ঘদিন ধরে এদেশের মুসলমান সম্প্রদায় এটি ব্যবহার করে আসছেন। কিন্তু বর্তমানে এর সাথে সীসা মেশানোর ফলে সুর্মা থেকে মানুষের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

এটি এক ধরনের সূক্ষ্ম চূর্ণ এবং চোখের পাতায় লাগানো হয়ে থাকে। এন্টিমনির উর্দু প্রতিশব্দ সুর্মা। কারণ প্রাথমিক ব্যবহারের সময় সুর্মার মূল উপাদান ছিল এন্টিমনি সালফাইড। কিন্তু প্রাচ্য ফার্মাকোপিয়ায় এর সাথে দস্তা এবং সীসারও উল্লেখ আছে। বর্তমানে এন্টিমনি সালফাইডের অভাবহেতু তার বদলে লেড (সীসা) সালফাইড ব্যবহার করা হচ্ছে।

১৯৮৬ সালে ওয়ালী ও তার সঙ্গীরা একজন এশিয়ান শিশুর লেড এনসে-থালোপ্যাথির কথা উল্লেখ করেন যার সীসার একমাত্র উৎস ছিল সুর্মা ব্যবহার। তারা সন্দেহ করেন যে চোখে সুর্মা ব্যবহার সীসা-বিষক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। তাদের এই সন্দেহের ফলে বিলাতের হোম অফিস থেকে সুর্মা ব্যবহারের বিরুদ্ধে সতর্কতার বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। পাঁচ বছর পর স্নোড গ্রাস ও তার সঙ্গীরা পাঁচটি পরিবারে ১২টি শিশুর রক্তে সীসার পরিমাণ অত্যন্ত বেশী দেখতে পান। এক্ষেত্রেও সুর্মা ব্যবহারকে দায়ী করা হয়। বার্মিংহামের বিভিন্ন হাসপাতালে সীসাঘটিত বিষক্রিয়া নিয়ে ভর্তি হওয়া ৩৮ জন শিশুর ক্ষেত্রে বেট্স ও তার সঙ্গীরা লক্ষ্য করেন, এদের মধ্যে ১৫ জন এশিয়ান। তারাও সুর্মাকেই বিষক্রিয়ার প্রধান উৎস হিসাবে চিহ্নিত করেন। কয়েক বছর পর জোসেপস লুটোনস্থ এশিয়ান শিশুদের রক্তে বেশী মাত্রায় সীসা দেখেন। এক্ষেত্রে অবশ্য সীসার উৎস নিরূপণ করা হয়নি।

উলফত আর. আলী এবং তার সঙ্গীরা ১৯৭৮ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর সংখ্যা বৃটিশ মেডিক্যাল জার্নালে সুর্মা সম্পর্কিত তাদের গবেষণার ফলাফল বিবৃত করেন।

তারা ৪ মাস সময়ের ব্যবধানে নটিংহ্যাম শিশু হাসপাতালে মোট ৬২ জন এশিয়ান শিশুর রক্ত পরীক্ষা করে দেখেন। এরা কোনো না কোনো চিকিৎসার কারণে রক্ত পরীক্ষা করতে এসেছিল। শিরা থেকে রক্ত নেয়া হয়েছিল। এটোমিক এবজরপশন স্পেক-ট্রোফোটোমেট্রি পদ্ধতিতে ১—২ মিলিলিটার রক্ত থেকে সীসার ঘনত্ব মাপা হয়। আত্মীয়-স্বজনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল তারা এইসব ছেলেমেয়েদের চোখে কখনো সুর্মা দিয়েছেন কিনা। আর যদি দিয়ে থাকেন তবে কেন দিয়েছেন। কোথা থেকে তারা সুর্মা পেয়েছেন তাও জানতে চাওয়া হয়েছিল।

পরীক্ষাধীন এসব শিশুদের মধ্যে ২৫ জন তাদের এবং অভিভাবকদের বক্তব্য অনুযায়ী কখনো সুর্মা ব্যবহার করেনি। এদের তাই নিয়ন্ত্রণ (কন্ট্রোল) দলে ফেলা হয়েছে। বাদবাকী ৩৭ জন কখনো না কখনো চোখে সুর্মা ব্যবহার করেছে। কেউ কেউ দিনে ২-৩ বার দেয়। অন্যরা শুধু বিশেষ অনুষ্ঠান বা উৎসবের সময় চোখে সুর্মা লাগায়। নিয়ন্ত্রণ দলেরও কোনো কোনো শিশু অনেক সময় হয়তো সুর্মা ব্যবহার করেছে কিন্তু তাদের পিতামাতা তা স্বীকার করতে চায়নি। যখনি সম্ভব হয়েছে এই পরীক্ষকরা সুর্মার নমুনা সংগ্রহ করেছেন এবং এটোমিক এবজরপশন স্পেকট্রোফটোমেট্রি ও এক্স-রে ডিফ্রাকশন পদ্ধতিতে সেসব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৩৭ জন শিশুর মধ্যে ১৫ জনের ক্ষেত্রে পিতামাতার স্পষ্ট করে বলতে পারেননি কেন তারা সুর্মা ব্যবহার করেন। অনেকে বলেছেন তারা শুধু প্রচলিত নিয়ম রক্ষার্থে করে এসেছেন। ১৩ জনের ক্ষেত্রে পিতামাতারা বলেছেন যে তারা স্বাস্থ্যবিধি পালনের উপায় হিসেবে অথবা চোখের যন্ত্রণা ব্যথা বা ঘা কমানোর উদ্দেশ্যে সুর্মা ব্যবহার করেছেন। একজন শুধু দৃষ্টি শক্তির প্রখরতা বাড়ানোর আশায় সুর্মা ব্যবহার করার কথা স্বীকার করেছেন। নয়টি পরিবারের ছেলেমেয়েদের শ্রীবৃদ্ধির উপাদান হিসেবে সুর্মা ব্যবহার করা হয়েছে।

একবার তারা বৃটেনেই সুর্মা পেয়েছিলেন। এই নমুনার বিশ্লেষণে ৮৬%ভাগ লেড সালফাইড পাওয়া গেছে। একুশটি পরিবার হয় নিজেরা বা বন্ধু-বান্ধবদের মাধ্যমে বিদেশ থেকে সুর্মা পেয়েছেন। দুটি পরিবার একজন হেকিমের কাছ থেকে সুর্মা নিয়েছেন—যিনি এই সুর্মা সরাসরি পাকিস্তান থেকে পেয়েছেন। ১৪টি পরিবার তাদের সুর্মার উৎস সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলতে পারেন না।

তারা ২৯টি বিভিন্ন ধরনের নমুনা বিশ্লেষণ করেন। সাদা সুর্মার যে ছয়টি নমুনা পাওয়া গিয়েছিল তাতে খুব সামান্য সীসা অথবা কোনো সীসাই ছিল না। ১৮টি ধুসর রংয়ের নমুনায় খুব বেশী সীসা ছিল। এর মধ্যে ১৪টিতে ৮০%-এরও বেশী এবং ৩টি নমুনায় ৭৫-৮০% সীসা লেড-সালফাইড হিসেবে ছিল। উল্লেখ্য যে গ্যালেনা বা মূল যে আকরিক থেকে সীসা সংগৃহীত হয় তাতে সালফাইড আকারে সীসার পরিমাণ থাকে ৮৬-৬% (উজ্জ্বল ধুসর নীল বর্ণের স্ফটিকরূপী এই খনিজে অনেক সময় রূপা, তামা, দস্তা বা অন্যান্য মূল পদার্থও থাকে)। ৫টি কালো রংয়ের নমুনায় সীসার পরিমাণ ১২-৩২% পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

বেশ কয়েকটি নমুনায় অশ্রুবর্দ্ধক উপাদান মেনথল বা অনুরূপ রাসায়নিক ছিল। অনেক শিশুই এর ফলে সুর্মা লাগানোর সময় অত্যধিক অশ্রু সৃষ্টি হওয়ায় চোখ ঘষেছে। যে ২৫ জন শিশু সুর্মা দেয়নি বলে মনে করা হয়েছিল, তাদের রক্তে সীসার ঘনত্ব ছিল ০.৯৮ + এস ডি ০.৪২ মাইক্রোমোল/১ (২০.৩ + ৮.৭ মাইক্রো গ্রাম/- ১০০ মিলিলিটার)। যে ৩৭ জন শিশু সুর্মা ব্যবহার করেছে তার কিছু কিছুতে হয়ত সীসা ছিল না এবং রক্তে গড় ঘনত্ব ছিল ১.৬৫ + ০.৬৮ মাইক্রো মোল/১ (৩৪.২ + ১৪.১ মাইক্রো গ্রাম/- ১০০ মিলিলিটার)। পরিসংখ্যানগত দিক থেকে

এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য পি < ০·০০১) গুরুত্বপূর্ণ। কারও রক্তে সীসার ঘনত্ব ১·৮ মাইক্রোমোল/১ (৩৭·৩ মাইক্রোগ্রাম/১০০মিলিলিটার-এর বেশী হলে চিন্তার বিষয় বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। ৩৭ জন সুর্মা গ্রহণকারীর মধ্যে ৫ জনের রক্তে সীসার ঘনত্ব ছিল ২·৪ মাইক্রো মোল/১ (৪৯·৭ মাইক্রো গ্রাম/১০০ মিলিলিটার) বা তারচেয়েও বেশী। কিন্তু কেউই অবশ্য সীসাঘটিত বিষক্রিয়ার শিকার হয়নি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে ৬২ জন অনির্ধারিত এশিয়ান শিশুদের মধ্যে ৩৭ জন অর্থাৎ ৬০% সুর্মা ব্যবহার করেছে। ৩৭ জনের মধ্যে ২৯ জনের পিতামাতাই আগে পাঞ্জাবের অধিবাসী ছিল।

এই সমীক্ষা থেকে একটা কথা স্পষ্ট বলে প্রমাণিত হয় যে সুর্মা ব্যবহার ও রক্তে সীসার ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ার মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। কনজাংটিভা থেকে যদিও সরাসরি সীসা শরীরে প্রবেশ করতে পারে কিন্তু তার সাথে বেশী করে চোখের পানি তৈরী হওয়া, চোখ ঘষা এবং সেই আংগুল চোষার ব্যাপারটি শরীরে সুর্মা ঘটিত সীসা প্রবেশের মূল পথ বলে মনে করা যেতে পারে।

এই পরীক্ষা চলাকালীন ওল্ডহ্যামে ৪ বছর বয়সী এক এশিয়ান শিশু লেড-এনসেফালোপ্যাথী হয়ে মারা যায়।

১৯৭৬ সালে প্রসাধন সামগ্রী সংক্রান্ত এক ই-ই-সি ডিরেকটিভে (কাউন্সিল ডিরেক্টিভ নং ৭৬/৭৬৮/ ই. ই. বি.) সকল সদস্য দেশকে সীসা ও অন্যান্য তালিকাভুক্ত রসায়নসমৃদ্ধ সামগ্রীর বিপণন নিষিদ্ধ করতে বলা হয়। এই অনুরোধের প্রতি সাড়া দিয়ে ১৯৭৮ সালে বৃটেন কসমেটিক প্রোডাক্টস রেগুলেশন জারী করে। ১৯৬১ সালের কনজ্যুমার প্রোটেকশন এ্যাক্ট এবং ১৯৭২ সালের ইউরোপীয়ান কম্যুনিটিস এ্যাক্টের অধীনে এই রেগুলেশন অনুযায়ী স্বাভাবিক নিয়মে ব্যবহার করার পর কোনো প্রসাধন সামগ্রী মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারবে না। ১৯৭৯ সালের পহেলা জানুয়ারী থেকে বৃটেনে সুর্মা এবং অন্যান্য সীসাসমৃদ্ধ প্রসাধন সামগ্রী নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়।

আরেকটি ই-ই-সি ডিরেকটিভ অনুযায়ী (কাউন্সিল ডিরেকটিভ নং ৭/৩১২, ই-ই-সি) কোনো সদস্য দেশে পরীক্ষাধীন জনসংখ্যার ২% এর বেশীর ক্ষেত্রে যদি রক্তে সীসার ঘনত্ব ৩৫ মাইক্রোগ্রাম/ডি এল-এর অধিক হয় তবে সেখানে সীসার উৎস বার করার উদ্দেশ্যে অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নটিংহ্যাম সুর্মা ব্যবহারকারী ১৬% ভাগেরও বেশী শিশুর রক্তে সীসার ঘনত্ব এর চেয়ে অধিক ছিল।

তবে বৃটিশ হোম অফিস এবং ই-ই-সি আইন পুরোপুরি প্রতিপালিত হবে কিনা সে ব্যাপারে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবহারকারীরা বন্ধু-বান্ধব কিংবা হেকিমদের মাধ্যমে সুর্মা সংগ্রহ করেছে।

ঢাকার একটি প্রখ্যাত মাদ্রাসার সেক্রেটারী বাক্স খুলে একটা ছোট্ট শিশি বার করে আনলেন। কাঁচের সেই শিশি সুর্মায় ভর্তি। সুর্মা লাগাবার একটি ছোট্ট কাঠিও সাথে ছিল। চোখের সামনে তুলে ধরে বললেন : দেখেন দেখি এই জিনিস বাংলাদেশের

কোথাও পাওয়া যায় নাকি? পাবেন না, কোথাও পাবেন না। আমি সেবার হজ্জ করতে গিয়ে মক্কা শরীফ থেকে কিনে এনেছি। একেবারে আসল জিনিস। আসল জিনিষটা আবার কি? একগাল হেসে জানালেন এটা হচ্ছে কোহে তুরের সুর্মা। কোহে তুর? কোহে তুর জানেন না, তুর পাহাড়। শোনেন তাহলে। হজরত মুসা (আঃ) ছিলেন আল্লাহ পাকের পেয়ারা বন্ধু। তাঁর একবার সাধ হল আল্লাহতালাকে দেখবেন। তাঁর ইচ্ছার কথা জানালেন। কিন্তু তিনি শুনে মানা করলেন, হে মুসা, তুমি আমাকে দেখতে চেয়ো না। কিন্তু হজরত মুসা (আঃ) নাছোরবান্দা। তিনি দেখবেনই। আল্লাহতালা আর কি করেন। ঠিক করলেন তুর পাহাড়ে দেখা দেবেন। হজরত মুসা সেইভাবে সেখানে পেঁছিলেন। কিন্তু আল্লাহতালাকে দেখবেন কি, তাঁর জ্যোতিতে কোহে তুর পাহাড় জ্বলেপুড়ে ছাই। পাথরের ঐ বিরাট পাহাড় চোখের নিমেষে কালো হয়ে গেল। তখন আল্লাহতালা তুর পাহাড়কে বললেন, আমার জ্যোতিষ্ক ধারণ করে তুমি পুড়ে গেলেও আমি নির্দেশ দিচ্ছি তোমার এই ছাই যে লোক চোখে দেবে তার চোখের জ্যোতি বাড়বে, চোখে কোনো কষ্ট থাকবে না, রোগ হবে না। সেই থেকে সব মুসলমান সুর্মা ব্যবহার করে আসছে।

দীর্ঘদিন, মানে, ঠিক কবে থেকে তিনি সুর্মা ব্যবহার করছেন তা তিনি জানেন না, তবে আসল সুর্মা লাগালে চোখ ঠাণ্ডা থাকে, রোগ বালাই হয় না এ ব্যাপারে নিশ্চিত।

চকবাজারের বিশিষ্ট জুতো ব্যবসায়ী জনাব নাসির উদ্দিনের সাথে কথা হচ্ছিল। ছেলেবেলার স্মৃতি রোমন্থন করে বললেন, সেই ছোটবেলায় ঈদের নামাজে যাবার আগে বা মিলাদের সময় আব্বা নিজের হাতে সুর্মা লাগিয়ে দিতেন। তারপর থেকে এখন পর্যন্ত ধর্মীয় কোনো অনুষ্ঠান হলে সুর্মা লাগাই। এটা কি ধর্মীয় কোনো অনুশাসন? না, ধর্মের কোথাও সুর্মা ব্যবহারের কথা উল্লেখ নেই তবে পবিত্র দিনে পবিত্র জিনিস ব্যবহার করা ভাল। চোখের কোনো অসুবিধা হলে সুর্মায় কি কোনো উপকার পাওয়া যায়? এ প্রশ্ন শুনে তিনি খানিকটা ভেবে বললেন, এমনিতে আমার চোখের কোনো অসুবিধা নেই তবে মাঝে-মধ্যে হঠাৎ করে চোখ চুলকায়, লাল হয়, চোখ জ্বালা করে। কয়েকবার সুর্মা ব্যবহার করে ফল পেয়েছি, তবে সব ক্ষেত্রে নয়। একবার তো ডাক্তার দেখাতে হয়েছে।

বাসাবো এলাকায় থাকেন বিবি তহুরন। তিনি সুর্মা নিয়মিত ব্যবহার করেন। চোখের সৌন্দর্য তো বটেই শুনেছেন চোখের কোনো রোগ হয় না সুর্মা ব্যবহারে। তিনি নিজে তো ব্যবহার করছেনই, তার ছেলেমেয়েদেরকেও করান। তবে ক্ষোভের সঙ্গে বললেন যে, ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে তারা আর সুর্মা ব্যবহার করতে চায় না।

চোখের রোগবালাই কি সুর্মা ব্যবহারে যায়, আপনার কি কখনো এমন হয়েছে বা বাড়ীর কেউ উপকার পেয়েছে? খানিকটা ভেবে তিনি বললেন, অনেক সময়

উপকার পেয়েছি, আবার অনেক সময় ডাক্তারের কাছে যেতে হয়েছে। সেই যে একবার স্বাধীনতার পর ঘরে ঘরে চোখ উঠলো, সেবার সুর্মার কোনো কাজ হলো না।

পুরনো ঢাকায় সুর্মা ব্যবহারে চলটা নতুন ঢাকার তুলনায় বেশী। কারণ সুর্মার একটা বনেদীপনা আছে, পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে আর সব আভিজাত্যের সাথে এটিও পাওয়া। আর আছে একটা বিশ্বাস।

সুর্মা ঢাকার বাজারে তিন রকম পাওয়া যায়—দলা, গুড়া, আর প্লাস্টিকের ছোট কৌটোয় বা কাঁচের শিশিতে। দামেরও রকমফের আছে। দলাটা ভরি বা তোলা হিসাবে বিক্রি হয়। বাজারদর এক রকম থাকে না। ওঠানামা করে আর সব জিনিসের মত। যখন বাইরে থেকে 'চালান' (আমদানী) বেড়ে যায় তখন দাম কমে ভরি প্রতি ৪ টাকায় আসে। এই প্রতিবেদন লেখার সময় দলা আকারে এক ভরি সুর্মার দাম ছিল আট টাকা, গুড়াও একই দাম। প্লাস্টিকের বাহারের কৌটার দাম প্রতিটি পাঁচ টাকা আর কাঁচের শিশির দাম এক টাকা।

সুর্মা বাংলাদেশে হয় না বাইরে থেকে আসে। এর কোনো আমদানী নেই, ওয়েজ আর্নিং-এও নেই। বিদেশে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে গেলে সদাশয় ব্যক্তিরা কিছু কিছু নিয়ে আসেন। তারা দলার আকারের সুর্মাই আনেন।

আনার দলে হাজীরাই বেশী। দোকানদাররা সাধারণতঃ তাদের কাছে থেকে কিনেই সারা বছর ব্যবসা করেন।

বাংলাদেশে সুর্মার বিক্রি সব চাইতে বেশী হয় রমজানের ঈদের আগে।

দোকানীরা সারা বছরের ব্যবসা ঐ একটি মাসেই করে থাকেন। তারা বিক্রির যে হিসাব দিলেন তা কোনো ক্রমেই গ্রহণযোগ্য না হলেও, বিভিন্ন দোকানীর কথায় বোঝা গেল সারা বছর এক একজন ২৫/৩০ সেরের কম সুর্মা কেনাবেচা করেন না। অবশ্য দোকান ভেদে এর তারতম্য ঘটে।

ঢাকায় যেমন বিক্রি, মফস্বলেও খারাপ বিক্রি না। বিশেষ করে পাইকাররা যেমন খরিদ করে তাতে বোঝা যায় সুর্মা মফস্বলে চলে ভালো। এযাবৎ সুর্মার ব্যবহার-কারীদের ওপর কোনো জরিপ চালানো হয় নি বলে কোনো হিসাবই দেওয়া সম্ভব নয়। তবে একথা নির্দিধায় বলা যায় যে পালাপার্বণে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে সুর্মা ব্যবহার-কারীদের সংখ্যাই বেশী তারপরই গৃহিণীরা। বাহারের নক্সা করা সুর্মাদান মহিলা-মহলের সুর্মা প্রীতিরই পরিচায়ক।

বাংলাদেশে সেই কবে থেকে এর ব্যবহার শুরু, ইতিহাসে কোথাও এর উল্লেখ নেই। তবে একথা ঠিক যে এই উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমনের সাথে সাথে সুর্মাও এদেশে আসে এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে প্রথমে রাজ-অন্তঃপুর তারপর পাত্রমিত্র-অমাত্য এবং সবশেষে প্রজাদের অন্দরে সুর্মা চলে আসে। অভিজাত পরিবারের সদস্যরাই বাংলাদেশে এর ব্যবহার শুরু করেন। সেই থেকে আজো চলে আসছে।

সুর্মা ব্যবহার এদেশে ধর্মীয় অনুভূতির সাথে জড়িত। তারপর অনেকেই খান্দানী

আভিজাত্যের প্রতীক হিসাবে এটা ব্যবহার করেন। এছাড়া চোখের যত্ন নেয়ার জন্যও অনেকে ব্যবহার করে থাকেন।

ঢাকায় কয়েকটি সুর্মার কারখানা আছে। তারা সুর্মা বানায়। বলাবাহুল্য সেই সুর্মায় চোখের ক্ষতিই করে। দামে সস্তা বলে ব্যবহার বেশী। এগুলি কুটির শিল্প হিসেবে বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকার জন্য সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা যায় নি।

সুর্মায় চোখ সুন্দর দেখায়। কবিরাও কবিতার চরণে সুর্মা এনেছেন। নয়নাঞ্জন হিসেবে কেউ কেউ ম্যাক্স ফ্যাক্টরের সাথে মাঝে মধ্যে সখ করে সুর্মা লাগিয়ে থাকেন। তবে সুর্মা সৌন্দর্যের উপকরণ হিসাবে এখন আর পুরোপুরি চালু নয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১, বৃটিশ মেডিক্যাল জার্নাল
৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ পৃষ্ঠা, ৯১৫-৯১৬, উলফত আর. আলী. অলিভার আর. সি. স্ম্যালেস ও মোহাম্মদ আসলাম।

২. ল্যানসেট
৬ জানুয়ারী, ১৯৭৯ পৃ ২৮।

হাঁপানিতে যোগব্যায়াম বিজ্ঞানসম্মত

বিজ্ঞানে শেষ কথা বলে কিছু নেই। শেষ সত্য আবিষ্কারের চেষ্টাই বিজ্ঞান। এখানেই ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের তফাৎ। জিজ্ঞাসাই বিজ্ঞানের নিয়ম, প্রশ্নই বিজ্ঞানের প্রাণ। অপরপক্ষে বিনা প্রশ্নে আত্মসমর্পণই ধর্মের মূল কথা।

বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় চিকিৎসা বিজ্ঞানও অসম্পূর্ণ। বহু রোগের কারণ এবং চিকিৎসাও তাই চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের অজ্ঞাত। অধিকাংশ চিকিৎসা বিজ্ঞানী কেবলমাত্র এলোপ্যাথী বা পশ্চিমে উদ্ভব চিকিৎসা শাস্ত্রকে বিজ্ঞান বলে মনে করেন। তাদের মতে, বাকী সবই অপবিজ্ঞান। প্রাচ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রচলিত বহু চিকিৎসা ও ধ্যানধারণা আপাতদৃষ্টিতে বিজ্ঞানসম্মত নয় বলে, এ সবকে 'লোক বিশ্বাস' বলে অবহেলা, অবজ্ঞার একটা প্রবণতা পাশ্চাত্য দেশের অনেক বিজ্ঞানীদের মধ্যে রয়েছে। তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতার কারণে ইদানীং বিজ্ঞানীরা এসব 'লোক বিশ্বাস'কে বিজ্ঞানের নিক্তিতে পরীক্ষায় সচেষ্ট হয়েছেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে বহু রোগ আছে (যেমন বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার) যার কারণ এখনও সঠিকভাবে নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। অপরপক্ষে এমন বহুরোগ রয়েছে কার্যকারণের প্রক্রিয়া নির্ধারিত হয়েছে কিন্তু চিকিৎসা সঠিকভাবে নিরূপিত হয়নি, এমন একটি রোগ হাঁপানি।

হঠাৎ কারণে অকারণে দিনে বা রাতে শীতে বা গ্রীষ্মে শ্বাসকষ্ট, কাশতে কাশতে শ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম, বুকে ঘর ঘর শব্দ এবং ভয়ানক কাশিই হাঁপানির উপসর্গ। একবার যিনি হাঁপানি রোগী পর্যবেক্ষণ করেছেন তাকে পুনরায় হাঁপানি রোগ চিনিয়ে দেবার প্রয়োজন হয় না। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল ব্যক্তিরও হাঁপানি হয়।

শিশু বয়সেই সাধারণত হাঁপানি শুরু। অন্য বয়সে শুরু হবার ঘটনা কম হলেও ব্যতিক্রম নয়। শিশু বয়সে প্রথম আক্রমণ হলেও এই রোগের পরিপূর্ণতা লাভ হয় প্রায়শঃ প্রাপ্ত বয়সে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাত বছর বয়সে হাঁপানি রোগ প্রথম দেখা যায়। তবে জন্মের প্রথম কয়েক সপ্তাহের মধ্যে হাঁপানির আক্রমণ আশ্চর্যজনক কোনো ঘটনা নয়। যুবা বয়স উত্তীর্ণ হবার পূর্বে, সাধারণত ছেলেরা মেয়েদের তুলনায় দ্বিগুণভাবে আক্রান্ত হয়। ধারণা করা হয় যে, বর্তমানে পৃথিবীতে শতকরা তিনভাগ (৩%) লোক হাঁপানিতে আক্রান্ত। তবে বহু বিশেষজ্ঞের মতে হাঁপানি রোগীর সংখ্যা ৫%-এর অধিক বই কম হবে না।

আভিজাত্যের প্রতীক হিসাবে এটা ব্যবহার করেন। এছাড়া চোখের যত্ন নেয়ার জন্যও অনেকে ব্যবহার করে থাকেন।

ঢাকার কয়েকটি সুর্মার কারখানা আছে। তারা সুর্মা বানায়। বলাবাহুল্য সেই সুর্মায় চোখের ক্ষতিই করে। দামে সস্তা বলে ব্যবহার বেশী। এগুলি কুটির শিল্প হিসেবে বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকার জন্য সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা যায় নি।

সুর্মায় চোখ সুন্দর দেখায়। কবিরাও কবিতার চরণে সুর্মা এনেছেন। নয়নাঞ্জন হিসেবে কেউ কেউ ম্যাক্স ফ্যাক্টরের সাথে মাঝে মধ্যে সখ করে সুর্মা লাগিয়ে থাকেন। তবে সুর্মা সৌন্দর্যের উপকরণ হিসাবে এখন আর পুরোপুরি চালু নয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১. বৃটিশ মেডিক্যাল জার্নাল
৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ পৃষ্ঠা, ৯১৫-৯১৬, উলফত আর. আলী. অলিভার আর. সি. স্ম্যালেস ও মোহাম্মদ আসলাম।

২. ল্যানসেট
৬ জানুয়ারী, ১৯৭৯ পৃ ২৮।

হাঁপানিতে যোগব্যায়াম বিজ্ঞানসম্মত

বিজ্ঞানে শেষ কথা বলে কিছু নেই। শেষ সত্য আবিষ্কারের চেষ্টাই বিজ্ঞান। এখানেই ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের তফাৎ। জিজ্ঞাসাই বিজ্ঞানের নিয়ম, প্রশ্নই বিজ্ঞানের প্রাণ। অপরপক্ষে বিনা প্রশ্নে আত্মসমর্পণই ধর্মের মূল কথা।

বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় চিকিৎসা বিজ্ঞানও অসম্পূর্ণ। বহু রোগের কারণ এবং চিকিৎসাও তাই চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের অজ্ঞাত। অধিকাংশ চিকিৎসা বিজ্ঞানী কেবলমাত্র এলোপ্যাথী বা পশ্চিমে উদ্ভব চিকিৎসা শাস্ত্রকে বিজ্ঞান বলে মনে করেন। তাদের মতে, বাকী সবই অপবিজ্ঞান। প্রাচ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রচলিত বহু চিকিৎসা ও ধ্যানধারণা আপাতদৃষ্টিতে বিজ্ঞানসম্মত নয় বলে, এ সবকে 'লোক বিশ্বাস' বলে অবহেলা, অবজ্ঞার একটা প্রবণতা পাশ্চাত্য দেশের অনেক বিজ্ঞানীদের মধ্যে রয়েছে। তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতার কারণে ইদানীং বিজ্ঞানীরা এসব 'লোক বিশ্বাস'কে বিজ্ঞানের নিক্তিতে পরীক্ষায় সচেষ্ট হয়েছেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে বহু রোগ আছে (যেমন বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার) যার কারণ এখনও সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। অপরপক্ষে এমন বহুরোগ রয়েছে কার্যকারণের প্রক্রিয়া নির্ধারিত হয়েছে কিন্তু চিকিৎসা সঠিকভাবে নিরূপিত হয়নি, এমন একটি রোগ হাঁপানি।

হঠাৎ কারণে অকারণে দিনে বা রাতে শীতে বা গ্রীষ্মে শ্বাসকষ্ট, কাশতে কাশতে শ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম, বুকে ঘর ঘর শব্দ এবং ভয়ানক কাশিই হাঁপানির উপসর্গ। একবার যিনি হাঁপানি রোগী পর্যবেক্ষণ করেছেন তাকে পুনরায় হাঁপানি রোগ চিনিয়ে দেবার প্রয়োজন হয় না। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল ব্যক্তিরও হাঁপানি হয়।

শিশু বয়সেই সাধারণত হাঁপানি শুরু। অন্য বয়সে শুরু হবার ঘটনা কম হলেও ব্যতিক্রম নয়। শিশু বয়সে প্রথম আক্রমণ হলেও এই রোগের পরিপূর্ণতা লাভ হয় প্রায়শঃ প্রাপ্ত বয়সে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাত বছর বয়সে হাঁপানি রোগ প্রথম দেখা যায়। তবে জন্মের প্রথম কয়েক সপ্তাহের মধ্যে হাঁপানির আক্রমণ আশ্চর্যজনক কোনো ঘটনা নয়। যুবা বয়স উত্তীর্ণ হবার পূর্বে, সাধারণত ছেলেরা মেয়েদের তুলনায় দ্বিগুণভাবে আক্রান্ত হয়। ধারণা করা হয় যে, বর্তমানে পৃথিবীতে শতকরা তিনভাগ (৩%) লোক হাঁপানিতে আক্রান্ত। তবে বহু বিশেষজ্ঞের মতে হাঁপানি রোগীর সংখ্যা ৫%-এর অধিক বই কম হবে না।

হাঁপানি হয় কেন?

শিশুদের হাঁপানি হবার প্রধান কারণ দূষিত পরিবেশ। বাড়ীর ধুলোবালি, কুকুর, বিড়াল, গরু এবং অন্যান্য প্রাণীর লালা ও লোমের সাথে সংস্পর্শ, পোকামাকড় ও বাড়ীর আঙ্গিনায় ছত্রাক এবং বিশেষ বিশেষ ঋতুতে ঘাস, আগাছা ও গাছপালায় অবস্থিত বায়ু বাহিত পরাগ (Pollen) সাধারণত হাঁপানির উত্তেজক হিসেবে কাজ করে থাকে। এগুলো সংবেদক, যা ইংরাজীতে Allergen বলে পরিচিত। এই এলারজেনই এলার্জী সৃষ্টি করে। এলার্জী ছাড়াও হাঁপানি সৃষ্টি হতে পারে। যে এলারজেন হাঁপানি সৃষ্টি করে, সেই এলারজেন প্রায়শ এলার্জীজনিত সর্দিও (Allergic Rhinitis) সৃষ্টি করে। কুশজ্বর-এ (Hay Fever) আক্রান্ত অধিকাংশ শিশু সত্তর হাঁপানিতে আক্রান্ত হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রের ভাইরাসজনিত প্রদাহ হাঁপানির অন্যতম কারণ। তবে ব্যাকটেরিয়া/জীবাণুজনিত প্রদাহ হাঁপানি সৃষ্টির সহায়ক কিনা এ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতদ্বৈততা আছে।

হাঁপানি সৃষ্টির অন্যান্য কারণসমূহ ঃ

হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তন

শহরের দূষিত পরিবেশ

কলকারখানা ও গাড়ীর ধূম্রজাল

ধূমপান

বিষাক্ত ধোঁয়া এমন কি রান্নাঘরের ধোঁয়াও

বার্ণিশ ও রঙ-এর গন্ধ

আইসোসায়ানাইটস ও অন্যান্য ধাতব ধোঁয়া

ব্যায়াম

খাদ্যদ্রব্য মিশ্রিত রঙ

কত্তক ওষুধ যথা এ্যাসপিরিন এবং নন স্টেরয়েডাল ওষুধসমূহ (NSAID) ডাইফ্লুনিজল, ফিনোপ্রফেন, ইবোপ্রফেন, নপরোক্সেন, পাইরোক্সিকাম (ফেলডিন) টলমেটিন মেকলোফিনামেট সোডিয়াম ইত্যাদি।

মূলতঃ, খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত এবং সময় বিশেষে ওষুধ সংরক্ষণেও ব্যবহৃত সালফাইটস (Sulfites) ননএটোপিক হাঁপানি সৃষ্টিতে সহায়তা করে। প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুর উত্তেজনার মাধ্যমে হৃদরোগ ও রক্তচাপ কমানোর বিটা এড্রেনার্জিক প্রতিরোধক ওষুধ (Beta Adrenergic Blocking Agent) প্রোপানলও (বাণিজ্যিক নাম ইনডেরাল) হাঁপানি সৃষ্টি করতে পারে।

মানসিক চাপ।

হাঁপানিতে কি হয়?

এ্যালারজেন, প্রদাহ, বিষাক্ত পরিবেশ, ঠান্ডা বাতাস বা অন্যান্য উত্তেজকের প্রতিক্রিয়া শ্বাসনালীর সংকোচন এবং মাত্রাতিরিক্ত শ্বাসরসের (Mucus) সৃষ্টিতে শ্বাস প্রত্যার্পণ

নালীতে (Expiratory Airway) বাধা সৃষ্টি হয় এবং তাতে বাতাস আটকে পড়ে। বাতাস নির্গমন পথ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে রোগী ঘন ঘন শ্বাস নিতে থাকে। এতে শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে জড়িত মাংসপেশীসমূহ ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং শ্বাসপ্রশ্বাস নালীর সাথে জড়িত এ্যাসিটাকোলিন হিস্টামিন, লিকোট্রিনস প্রভৃতি রাসায়নিক উত্তেজকের উৎপাদন ও প্রতিক্রিয়া বেড়ে যায়। অন্যদিকে বাতাসের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হওয়ায় রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায় এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়।

এ্যালার্জি জনিত হাঁপানিতে (যাকে Atopic বা Extrinsic Asthma বলা হয়) শ্বাসনালীর অভ্যন্তরস্থিত আবরণের (Bronchial Mucosa) স্পর্শকারতা কতকগুলো বিশেষ টিস্যু নির্বাচিত এন্টিবডির কারণে হয়ে থাকে এবং রক্তে ইমমুনোগ্লোবুলিন IgE এর পরিমাণ বেড়ে যায়। কতক ক্ষেত্রে IgG IgE এর ন্যায় একটা ভূমিকা পালন করে বলে সম্প্রতি প্রতীত হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য যে প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ হাঁপানি এলার্জি জনিত নয়। ভাইরাস প্রদাহ, ঠান্ডা বাতাস মানসিক ভারসাম্যতা বা উত্তেজনা প্রভৃতি কারণ থেকে সৃষ্ট হাঁপানিকে Non-atopic বা Intrinsic হাঁপানি বলা হয়। এক্ষেত্রে শ্বাসনালীর টিস্যুর বিশেষ ইমমুনোগ্লোবুলিনের প্রতি স্পর্শকাতরতা পরিলক্ষিত হয় না এবং রক্তে IgE-এর পরিমাণও বৃদ্ধি পায় না।

হাঁপানি নির্ণয়

হঠাৎ আক্রান্ত কিন্তু দীর্ঘ শ্বাসকষ্ট, অত্যধিক কফের প্রকোপ ও বুকে ভয়ানক ঘড় ঘড় শব্দই হাঁপানির মূল উপসর্গ। ক্লান্ত, আতংকিত চেহারা বুকে ব্যাথা এবং আদ্র কিন্তু কালচে (Cyanosed) মুখ হাঁপানির স্বাভাবিক পরিচয়। অত্যধিক কফের কারণে শরীরে শুষ্কতা (Dehydretion) দেখা যায়। ষ্টেথেসকোপের মাধ্যমে বুকে ঠুনঠুন শব্দের (Rhonchi) শ্রুতি সহজ তবে কখনও আদ্র (Rales) শব্দও শুনা যায়। কফ আঠালো ও ঘন হয়। মাইক্রোসকোপের সাহায্যে কফে ইসোনোফিল দেখা যায়। রক্তেও ইসোনোফিলের পরিমাণ বেড়ে যায়। তবে রোগীকে ষ্টরয়েড দিয়ে চিকিৎসা করা হলে রক্তে ইসোনোফিলের আধিক্য পরিলক্ষিত হবে না।

শিশুদের ক্ষেত্রে শ্বেতকণিকার সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। রক্তে অক্সিজেনের (Po_2) চাপ < ৮০ মিলিমিটারের নীচে নেমে যায়। কার্বন-ডাই-অক্সাইডের (PCo_2) চাপ বৃদ্ধি খুব খারাপ লক্ষণ। রক্তে ক্ষারত্ব বৃদ্ধি (>PH ৭.৪৭) পায়। বুকের এক্সরেতে প্রাথমিক অবস্থায় কোনো পরিবর্তন দেখা যাবে না। কেবলমাত্র দীর্ঘস্থায়ী পুরনো হাঁপানিতে ফুসফুসেরর অন্যান্য রোগের ছাপ এক্সরেতে দেখা যাবে।

ইসিজিতে (ECG) কেবলমাত্র হৃদপিন্ডের দ্রুত স্পন্দন (Tachycardia) পরিস্ফুট হবে। শ্বাসপ্রশ্বাসের বিশেষ পরীক্ষাসমূহ (Spirometric Tests) গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করে। ভাইটাল ক্যাপাসিটি (যতদূর সম্ভব একবারে বাতাস গ্রহণ করে, যতদূর সম্ভব শ্বাস ত্যাগ), Forced Expiratory Flow in I

Second (যতদূর সম্ভব একবারে বাতাস গ্রহণ করে, যতদূর সম্ভব এক সেকেন্ডের মধ্যে শ্বাস ত্যাগ) ভয়ানকভাবে কমে যায়।

হাঁপানির বিকল্প চিকিৎসা

হাঁপানির আক্রমণে রোগীকে অক্সিজেন এমাইফাইলিন / থিওফাইলিন ইনজেকসন, (শ্বাসনালীর সম্প্রসারক) প্রচুর তরল পানীয় (প্রয়োজনবোধে শিরার মধ্যে ৫% ডেক্সট্রোজ ইন একোয়া বা হাফ নরম্যাল স্যালাইন) এবং সবশেষ চিকিৎসা হিসেবে স্টরয়েড দেওয়াই প্রচলিত আধুনিক চিকিৎসা। হাঁপানির আধুনিক চিকিৎসায় কফ মিকচারের কোনো ভূমিকা নেই, তাই পাশ্চাত্য দেশসমূহে হাঁপানিতে কফ মিকচার ব্যবহৃত হয় না। বরঞ্চ বলা হয় "Expectorants, positive pressure Ventilation, bronchoscopy and bronchial Lavage are all potentially dangerous and should be avoided"—কফ নিক্ষেপক পজিটিভ প্রেসার ভেনটিলেশন, ব্রনকোসকপী এবং শ্বাসনালী ধৌতকরণ মারাত্মক বিপদজনক এবং এসবের পরিহার বাঞ্ছনীয়।

প্রচলিত আধুনিক চিকিৎসায় হাঁপানির পরিপূর্ণ নিরাময় নেই, রোগের তীব্রতা হ্রাস সম্ভব। তবে আক্রমণের হার কমানোর প্রমাণ নেই। তাই চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা অতীতে অবজ্ঞায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়া চিকিৎসা সংক্রান্ত "লোক বিশ্বাস" বা 'হাতুড়েপনা'কে বিজ্ঞানের নিক্তিতে গত সত্তরের দশক থেকে পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করেন। তারা দেখতে চাইছেন, হাজার বছর ধরে প্রচলিত বিশ্বাসের মধ্যে চিকিৎসার কোনো সত্য বা তথ্য লুকিয়ে আছে কিনা, কোনো সংবাদ অনাবিষ্কৃত রয়েছে কিনা যা চিকিৎসা শাস্ত্রের রূপান্তর ঘটিয়ে মানুষের কল্যাণ সাধন করবে।

শতাব্দীর সংকীর্ণতা ও উপনিবেশিক মনোভাব এবং "শ্বেত সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ (White cultured lmparialism)" পরিহার সহজ নয়। ম্যাকেলে চিন্তার প্রভাবে এই মনোভাবের অনুপ্রবেশ ঘটেছে হলদে ও কালো বিজ্ঞানীদের মনে ও চিন্তা চেতনায়। সত্যিকার অর্থে বহুদিন পরে বিজ্ঞানীরা ধর্মযাজকের আচ্ছাদন ত্যাগ করে, বিজ্ঞানের এ্যাপ্রন পড়ে বিজ্ঞানের চোখে পরীক্ষা করতে শুরু করেছেন আমাদের লোক কথায় নিহিত তথ্যসমূহ। এরূপ একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলাফল সম্প্রতি প্রকাশিত বৃটিশ মেডিকেল জার্নালে। ১৯শে অক্টোবর, ১৯৮৫ তারিখের বৃটিশ মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত "Yoga for bronchial Asthma : a Controlled study" (শ্বাসনালীর হাঁপানিতে যোগব্যায়াম : একটি নিয়ন্ত্রিত সমীক্ষা)।

এই শিরোনামে প্রকাশিত উক্ত বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষাটি এটাই প্রমাণ করে যে, আমাদের সভ্যতা কেবল প্রাচীন তাই নয়, আমাদের শিক্ষা ও জ্ঞান যথেষ্ট বিজ্ঞানভিত্তিকেও ছিল। যোগব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরকে সুস্থ সবল রাখাটা এই উপমহাদেশের কয়েক হাজার বছরের ধর্ম-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত। দীর্ঘকাল ধরে চীনের আকুপাংচারের পদ্ধতির মত আমাদের বনৌষধি এবং যোগব্যায়াম এদেশের মানুষের কল্যাণে, চিকিৎসার

ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এদেশের পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত পন্ডিতরা বনৌষধি ও যোগব্যায়ামকে অবজ্ঞায় পরিহার করে চলেছেন। আশা করছি আমাদের কতক ঐতিহ্য বিজ্ঞানের মাহাত্মে পুনরায় জীবন পাবে, মূল্য বাড়বে আমাদের মাটির, সম্মান পাবে আমাদের হারিয়ে যাওয়া অতীত জ্ঞান এবং বন্ধ হবে পশ্চিমের নকল-নোনার জন্য অর্থ অপচয়।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, প্রাচীনকাল থেকেই ভারত উপমহাদেশে হাঁপানির তীব্রতা ও হার হ্রাসের মাধ্যম হিসেবে যোগ চিকিৎসার বিধি ছিল।

৫০ বৎসরের বেশীকাল ধরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন যোগব্যায়াম গবেষণা কেন্দ্রে হাঁপানি রোগীর চিকিৎসা হচ্ছে। রোগীরা সুফল পেলেও নিয়ন্ত্রিত সমীক্ষা (Controlled Study) না হবার কারণে বিজ্ঞানীরা এ তথ্য গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে আসছিলেন। গত দুই দশক ধরে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও চিকিৎসায় যোগ-ব্যায়ামের প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা শুরু হয়েছে।

এম ভি ভোলে "যৌগিক পদ্ধতিতে হাঁপানির চিকিৎসা" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন ১৯৬৭ সনে। অধ্যাপক উইলসন ও হনসবারগার বক্ষোব্যাধির জার্নালে "রেসপিরেটরী থেরাপীতে' ১৯৭৩ সনে প্রকাশ করেন "Transcendental meditation in treating Asthma"—অতীন্দ্রিয় ধ্যানের মাধ্যমে হাঁপানির চিকিৎসা।"

সত্তর দশকের শুরুতেই লণ্ডনে উচ্চ রক্তচাপের উপর যোগব্যায়াম ও অতীন্দ্রিয় ধ্যানের প্রভাব সম্পর্কে এক দীর্ঘস্থায়ী গবেষণা শুরু হয়। ফলাফল নির্ধারণের জন্য এ গবেষণায় অত্যন্ত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয়। যোগব্যায়াম ও অতীন্দ্রিয় ধ্যানের দ্বারা স্বল্প সময়ের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ হ্রাস পায়। গবেষণায় আরও প্রমাণিত হয় যে, অতীন্দ্রিয় ধ্যান ও শবাসনের দ্বারা বিপাক ক্রিয়ার হ্রাসগতিও (Reduced Metabolic Rate) নির্ণীত হয়। ১৯৭৫ সনে একযোগে লণ্ডন ও আমেরিকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক চিকিৎসা সাময়িকী ল্যানসেটে এসব তথ্য প্রকাশিত হলে পর বিজ্ঞান জগতে হুল্লোড় পড়ে যায়। প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল 'Twelve month follow up of yoga and Feedbeck in the management of Hypertension'. জার্মানীর হামবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৪ সনে এক বিস্তৃত গবেষণায় 'Pranayama in anxiety neurosis : A pilot study'-এ প্রমাণিত হয় যে, প্রাণায়ম অনুশীলনে নাড়ির গতি, প্রস্রাবে কেটেকোলামাইনের ঘনত্ব (Concentration) এবং প্রস্রাবের কলিনইসটেরেজ কার্যকারিতা (Urinary Cholinesterase Activity) হ্রাসের কারণে উৎকন্ঠা বহুলাংশে কমে যায়।

হাঁপানির উপর যোগব্যায়ামের স্বল্পকালীন (২-৪ সপ্তাহ) ও দীর্ঘস্থায়ী (এক বৎসর বা ততোধিক) সুফল ও কার্যকরিতা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আর. নাগারত্ন এম. ডি, এম. আর. সি. পি, এবং ডঃ এইচ. আর. নগেন্দ্র জি. এইচ, ডি, ভারতের বাংগালোরস্থ বিবেকানন্দ কেন্দ্র যোগ থেরাপী এন্ড রিসার্চ সেন্টারে ১৯৮১ সনে গবেষণা শুরু করেন। বহির্বিভাগের বিপুল সংখ্যক হাঁপানি রোগীদের একদলকে স্বাভাবিক এ্যালোপ্যাথী চিকিৎসা বহাল রেখে নিয়ন্ত্রিত দল (Controlled group)

ভুক্ত করেন এবং অপরদলকে যোগব্যায়াম শিক্ষা দিয়ে উভয়দলের রোগীদের উন্নতির তারতম্য পর্যবেক্ষণ করেন। যোগব্যায়াম সহকারে চিকিৎসাকৃত হাঁপানি রোগীদের স্বল্পকালীন সুফল প্রাপ্তি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়।

একইভাবে গবেষকদ্বয় দুইদল হাঁপানি রোগীর উপর যোগাসনের দীর্ঘ মেয়াদী প্রতিক্রিয়া বর্তমান গবেষণায় প্রকাশ করেন।

রোগী ও পদ্ধতি

ডগলাস এণ্ড ক্রফটন রচিত 'রেসপিরেটরী ডিজিজেস্' (দ্বিতীয় সংস্করণ) এবং 'এসপেকটস্ অব এলার্জি এণ্ড এপ্লাইড এমমুনোলজী'তে প্রকাশিত ডি এন শিবপুরীর নির্দ্ধারিত নীতিমালার ভিত্তিতে ১০৬ জন প্রমাণিত হাঁপানি রোগীকে বাছাই করা হয়। তাদের বয়স ৯ থেকে ৪৭ বৎসরের মধ্যে বিস্তৃত ছিল এবং বয়সের গড় ছিল ২৬·৪ বৎসর। বয়স, লিংগ, রোগের অবস্থা এবং হাঁপানির আক্রমণকাল প্রভৃতি নিয়ামক যথার্থভাবে মেনে ১০৬ জন রোগীকে ৫৩ জন করে দুই দলে ভাগ করা হয়। উভয় দলেই ১৫ জন করে মহিলা হাঁপানি রোগী ছিল। যদিও ১০৬ জনই যোগব্যায়ামের মাধ্যমে হাঁপানি রোগের চিকিৎসার জন্য উদগ্রীব ছিল, তবু কেবলমাত্র ৫৩ জনকে এজন্য নির্বাচিত করে 'যোগব্যায়াম দলে' অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অপরপক্ষে বাকী ৫৩ জনকে নিয়ন্ত্রিত (Controlled group) দলভুক্ত করে হাঁপানির প্রচলিত ওষুধ পত্র সেবনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। উভয় দলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছক-১ এ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

ছক—১ উভয় দলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

	নিয়ন্ত্রিত দল	যোগব্যায়াম দল
হাঁপানি রোগীর সংখ্যা	৫৩	৫৩
পুরুষ	৩৮	৩
মহিলা	১৫	১৫
বয়সের রেঞ্জ ও গড় (বৎসর)	৯-৪৭ (২৬·৪১)	৯-৪৭ (২৬·৩৬)
হাঁপানীর প্রচণ্ডতার গড় (রেঞ্জ)	১·৪৫ (০-৩)	১·৪৫ (০-৩)
সময় বিশেষে হাঁপানি আক্রমণের সংখ্যা	৩৩	৩৩
বৎসরে হাঁপানি আক্রমণের সংখ্যা	২০	২০
সপ্তাহে হাঁপানি আক্রমণের গড় (রেঞ্জ)	৩·০৮ (০-৭)	৩·০১ (০-৭)
সপ্তাহে ওষুধ ব্যবহারের গড় (রেঞ্জ)	১০·২৬ (০-৪৯)	৬·২২ (০-২৯)
সর্বোচ্চ ফ্লোরেটরে গড় লিটার/মিনিট/রেঞ্জ	২৬৪·২ (৬০-৫৮০)	২৯০·১ (৮০-৬৯০)

প্রত্যেককে গবেষণার তাৎপর্য বুঝিয়ে বলা হয় এবং সবাইকে হিসেব রাখায় পদ্ধতিও শিখানো হয়। নিয়ন্ত্রিত দল তাদের স্বাভাবিক ওষুধ গ্রহণ অব্যাহত রাখে, তবে পুংখানুপুংখভাবে ব্যবহৃত সব ওষুধের হিসেবে রাখে।

যোগব্যায়ামের দল প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত মোট আড়াই ঘন্টা করে যোগব্যায়ামের প্রশিক্ষণ নেয়।

প্রশিক্ষণকালীন তারা নিম্নলিখিত যোগব্যায়ামসমূহ অভ্যাস করে। শ্বাস নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া ঃ (পাঁচ মিনিট) এই প্রক্রিয়ায় খুব ধীরে ধীরে, ছন্দে ছন্দে হাত এবং শরীর আন্দোলিত করার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশ্বাস নেয়া এবং ছাড়া হয়।

শিথিলিকর্ণ ব্যায়াম এবং সূর্য প্রণাম (পাঁচ মিনিট।) সন্ধির গতি সহজ শিথিলকরণ।

যোগ আসন—(ক) কুড়ি মিনিটের সাধারণ যোগআসন.(দাঁড়িয়ে, বসে, উপুড় এবং চিৎ অবস্থায়)—এই আসন খুব ধীরে শিথিল এবং আরামদায়কভাবে নিঃশ্বাস নেয়া এবং ছাড়া হয়। প্রত্যেকটি আসনের পর মন এবং মাংসপেশীর চাপ কমানোর জন্যে ১০ মিনিটের শবাসন অপরিহার্য। এই আসনে মন এবং শরীর এক ধরনের শিথিলতা উপভোগ করে। ধীরে গভীর এবং আরামদায়কভাবে শ্বাস প্রক্রিয়া হচ্ছে প্রাণায়াম। এটি ১০ মিনিট করতে হবে, এবং চার রকমভাবে করা যাবে। আত্মনিমগ্নতা এবং আত্ম নিবেদন পর্ব হচ্ছে মানসিক প্রক্রিয়ার অন্তর্গত একটি আসন। এতে মনে আসবে একটি মুক্ত ভাব। একাগ্রতা আনয়নের সুবিধার্থে ওম! ওম! শব্দ সুর করে উচ্চারণ করা হয়। ক্রিয়া (সাপ্তাহিক) ঃ নাক এবং পাকস্থলী ধৌত করণের যোগ প্রক্রিয়ার নাম হচ্ছে 'নেতি', এবং 'ধমন ধৌতি'। 'নেতি' এবং ধৌতি.র পর অবশ্যই শবাসন করতে হবে। এগুলি সবই যোগ দর্শন ও চিকিৎসাশ্রিত।

প্রশিক্ষণকালে ৫৩ জন রোগীই প্রত্যেক দিন ৬৫ মিনিট এই পদ্ধতিগুলি পালন করেছেন। যারা হঠাৎ অভ্যাস বন্ধ করেছেন এবং যারা মাসে ১৬ দিনের বেশী অভ্যাস করেননি, তাদেরকেই চিকিৎসা পদ্ধতি থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। যদিও তাদের ক্রমোন্নতির রিপোর্ট পাওয়া গেছে। মোটমাট পঁচিশজন রোগী এই প্রশিক্ষণ থেকে শেষ পর্যন্ত বাদ পড়েন—৬ মাস পর সাতজন, সাতজন ১২ মাস পর, দুজন ১৮ মাস পর, ৪ জন ২৪ মাস এবং ৫ জন ৩০ মাসের মাথায় বাদ পড়েন। প্রত্যেক রোগী ৬ পর তাদের রোগলিপি প্রদান করেছেন। নমুনা সাক্ষাৎকারের প্রয়োজনে প্রত্যেক রোগীই একটি রোজনামচা ব্যবহার করেছেন। তারা এতে বায়ু চলাচলের বাধা, নিঃশ্বাসের কঠিনতা, ব্যবহৃত ওষুধের মাত্রা—এ সমস্তই লিখছেন। যখনই তারা তাদের রোগের সুফল বা অবনতির কথা উল্লেখ করেছেন, তারা এও লিখেছেন যে কখন তাদের ওষুধের মাত্রা পরিবর্তন করতে হয়েছে। এ সময়ে রোগীর রোজনামচায় যে অবস্থা পাওয়া যাচ্ছে ঃ প্রত্যেক প্রশিক্ষণকালীণ সময়ে সাপ্তাহিক রোগাক্রমণের মাত্রা গ্রেডে বিভাগ করা হয় ঃ

গ্রেড—১ রোগের মৃদু অবস্থা, ঘুমের ব্যাঘাত হয়নি বা স্বাভাবিক কাজকর্ম ও জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হয়নি।
গ্রেডে-২ অপেক্ষাকৃত সহনীয় অবস্থা, ঘুমের ব্যাঘাত রয়েছে, মুখে সেব্য ওষুধের মাধ্যমে উপশম প্রয়োজন হচ্ছে।
গ্রেড-৩ ইঞ্জেকশন অথবা হাসপাতালের প্রয়োজন।

এই সমীক্ষায় ওষুধ চিকিৎসার একটি গড় অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষতঃ যারা এই পর্যায়ে প্রতি সপ্তাহে ব্রংকোডিলেটর টেবলেট এবং ইঞ্জেকশন নিয়েছেন, তাদের হিসেবে রাখা হয়েছে। কোন রোগীই সমীক্ষাকালে 'ইন—হেলার' ব্যবহার করেননি। Peak Expiratory Rate' 'মিনি রাইটস পিক ফ্লো মিটারের" সাহায্যে নির্ধারণ ও নথিভুক্ত করা হয়।

ফলাফল দুই নম্বর ছকে গবেষণার ফলাফল বিধৃত হয়েছে। উভয় দলের অবস্থা নিরূপণের জন্য বিশেষ রকমের পরিসংখ্যান গত পরীক্ষা "ষ্টুডেন্ট টি টেষ্ট" ব্যবহার করে দেখা গেছে যোগব্যায়াম অনুশীলনকারী দলের অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ও উন্নতি হয়েছে। তাদের প্রতি সপ্তাহে হাঁপানির আক্রমণের হার এবং সাপ্তাহিক ওষুধ ব্যবহারের পরিমাণও বিশেষভাবে কমেছে।

গড়ের বিরাট তারতম্যের কারণে 'ষ্টান্ডার্ড ডেভিয়েশন' (D) অন্যান্য হিসেবের সাথে সামঞ্জস্যমূলক এবং তাৎপর্যপূর্ণ।

ছক-২ নিয়ন্ত্রিত ও যোগব্যায়াম দলের ৫৪ মাস অনুসরণ: ষ্টুডেন্ট পেয়ারড "t" পরীক্ষার প্রেক্ষিতে

বিভিন্ন পরীক্ষামাত্রা (Variables)	দল	(SD)-এর গড় প্রাথমিক মূল্যায়ন	SD-এর গড় চূড়ান্ত মূল্যায়ন	তাৎপর্য প্রাথমিক চূড়ান্ত মূল্যায়নের পার্থক্য	বিভিন্ন দলের মধ্যে পার্থক্য
প্রতি সপ্তাহে হাঁপানি	নিয়ন্ত্রিত দল	২.৯(৩.০১)	২.১(২.৭)	২.৫৭৮ **	২.৮২৫**
আক্রমণের হার	যোগব্যায়াম দল	৩.৫৫(২.৯৮)	০.৮৩(২.৪৯)	৪.৮২৭ **	
উপসর্গের তীব্রতার	নিয়ন্ত্রিত দল	১.৬(০.৭৫)	১.০৫(০.৮৫)	৪.০০৬**	০.৩৬৯
পরিমাপ	যোগব্যায়াম দল	১.৪৭(০.৬৬)	০.৭৫(০.৮)	৫.০১৬ **	(উল্লেখযোগ্য নয়)
ওষুধ ব্যবহারের	নিয়ন্ত্রিত দল	৬.২২(৭.১৪)	৭.৯(৯.৯)	০.৫৫৬	৩.১৫২ *
পরিমাপ	যোগব্যায়াম দল	১০.২৬(১৩.১৬)	২.০৮(৪.০৯)	৪.৯৬৪ **	
পিক ফ্লোরেট	নিয়ন্ত্রিত দল	২৬৪.২(১১.৭২)	২৯০.৪(১২.২)	৪.০৬৫ **	১.৮১৭
(লিটার/মিনিট***	যোগব্যায়াম দল	২৯০.১(৯৩.১)	৩৬২.৪(১০৭.৬)	৭.৩৩৬ **	

* P=০'০৩ ** P<০'০০৫

*** পিক ফ্লো রেট কেবলমাত্র ৫০ জন নিয়ন্ত্রিত এবং ৪৪ জন যোগব্যায়াম দলের রোগীদের লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। ছক-৩ এ উভয় দলের যে সমস্ত রোগীর চিকিৎসার পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছিল তার হিসেবে দেওয়া হয়েছে। পরিসংখ্যানগতভাবে প্রমাণিত হয় যে, যোগব্যায়াম অনুশীলনকারী তাৎপর্যপূর্ণ সুফল পেয়েছেন (P<০'০১)।

ছক-৩ : যে সমস্ত রোগীর চিকিৎসা পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছিল তাদের হিসাব

দল	চিকিৎসা বন্ধ করা হয়েছিল	ওষুধের মাত্রা কমানো হয়েছিল	কোনো পরিবর্তন নেই	বাড়ানো হয়েছিল	
নিয়ন্ত্রিত দল	২৩	৯	৭	১৪	
যোগব্যায়াম দল	৩০	১২	৩	৮	X^2=৪'৪৮*

*P<০'০১

ছক-৪ এ নিয়ন্ত্রিত এবং যোগব্যায়াম অনুশীলন দলের পিক ফ্লো রেট ও ওষুধ ব্যবহার পরিমাপের প্রাথমিক ও চূড়ান্ত হিসাব নিকাশ দেওয়া হয়েছে। সাড়ে চার বৎসর যাবৎ, উভয় দলের রোগীদের অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অনুসরণ করে দেখা গেছে যে যোগব্যায়াম অনুশীলন দলের রোগীদের ওষুধ ব্যবহারের হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমেছে এবং শ্বাস প্রশ্বাসের উন্নতি হয়েছে। নিয়ন্ত্রিত দলের তুলনায় যোগব্যায়াম দলের "পিক ফ্লো রেটের" বিপুল ক্রমোন্নতি ঘটেছে।

ছক-৪ ছয়মাস অন্তর উভয় দলকে অনুসরণের ফলাফল

দল		প্রাথমিক অবস্থা	অনুসরণ ৬ মাস	১২ মাস	১৮ মাস	২৪ মাস	৩০ মাস	৩৬ মাস	৫৪ মাস
ওষুধ ব্যব-হারের গড়	নিয়ন্ত্রিত	১৬'২২	২'৮৭৫	১০'৬৬	০'৬৬৬	১'৮৭৫	১৪'৫	৭'০	৯'০(৯)
	যোগব্যায়াম	১০'২৬	০'৪২৮	৬'৪৪৪	৭'০	১'১৬৬	১'২০	২'০	৩'১১১
পিকফ্লোরেট লিটার/মিনিট	নিয়ন্ত্রিত	২৬৪'২	২৯১'২৫	১৭৮'৫	১৯০	২২২'৫	২৩৬'৬৬	৩০৮'৭৫	৩২০'৬২
	যোগব্যায়াম	২৯০'১	৩৭১'৬৬	৩৩৯'৩৭	২৩৬	৩৭২'৫	৩৭০'০	৪১০'০	৩৪৮'৭৫

উপসংহার

এই সমীক্ষার ফলে যোগ এবং নিয়ন্ত্রণ কৌশল—এই দুই বিভাগের মধ্যে বয়স লিঙ্গ এবং হাঁপানির গুরুত্ব অবস্থাভেদ দেখা গেছে। যারা নিয়মিত যোগাভ্যাস করেছেন, সেই ৫৩ জন রোগীর অবস্থা ক্রমোন্নতির দিকে। তাদের মধ্যে ওষুধ ব্যবহারের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। অপরপক্ষে নিয়ন্ত্রিত দলের ওষুধ গ্রহণের হার হ্রাস পায়নি বরঞ্চ বেড়েছে।

এইসব দিক থেকে উক্ত দুই পদ্ধতির অভ্যাসকারীদের মধ্যে, পিক ফ্লোরেট এবং সাপ্তাহিক রোগাক্রমণের সর্বোচ্চ হারে বেশ একটা তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবধান লক্ষ্যযোগ্য।

হাঁপানি যে অনেকাংশে মানসিক সম্পর্ক নির্ভর সে সম্পর্কে প্রচুর বস্তুনিষ্ঠ তথ্য আছে। কি প্রক্রিয়ায় মানসিক প্রভাবে হাঁপানি রোগের ক্রমবৃদ্ধি বা ক্রমোন্নতি হয় তা এখনো পুরোপুরি বুঝে ওঠা সম্ভব হয়নি। তবে মনে করা হয় এটা একটা জটিল ব্যাপার। প্রায় অর্ধেক রোগী মানসিক কারণে প্রভাবিত হয়। ভেগাস (Vagus) স্নায়ুর কাজের পরিবর্তনের ফলে শ্বাসনালীর প্রসারতারও পরিবর্তন ঘটে থাকে। এটা লক্ষ্য করা গেছে যে, পরামর্শের ফলে (সাজেশন) শ্বাসপথের ওপর ভেষজ যে কাজ করে তদ্রূপ প্রসারণ ও সংকোচন ঘটে থাকে। তবে যে সমস্ত মানসিক উপাদানগুলি ক্ষমতার কারণে হাঁপানি হয় বা এধরনের অবস্থা আরো চরম পর্যায়ে ওঠে—তা বিভিন্ন রোগীর ওপর বিভিন্ন রকম। আবার একই রোগীর ওপর তা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

গাইস ও তাঁর সহকর্মীরা দাবী করেন যে সব হাঁপানি রোগীর বেলায় না হলেও অধিকাংশের ক্ষেত্রেই মনোদৈহিক ভারসাম্যহীনতা দেখতে পাওয়া যায়। অবদমিত আবেগ, উৎকণ্ঠা, নির্ভরশীলতা ও চরম আত্মসচেতনতা শ্বাস পথের মাংসপেশী সহ অন্যান্য স্থানে সাধারণভাবে মাংসের খিঁচুনী সৃষ্টি করে থাকে। হয়তো মাংসপেশীর এই বর্ধিত খিঁচুনী হাঁপানী রোগের আক্রমণ বা ক্রমাবনতির মূল অথবা সহায়ক কারণ হতে পারে।

যোগব্যায়ামের ফলে স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা কমে যায় এবং কাজে স্থিতিশীলতা আসে। অতীন্দ্রিয় ধ্যানের সময় মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক প্রবাহ রেখার ইলেকট্রোএনকেফেলোগ্রাম (E.E.G) আলফা তরঙ্গের বৃদ্ধি ঘটে। এবং এর ফলে এটা অনুমান করা সম্ভব যে ধ্যান স্নায়ুতন্ত্রের কাজকে স্থিতিশীল করে। যোগব্যায়াম স্পষ্টতঃই মাংসপেশীকে শিথিল করে এবং এই গভীর মানসিক ও দৈহিক প্রশান্তি যা নিয়মিত, দৈহিক যোগব্যায়ামের ফলে পাওয়া সম্ভব—শ্বাসপথের ওপর স্থিতিশীল প্রতিক্রিয়া ফেলে। আর এর কারণেই ভেগাস স্নায়ুর চঞ্চলতা হ্রাস পায়।

যোগব্যায়ামের ফলে অতিরিক্ত মানসিক প্রতিক্রিয়া ও আবেগের অস্থিরতা কমে যায় বলে ভেগাস স্নায়ুর সংবেদনশীলতাও কমে যায়। যেহেতু ভেগাস স্নায়ু দ্বারাই হাঁপানির মনো-দৈহিক উপাদান প্রভাবিত হয়ে থাকে, তাই যোগ ব্যায়ামের ফলে হাঁপানিতে উপকার পাওয়া সম্ভব।

হাঁপানিতে যোগব্যায়াম বিজ্ঞানসম্মত প্রবন্ধটির শেষাংশ পুরোপুরি ডা, নাগরত্ন ও নগেন্দ্র'র প্রবন্ধেরই অনুবাদ।

তথ্যসূত্র

১। কারেন্ট ইমর্জেন্সী ডায়াগনোসিস এণ্ড ট্রিটমেন্ট, ১৯৮৫, ল্যাঞ্জ মেডিকেল পাবলিকেশনস্, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

২। কারেন্ট পেডয়াট্রিক ডায়াগনোসিস এণ্ড ট্রিটমেন্ট, ১৯৮৫, ল্যাঞ্জ মেডিকেল পাবলিকেশনস্, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

৩। কারেন্ট মেডিকেল ডায়াগনোসিস এণ্ড ট্রিটমেন্ট, ১৯৮৫, ল্যাঞ্জ মেডিকেল পাবলিকেশনস্, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

৪। ল্যানসেট, লণ্ডন, পৃষ্ঠা ৬২-৬৩, ১৯৭৫।

৫। বৃটিশ মেডিকেল জার্নাল, লণ্ডন, পৃঃ ১০৭৭-১০৭৯, ১৯৮৫।

উড্ডীয়ান মুদ্রা

প্রণালী ঃ দু'পা ফাঁক করে শরীরের সমস্ত মাংস পেশী আলগা করে সোজা হয়ে দাঁড়ান। এবার হাঁটু দু'টি সামান্য ভেঙ্গে শরীরের উপরাংশ সামান্য একটু সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দু'হাতের তালু উরুর উপর রাখুন। তারপর শ্বাস সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করার সংগে সংগে পেটের উপরিভাগ নিম্ন চিত্রের মত ভিতরের দিকে যতটা পারেন টেনে নিয়ে পেটটা ভালোভাবে খালি করুন। মনে মনে এই অবস্থায় ১ থেকে ৬ মাত্রা পর্যন্ত গুনুন। লক্ষ্য রাখুন দম যেন বন্ধ থাকে। ৬ মাত্রা গোনার পরই সোজা হয়ে দাঁড়ান এবং কয়েকবার শ্বাসপ্রশ্বাস দীর্ঘভাবে নেওয়া ও ছাড়ার পর আবার পূর্বের মত মুদ্রাটি অভ্যাস করুন। এইভাবে একই প্রক্রিয়ায় পর পর ৬ বার মুদ্রাটি করবেন। কিছুদিন অভ্যাসের পর মাত্রা বাড়িয়ে দেবেন।



কার্যকারিতা ও উপকারিতা ঃ হাঁপানি রোগীদের পক্ষে এই মুদ্রাটি খুবই উপকারী। সাধারণত শ্বাসত্যাগের সময় যদি কষ্ট হয় তাহলে সেই অবস্থাকেই হাঁপানি বা হাঁপ ধরা বলা হয়। আমরা নাক দিয়ে যে বাতাস গ্রহণ করি তা শ্বাসনালী ও তার শাখা-প্রশাখা অর্থাৎ ব্রঙ্কিওল বা ক্লোম শাখা দিয়ে ক্রমে ক্রমে ফুসফুসে পেঁছায়। ব্রঙ্কিওলগুলোর ধর্ম হচ্ছে শ্বাস ছাড়ার সময় সঙ্কুচিত হওয়া এবং শ্বাস গ্রহণের সময় প্রসারিত হওয়া। কিন্তু হাঁপানি রোগীদের জোর করে এই শ্বাসকার্য সংগঠনের ফল ফুসফুসের সঙ্কোচন প্রসারণ ক্রিয়া ব্যাহত হয়। ফলে শ্বাস ছাড়ার পরও কিছু অবশিষ্ট বায়ু ফুসফুসের ভেতরে থেকে যায়। কিন্তু উড্ডীয়ান মুদ্রাটি করার সময় মধ্যচ্ছদা (Diaphragm) পেশীটি অবশিষ্ট বায়ুকে বের করে দিতে সাহায্য করে। কারণ শ্বাসত্যাগের পর যখনই পেটটা খালি করে ভিতরের দিকে টানা হয় তখনই মধ্যচ্ছদা পেশীটা আরো উপরে উঠে গিয়ে ফুসফুসস্থিত অবশিষ্ট বায়ুকে বের করে দেয়। সুতরাং হাঁপানি রোগীরা এই মুদ্রাটি নিয়মিত করলে শ্বাসকষ্টের হাত থেকে রেহাই পাবেন। পদ্মাসনে বসে শ্বাস নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করুন। হাঁপানির অব্যর্থ ওষুধ।



শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে ৩০ থেকে ৬০ সেকেন্ড করে তিন অথবা চারবার পায়ের অবস্থান অদলবদল করে করবেন। অর্থাৎ, প্রথমে যদি ডান পা বাম উরুর উপর রাখেন তবে পরের বার বাঁ পা ডান উরুর উপর রেখে করবেন। প্রত্যেকবার করার পর একবার করে শবাসনে বিশ্রাম নেবেন।

কার্যকারিতা ও উপকারিতা ঃ নিস্তরঙ্গ সরোবরে প্রস্ফুটিত পদ্ম সৌন্দর্য, শান্তি ও একাগ্রতার প্রতীক। তাই মনঃসংযোগ ও মনস্থির করার জন্য পদ্মাসন অদ্বিতীয়।

ধ্যান, সমাধি প্রভৃতি অভ্যাসের পক্ষেও এই আসন উৎকৃষ্ট। আসনটি নিষ্ঠার সঙ্গে অভ্যাস করতে পারলে দেহমন দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হয়, সর্বোপরি দেহ নীরোগ হয়।

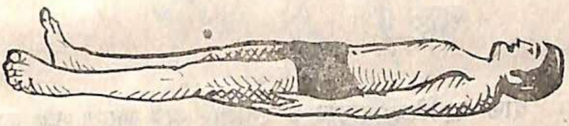
শবাসন

নাম থেকেই এই আসনের অবস্থান আমরা বুঝতে পারি। শব অর্থাৎ মৃতের ন্যায় অবস্থান করাই শবাসন।

প্রণালী : চিৎ হয়ে শুয়ে পা দু'টি লম্বা করে ছড়িয়ে দিন এবং হাত দু'টি শরীরের দু'পাশে চিত্রের মত মাটিতে রাখুন। এইবার চোখ বন্ধ করে মৃতের ন্যায় শুয়ে থাকুন। এই সময় হাত, পা প্রভৃতি শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবশের ন্যায় থাকবে।

অন্য আর এক প্রকার শবাসন আছে। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। হাত দু'টি শরীরের দু'পাশে যথারীতি রেখে মাটিতে বাঁ অথবা ডান দিকের গাল ও কান পেতে দিয়ে সমস্ত শরীর আলগা করে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকুন।

কতকগুলো আসন করার সময় চিৎ হয়ে শুয়ে শুরু করতে হয়। তখন চিৎ হয়ে শুয়ে শবাসন করবেন। অনুরূপভাবে যে সমস্ত আসন করার সময় উপুড় হয়ে শুয়ে করতে হয় সেগুলোর বেলায় উপুড় হয়ে শবাসন করবেন।



সূর্য নমস্কার

প্রণালী : ১নং চিত্র : পা সামান্য ফাঁক করে ও মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ান। এবার হাত দু'টি জোড়া করে নমস্কারের ভঙ্গিমায় বুকের কাছে রাখুন। গভীরভাবে কয়েকবার শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া ও ছাড়া করুন।



১নং চিত্র

উপকারিতা ঃ (১) সূর্য নমস্কারের কার্যকারিতা শুধুমাত্র দেহের কোনো একটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর প্রতিক্রিয়া করে না, বরঞ্চ এর প্রতিক্রিয়া দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর প্রতিফলিত হয়। ফলে শরীরের ছোট-বড় প্রতিটি অস্থি-সংযোগস্থলগুলির স্থিতিস্থাপকতা বজায় থাকে।



২নং চিত্র

২ নং চিত্র ঃ হাত দু'টিকে জোড়া ও সোজা করে কানের সঙ্গে লাগিয়ে মাথার উপর তুলুন যাতে হাতের তালু দুটি সামনের দিকে ফেরান থাকে। এবার শ্বাস গ্রহণ করতে করতে কোমর থেকে শরীরের উর্ধ্বাংশ পেছনের দিকে ব্যাক্ আরচিং (Back Arching) করার মত বাঁকান।

উপকারিতা

(২) এই ব্যায়ামটি করাকালীন পেটের মাংসপেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণ ঘটে। ফলে পেটের অভ্যন্তরে যে সমস্ত যন্ত্র রয়েছে, যেমন পাকস্থলী, হজমের নাড়ী, যকৃৎ, প্লীহা প্রভৃতিকে সুস্থ সবল রেখে বদহজম, কোষ্ঠকাঠিন্য, পাতলা দাস্ত প্রভৃতি রোগের হাত থেকে শরীরকে রক্ষা করে।

৩নং চিত্র ঃ ঐখান থেকে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে শরীরের উর্ধ্বাংশ সামনের দিকে নামিয়ে টো টাচিং (Toe Touching) করার মত দু'হাতের সাহায্যে মাটি স্পর্শ করুন এবং কপাল হাঁটুতে ঠেকান।



৩নং চিত্র

উপকারিতা

(৩) এই ব্যায়ামটি করার ফলে ফুসফুসের কর্মক্ষমতা বাড়ে। এছাড়া রক্তচলাচলের পথে যেমন প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন উৎপাদনে সাহায্য করে তেমনি শরীরস্থ দূষিত বায়ু (কার্বন ডাই-অক্সাইড) বের করে দিতে সাহায্য করে। এছাড়া এই ব্যায়াম নিয়মিত নিষ্ঠার সঙ্গে অভ্যাস করলে ফুসফুসঘটিত কোনো অসুখ সহজে হতে পারে না।

৪নং চিত্র ঃ এবার হাতের তালুর উপর ভর দিয়ে ঐ অবস্থায় হাঁটু ভেঙ্গে বসুন। লক্ষ্য রাখবেন কপাল যেন হাঁটুর কাছ থেকে আলগা না হয়ে যায়।



৪নং চিত্র

উপকারিতা

(৪) এই ব্যায়ামটির নিয়মিত অভ্যাসে মেরুদণ্ড নমনীয় ও কমনীয় থাকে। ফলে মেরুদণ্ডস্থিত স্নায়ুকেন্দ্রগুলিতে প্রভূত পরিমাণে রক্তচলাচল হয়ে তাদের সুস্থ ও সতেজ রাখে। উপরন্তু মেরুদণ্ডে স্থিতিস্থাপকতা বাড়িয়ে মেরুদণ্ডস্থিত একত্রিশ জোড়া স্নায়ুকেও সতেজ রাখে।

যোগব্যায়াম শুরু করার আগে এবং শেষ করার পরে কয়েক মিনিট শবাসনে বিশ্রাম নিতে হয়। না হলে কোনো আসনের উপকারিতাই পুরোপুরি পাওয়া যায় না। আর অন্যান্য আসন যতক্ষণ সময় দিয়ে করবেন শবাসনেও ঠিক ততক্ষণ বিশ্রাম নেবেন।

এক তালাক দুই তালাক বাইন তালাক

নাসিমা সুলতানা/নীনা ইব্রাহীম

"আমি সত্যরূপ গ্রন্থির দ্বারা তোমার তোমার মন ও হৃদয়কে বন্ধন করছি। আমাদের পরস্পরের হৃদয় পরস্পরের সঙ্গে একই হৃদয় হয়ে থাকুক।"—এই মন্ত্রোচ্চারণ করে যে নারী ও পুরুষ পরস্পরকে পরস্পরের জীবনে গ্রহণ করলেন. কিছুদিন না যেতেই তাদের সেই গাঁটছড়া বন্ধন ক্রমশঃ যদি শিথিল হতে থাকে; সম্পর্কের মাঝখানে গড়ে ওঠে দুর্ভেদ্য দেয়াল, তখন আর তাদের হৃদয় মাত্র একটি হৃদয় থাকে না। কেচ্ছা-কেলেংকারী, ছি-ছিক্কার, কোর্ট-কাছারী সব মিলিয়ে একটি উলঙ্গ সত্য উন্মোচিত হয়ে পড়ে সবার সামনে। সমাজে তাদের বিশেষ পরিচিতি থাকলে তো কথাই নেই, সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোর রসের খোরাক হয়ে দাঁড়ায় সেইসব হৃদয়ভাঙ্গার ঘটনা। তথ্য পরিসংখ্যান, দৈনিক খবরের আড়ালে কতটুকু সামাজিক এবং মানসিক বিক্ষোভ ক্রিয়াশীল আমরা ভেবেও দেখি না। আর কতটুকুইবা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। দৈনিক পত্রিকার নিত্যদিনের কিছু বড় খবর, জাতিসংঘ, লেবানন, মিসাইল, রাষ্ট্রপতির বিদেশ সফর, শান্তি পুরস্কার এবং আরো অনেক খবরের মধ্যে নিঃসঙ্গ একটি খবর : মোমেনা খাতুনের বিবাহ বিচ্ছেদ খবরটি এই রকম—"প্রেম করিয়া বিবাহের ১ মাস যাইতে না যাইতেই এবং চোখের স্বপ্নের অঞ্জন না মুছিতেই মোমেনা খাতুন (১৮) প্রেমিক স্বামীর নিকট হইতে তালাকপ্রাপ্ত হইয়া বিধবা মায়ের বুকে ফিরিয়া গিয়াছে। বেড়া উপজেলার বসন্তপুর গ্রামের জনৈক মফিজউদ্দিনের পুত্র আলতাফ হোসেন (২২) একই গ্রামের মৃত ফজু শেখের কন্যা মোমেনা খাতুনের সাথে দীর্ঘদিন প্রেম করিয়া গত জুন মাসে পিতার অমতে বিবাহ করে। পিতা-পুত্রের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হওয়ায় এবং পিতাসহ অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের চাপের মুখে বিবাহের ১ মাস পূর্ণ না হইতেই আলতাফ হোসেন নব বিবাহিত স্ত্রী মোমেনা খাতুনকে তালাক দিয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়েছে। মোমেনা মায়ের বুকে মাথা রাখিয়া এখন কাঁদে।" (দৈনিক ইত্তেফাক)। মোমেনা খাতুনের বিবাহ বিচ্ছেদে সভ্য জগতের চলমানতা রুদ্ধ হবে না কখনো, লভ্যাংশের খাতায় বাংলাদেশের ক্ষতিবৃদ্ধিও ঘটবে না। তবু একটি সমাজের মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে তা গভীরভাবে সন্নিবদ্ধ।

সমাজ বিজ্ঞানের জনৈক অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেল, তিনি মনে করেন না, বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে ব্যাপকভাবে মাথা ঘামানোর মত কোনো পরিস্থিতি আদৌ

সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশে। তাঁর মতে. যেহেতু কোনো সঠিক তথ্য পরিসংখ্যান আমাদের হাতে নেই এবং যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন এ বিষয়ে তেমন কিছুই বলা যায় না জোর দিয়ে।

"ঝিনাইদহ জেলায় গত ৭ মাসে ৯৯৭টি বিবাহ বিচ্ছেদ এবং রংপুরে গত দশ মাসে ৩০৫টি তালাকের খবর সত্যিই ভাবনার কারণ হবে না, যতদিন না বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলা এবং জেলার প্রকৃত হিসাব আমাদের হাতে পেঁছাচ্ছে"—অধ্যাপকের কথা সত্য হলে বলতে হয়, সমস্ত ব্যাপারটাই আমরা সংখ্যা দিয়ে যাচাই করি, চেতনা বা হৃদয় দিয়ে নয়। কাজেই সেদিক থেকেও, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং তথাকথিত সমাজ কল্যাণ ও সামাজিক উন্নয়নমূলক সংস্থাগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে তথ্য পরিসংখ্যানের ব্যাপারে দায়িত্বশীল না হওয়া পর্যন্ত মোমেনা খাতুনদের তালাকপ্রাপ্তি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয়েই শোভা পাবে দৈনিকের পৃষ্ঠায়।

পূর্ব কথা

"The voice of the people is the voice of God"—মানব কন্ঠই ঈশ্বর কন্ঠ। এই মানব একাকী বা বিচ্ছিন্ন নয়ঃ সম্মিলিত, যৌথ, যুক্ত এবং তৎসত্ত্বেও স্বতন্ত্র। মানুষের বেঁচে থাকাটাই জরুরী। অস্তিত্বই তার কাছে ধ্রুব। অস্তিত্বের নিরিখেই মানুষ সমস্ত বস্তু ও বিষয়ের বিচার করে। বিশ্ব প্রকৃতি ও পদ্ধতির সত্যকে মানুষ তার জীবনধারণের সত্যের সমন্বিত করতে উৎসুক। এর মধ্যে রয়েছে দুটি মৌলিক সূত্রঃ পজেটিভ এবং নেগেটিভ, গ্রহণ ও বর্জন—এই দোলাচল। ঘুম থেকে জেগে উঠেই মানুষ তার চারপাশে দ্যাখে একটি ধ্রুব সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থা। আত্মবিশ্বাস, উদ্যোগ, বিবেচনা এবং সৃষ্টিশীলতা ক্রমশঃ গড়ে তুলেছে বিশ্ব প্রকৃতি ও পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সেই সব সংস্কার, সম্পর্ক, মূল্যবোধ ও প্রত্যয়, যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে সমূহ মানব জীবন।

দুটি মানুষ হুবহু কখনোই অভিন্ন নয়। তার আছে নিজস্ব জীবন, পরিবেশ, সমস্যা, বিশ্বাস, আকাঙ্ক্ষা, দায়িত্ব ও নীতি—এই বহমানতার মধ্যে মৌল চিরন্তনতা হচ্ছে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, পজেটিভ ও নেগেটিভ; গ্রহণ এবং বর্জনের সঙ্গে অন্তর্যুক্ত বাস্তব অবস্থা। দু'জন স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত মানুষ মানে দুটি চিন্তার দ্বন্দ্ব, ভাবনার সংঘর্ষ, বুদ্ধির লড়াই। এবং এভাবেই মানুষ মানুষের কাছে আবিষ্কৃত হয়েছে, গড়ে তুলেছে স্বাধীনও নিরপেক্ষ মূল্যবোধে। সাঁত্রে বলেছেন 'Man is condemned to be free'; —স্বাধীনতাই তার চারিত্র্য, স্বেচ্ছাচারই তার স্বধর্ম। যে মূল্যবোধে সে প্রতিষ্ঠিত সেই মূল্যবোধ আরোপিত নয়, নির্দ্বন্দ্বও নয়; স্বসৃষ্ট স্বনির্বাচিত। মানুষ এবং স্বাধীনতা অচ্ছেদ্য।

কখনো কখনো তার স্বরূপ সর্বগ্রাসী, আত্মধ্বংসী, শৃংখলা ও পারম্পর্যহীন। মানুষ তার স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনেই তাই তৈরী করেছে তার জীবনযাপনের প্রামাণ্য নৈতিক মানদন্ড, সামাজিক প্রথা, সংস্কার, পারিবারিক রীতিনীতি, আইন ও কর্তব্য।

অন্তর্সত্তায় মানুষ স্বাধীন, কিন্তু পারিপার্শ্বিকতা তথা বিশ্ব প্রকৃতি এই নিরঙ্কুশ স্বাধীনতাকে অনুমোদন করে না কখনো। তাই আচরণের ক্ষেত্রে তৈরী হয় নিয়মনীতি, চিন্তার ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব। এবং সেখানে অধিকারও শ্রেণী সংগঠনের প্রশ্ন একটি বড় প্রশ্ন হিসেবে দেখা দেয়। অবশ্যই তাতে করে বলা যায় না, উৎপাদন পদ্ধতি এবং সম্পত্তির বিবর্তনশীল বিকাশের মধ্যে দিয়ে যে সমাজ কাঠামো এসেছে তা পুরোপুরি বিশ্ব প্রকৃতির নিয়ম ও চিরন্তনতার অধীন। প্রকৃতিগত স্তরবিন্যাস শ্রেণী চেতনার একটি মৌলিক বিষয় তবে এসট্যাব্লিসমেন্টের সঙ্গে তা সংযুক্ত নয়। চিন্তা ও বুদ্ধির বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সমষ্টি বিবাহে থেকে জোড়বন্ধ পরিবারের উদ্ভব ঘটে। সমষ্টি বিবাহ বিচ্ছেদ বা তৎসংক্রান্ত নিয়মনীতির কোনো বালাই ছিল না। জোড়বন্ধ পরিবার এবং তার থেকে এক স্বামী এক স্ত্রীর পরিবারের অন্তর্বর্তী স্তরগুলোর মধ্যে আসছে কৃষি, শিল্প এবং শ্রম শক্তির পরিবর্তনের পর্যায়। এই স্তর পর্যায়ে এসে নারীর বিনিময় মূল্য দেখা দেয়, যা সমষ্টি বিবাহোদ্ভূত আদিম সাম্যবাদী সমাজে দেখা যায় না। ওই পর্যায়ে মাতৃতান্ত্রিকতার চূড়ান্ত বিপ্লব ঘটেছিল বলা যায়।

পরবর্তীতে সতীত্ব এবং সন্তানের পিতৃত্বের প্রশ্নে পুরুষ নারীকে সম্পূর্ণভাবে তার অধীন করে। এ ক্ষেত্রে স্ত্রী হত্যা দায়ও পুরুষের অধিকার প্রয়োগের মধ্যে গণ্য করা। এঙ্গেলসের 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' বইতে নেপোলিয়ানের কোড় থেকে আলোচনা করা হয়েছে। এক স্বামী এক স্ত্রীর পরিবারে এসে বিবাহ প্রথার বন্ধন অনেক বেশী পাকাপোক্ত হয়েছে। প্রাচীন যুথবন্ধ যৌনাচার এবং পরে জোড়বন্ধ পরিবারের মতো তখন সম্পর্কচ্ছেদের স্বেচ্ছাচার ওই পর্যায়ে প্রায় নেই বললেই চলে। এই স্তরে কেবল স্বামীই বিবাহ বন্ধন ছেদ করে স্ত্রীকে ত্যাগ করার ক্ষমতা রাখে। অর্থাৎ এঙ্গেলসের ভাষ্য অনুযায়ী ঃ চিন্তা ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে শুরুর মুহূর্ত থেকেই নারী পুরুষের সম্পর্ককে মানবাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়নি। বিবাহ প্রথার ভিত্তিতে যখন এই সম্পর্ককে যাচাই করা হলো, তখনো তার প্রধান স্তম্ভ হলো সামন্ত-সামাজিকতা এবং অদ্যাবধি তা পুঁজিবাদী মালিকানা সম্পর্কের দ্বারা প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত। সেই থেকে মেয়েরা ক্রমাগত সামন্ত সমাজ যথা আজকের আধুনিক বুর্জোয়া পরিবার পর্যন্ত প্রয়োজনে কুক্ষিগত হয়েছে, ব্যবহৃত হয়েছে এবং সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হয়েছে।

এই দেশ এই সমাজ ঃ ধনী গরীবের সংসার

মীরপুরের একটি এলাকা ভাসান ট্যাক। ১৯৭৭ সনে রাজধানী ঢাকা শহর থেকে বাস্তুহারা ও ভাসমান জনতাকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে যখন দত্তপাড়া, টঙ্গী, ডেমরা প্রকল্পের সূত্রপাত হয়েছিল, সে সময় এই এলাকাটিও তার অন্তর্ভুক্ত হয়, উদ্বাস্তু মানুষের একটি বিরাট অংশ যেখানে স্থানান্তরিত। এই এলাকার এক জরীপে দেখা গেছে, ১০০% জন মহিলার মধ্যে ৬০% জনই তালাকপ্রাপ্ত এবং একাধিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ। প্রায় তিরিশ হাজার জনবসতি পূর্ণ এলাকাটিতে খেটে খাওয়া, মেহনতি

পেশায় নিয়োজিত মানুষের সংখ্যাই বেশী। এই জন মানুষের মধ্যে ১০% বেশী মেয়েও নেই যারা এক স্বামীর ঘর করছে।

হালিমা নামের একজন নারী শ্রমিকের কথা এখানে বলা যায় যে পাথর ভেঙ্গে তার মায়ের সঙ্গে সংসার চালায়। চৌদ্দ বছর বয়সেই পর পর চারজনকে বিয়ে করে, চার-বারই তালাকপ্রাপ্ত হয় সে। হালিমা তার আইনগত অধিকার আদায় করে নিতে পারেনি চারজন স্বামীর একজনের কাছ থেকেও। কেননা কোর্টের আঙিনা পর্যন্ত যেতে যে অর্থ, সামর্থ, ধৈর্য প্রয়োজন, তা তার নেই।

কুষ্টিয়ার মেয়ে সাজেদা, যৌতুকের একবান টিনের জন্য তার প্রথম বিয়ে ভেঙ্গে যায়। দ্বিতীয়বার বিয়ে হয় একজন রিক্সাচালকের সঙ্গে। দ্বিতীয় স্বামীর দ্বারা সে অসংখ্যবার তালাকপ্রাপ্ত হয় এবং ওই অবস্থাতেই তিনটি সন্তানের মা হতে হয় তাকে। সাজেদা এখন ঝিয়ের কাজ করে নিজের পেট চালায়।

সমাজে এই সব সাজেদা বা হালিমাদের কোনো শারীরিক নিরাপত্তা নেই। এই নিরাপত্তাহীনতার কারণেই তারা নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হয়েও ফ্রিস্টাইলে তালাক দেওয়া স্বামীর ঘর করে।

গ্রামাঞ্চলে অন্ততঃ ৩০টি তালাকের ক্ষেত্রে ২০টিতেই দেখা যায় স্বামী কোনো রকম আরবিট্রেশন বা সালিশের ধার না ধেরে একাধিক বিবাহ করছে। প্রথম স্ত্রী যখন বাদী হলো, দেখা গেল, বহু পূর্বেই স্বামী বিশেষ বিশেষ কারণ দর্শানোর প্রেক্ষিতে স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে কাগজে-কলমে, এমনকি তালাকনামাতে সালিশ কমিটি ও স্ত্রী পক্ষের সম্মতি স্বাক্ষরের মাধ্যমে তার দেনমোহর বা খোরপোষের টাকাও মিটিয়ে দিয়েছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ওই বঞ্চিত রমণীর চোখের জল নষ্ট করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না; কেননা বাংলাদেশে একশো জন মহিলার মধ্যে পাঁচজন মাত্র তার ফরিয়াদ নিয়ে আদালতে যাবার সামর্থ্য রাখেন। এবং এদের বাস মেট্রোপলিটান শহরগুলোতে।

১৯৭১ সনের আগের এক তরফা তালাকের এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন পাত্রীপক্ষ নিজেরাই অনেক ক্ষেত্রে তালাকের জন্য এগিয়ে যায়। অধিকাংশ বিয়ে অবশ্য ভাঙ্গছে স্বামীর দিক থেকেই। গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক সমস্যা বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার একটা বড় কারণ। যৌতুকের জন্য একটি মেয়ে দু'মাস, ছ'মাস, বড়জোর এক বছর স্বামীর ঘর করে, পরে তাকে খালি হাত-পায়ে ফিরে আসতে হয় বাপের সংসারে।

ভাসমান জনগোষ্ঠী—যারা ধানকাটা, মাড়াই, চৈত্র-ফসলের কাজ, নালাকাটা, বেত বোনা, শহর এলাকায় ঘর-বাড়ি মেরামত ও তৈরীর কাজে জড়িত সেই শ্রেণীর পুরুষেরা সাধারণত দুই বা ততোধিক বিবাহ করে। এদের কর্মস্থলের ঘন ঘন পরিবর্তন হয়। দেখা যায়, এইসব ভাসমান পেশাজীবী পুরুষেরা নতুন কর্মস্থলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বারের জন্য স্ত্রী গ্রহণ করে, পরে কাজের মরসুম শেষ হলে ওই বিবাহকে তারা অস্বীকার করে চলে যায়। যেহেতু বাংলাদেশের গ্রাম সমাজের অধিকাংশ বিয়েতে কাবিন হয় না এবং বর্তমানে যে আইন চালু রয়েছে, কাবিনে স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাকের অধিকার প্রদান করে থাকে তবেই সেক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে

পারবে। আইনের এই আধুনিক বিধানও মেট্রোপলিটান সাম্রাজ্যবাদের করতলে পিষ্ট বিদ্যুৎ বিহীন পল্লীগুলোতে (পল্লী বিদ্যুতায়নের তৎপরতা সত্ত্বেও) পেঁছায় না. সেহেতু তথাকথিত আইনের অধিকারও তাদের জন্য নয়।

নামে মাত্র স্বামী রয়েছে, এ রকম বহু মেয়ে বিভিন্ন এন. জি. ও (বেসরকারী প্রতিষ্ঠান) এবং বিভিন্ন গার্মেন্টস কারখানায় কাজ করছে। সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে মানসিকভাবে এই সমস্ত মেয়েরা বিচ্ছেদ, দেনমোহর অথবা ভরণপোষণের দাবী-দাওয়া সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছে। শুধুমাত্র একটি বিয়ের লাইসেন্স নিয়েই তারা সন্তুষ্ট থাকতে চায়।

ফখরুন্নেসা একটি গার্মেন্টস-এ কাজ করে। বিয়ের দু'বছর পর যৌতুকের কারণে তার স্বামী তাকে তালাক দেয়। কোর্টে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়নি। মুখে মুখে তালাক। ফখরুন্নেসা খোরপোষ আদায়ের চেষ্টা করেছিল, গ্রাম পঞ্চায়েত তাতে বাধা প্রদান করে। ফখরুন্নেসার আবেদন গ্রাম পঞ্চায়েতকে ডিঙিয়ে আরো উর্ধ্বতন মহলে পেঁছাতে পারেনি। কেননা ফখরুন্নেসা কোনো নাম নয়, একটি শ্রেণী এবং এই শ্রেণীটি অধিকারের প্রশ্নে শোষিত হচ্ছে ক্ষমতাবান প্রভুদের দ্বারা।

টাংগাইলের জামেলা, ঢাকার একটি উঠতি গার্মেন্টস-এ কাজ করছে। তার বিরুদ্ধে তার স্বামীর অভিযোগ, স্ত্রী দীর্ঘাঙ্গী। সাধারণত বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে এ ধরনের অভিযোগ, বাংলাদেশে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে শোনার কথা নয়। আদালত জামেলোকে ৯ হাজার টাকার ডিক্রি দিয়ে ছিল। কিন্তু তার স্বামী উচ্চ আদালতে আপীল করলে জামেলার আর লড়াই করা সম্ভব হয়নি। ঢাকা শহরে এ রকম অসংখ্য গার্মেন্টস রয়েছে, সেখানে জামেলা, শাহানা, ফখরুন্নেসার মত ভাগ্যবিড়ম্বিত মেয়েরা কাজ করছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে অন্ততঃপক্ষে একশ' পঁচিশ জনের ভিতরে পঁচিশ জনই তালাকপ্রাপ্ত। এরা তালাকের শিকার। বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার কাবিন ও দেন মোহরানার সুবিধা, এবং বিবাহ ও বিচ্ছেদের ব্যাপারে নারীদের সপক্ষে যে সমস্ত বিধান চালু রয়েছে তার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত এরা।

এতো গেল শ্রমজীবী মানুষ ও "নীচু তলার' মানুষের ঘর সংসার ও ঘর ভাংগার চালচিত্র। এবার দেখা যাক আমাদের উঁচু মহলের অবস্থাটা কি রকম। আমরা দু'চারটি ঘটনা তুলে ধরছি যা থেকে অবস্থা কিছুটা আঁচ করা যাবে।

(ক) উচ্চ শিক্ষিত সুন্দরী মার্জিত তরুণী দেখে শুনে যোগ্য এক ব্যক্তিকে জীবন সঙ্গীরূপে বরণ করেছিলেন। কিন্তু সুখের সংসার সন্দেহের আগুনে পুড়ে তাল। তার অপরাধ সে আকর্ষণীয়া। স্বামী তাকে ঘরে তালাবন্ধ করে কাজে যেতেন। এক পর্যায়ে সে মহিলা বাবা মায়ের কাছে ফিরে আসেন। কিন্তু স্বামী তার সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার করেননি।

(খ) জনৈক প্রতিষ্ঠিত কবি প্রথম স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছেন প্রেমিকার জন্য। স্ত্রীকে অত্যন্ত পীড়ন করে তিনি 'মোহরানা বুঝে পেয়েছেন,' এই মর্মে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ে তাকে তালাক দেন।

(গ) জনৈক নৃত্য শিল্পী. স্বামীর সাথে তার অবনিবনা থাকলেও তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন মানিয়ে চলতে। তার সাংস্কৃতিক ক্রিয়া কাণ্ড থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে স্বামী সন্তান নিয়ে সুখী হবেন ভেবেছিলেন। মায়ের বাড়ী সপ্তাহখানেকের জন্য বেড়াতে এসেছিলেন ছেলেকে নিয়ে। কিন্তু আর ফেলে আসা ঘরখানি ফিরে পাননি।

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ধারিণী এক মহিলা একটি কন্যা সন্তানের মা হয়েছিলেন স্বামীর যৌন বিকৃতি ও লাম্পট্যকে মেনে নিয়ে অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে দিন যাপন করেছিলেন। স্বামীকে পরিত্যাগ করলে সমাজে নিন্দনীয় হবেন, পারিবারিক সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে, সন্তানকে হারাতে হবে এই ভয়ে সব নির্বিচারে সহ্য করেছেন। কিন্তু যেদিন স্বামী নতুন বিয়ে করে দ্বিতীয় স্ত্রী ঘরে এনে তুললেন সেদিন তিনি ফিরে এলেন বাবার বাড়ী। সম্মানিত স্বামী চরিত্রের অপবাদ দিয়ে নিজের অপরাধের গুরুত্ব স্খালন করেছিলেন।

উপরোক্ত ঘটনার নায়িকারা তাদের আইন সিদ্ধ বিবাহকে টিকিয়ে রাখতে বা ভাঙতে আইনকে অনুকূলে পাননি। যেটুকু আইন তাদের জন্য রয়েছে তাকেও যথাযথ ব্যবহার করতে পারেননি। কেননা আইনের মধ্যে এত ফাঁকি রয়েছে যে লড়তে গেলে সময় শক্তি ও সম্পদের অপচয় হয়, ফলাফল শূন্য। দ্বিতীয়ত, সামাজিক অসহযোগিতা, আইন সম্মত বিচার পেতে, যে পথে যেতে হয় তাতে বাদী বিবাদী আইন আদালত সব মিলে, কর্দমাক্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হবার সমূহ ভয়—সমাজে নিন্দিত ও আলোচিত, এক কথায় লোক লজ্জার শঙ্কা। এই ভয়ে অনেকেই আইনের সাহায্য নেয়া থেকে বিরত থেকেছেন। এ আইন হচ্ছে এক হাতে দিয়ে আর এক হাত দিয়ে নিয়ে নেওয়া।

যে সব ঘর ভাঙার ছবি উপরে তুলে দেয়া হলো তা নিত্যদিনের হাজারো ছবির কয়েকটি মাত্র। উপরোক্ত ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে মূলতঃ স্বামীদের কারণেই তালাক বা বিচ্ছেদের ঘটনাগুলো ঘটছে। অথচ প্রচলিত আইন/মুসলিম আইনে এতদসংক্রান্ত কিছু বিধান রয়েছে। আমরা সংক্ষিপ্তভাবে এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করছি।

মুসলিম আইন

মুসলিম বিশ্বের দেশগুলিতে ইসলাম ধর্মীয় আইন অনুসৃত হয়ে আসছে। সময়কালের পরিপ্রেক্ষিতে যদিও তার রদবদল ঘটেছে তবু দেশওয়ারী এর প্রকৃতিগত ভিন্নতা রয়েছে, এবং মুসলিম আইন হিসেবে এর অভিন্ন তাৎপর্য রয়েছেই।

ইসলাম ধর্মে স্বামীকে যেমন স্ত্রীকে তালাক দেবার সর্বময় ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, তেমন স্বাধীনতা স্ত্রীদের ক্ষেত্রে দেয়া হয়নি। অর্থাৎ স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে কোনো স্ত্রী তার স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে পারে না। যদিও ইসলামের প্রথম যুগে স্ত্রীদের তালাক দেবার দৃষ্টান্ত রয়েছে। হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর এক সাহাবা সাবেত বিন

কায়েসের ঘটনাটি এর নজির। শ্ধ্মাত্র কুৎসিৎ—এই কারণে তার স্ত্রীরা তাঁকে মন থেকে গ্রহণ করতে পারেননি এবং সেজন্য তারা বিচ্ছেদ প্রার্থনা করে রসুলের কাছে অভিযোগ করেছিলেন। হজরত (সঃ) তাঁদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন, তবে সেক্ষেত্রে স্বামী প্রদত্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবার বিনিময়ে তাঁরা বিচ্ছেদ পেয়েছিলেন।

এ পর্যায়ে মুসলিম পরিবার আইন সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। 'মুসলিম পরিবার আইন' আয়ুব খানের শাসনামলে গৃহীত '১৯৬১ সালে মুসলিম পরিবার আইন ৮ নং অডিন্যান্স।' এই আইনে মেয়েদের জন্য যতটুকু অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত সার এ রকম ঃ

বহু বিবাহ

সপত্নীর সঙ্গে বসবাস বা স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়া দুই একজন রমণীর জন্য অবমাননাকর ও যন্ত্রণাদায়ক। এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য বা বহু বিবাহ প্রশমনের জন্য সালিশ পরিষদের কথা বলা হয়েছে। সালিশ পরিষদের অনুমতি ছাড়া স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও পুনর্বিবাহ করলে স্ত্রী বা স্ত্রীগণের সমস্ত দেন-মোহরের টাকা পরিশোধ করতে হবে। স্বামী যদি এককালীন তা পরিশোধ না করেন, তাহলে তা বকেয়া রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাবে। যদি কেউ সালিশ পরিষদ ও স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া বিবাহ করেন এবং তা প্রমাণ হলে এক বৎসর পর্যন্ত বিনাশ্রমে কারাদণ্ড অথবা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা, অথবা উভয় প্রকারে দন্ডনীয় হবেন।

তালাক

স্বামী ইচ্ছা করলে যে কোনো সময় যে কোনো কারণে কিংবা বিনা কারণে স্ত্রীকে তালাক দিতে পারবেন তবে তাকে নির্ধারিত দেন-মোহরের টাকা পরিশোধ করতে হবে। দেন-মোহর পরিশোধ না করলে সে ব্যক্তি দণ্ডিত হবেন।

স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারবেন তখনই যদি স্বামী বিবাহকালীন চুক্তি কাবিন নামাতে স্ত্রীকে তালাক দেবার অধিকার দিয়ে থাকেন।

স্বামী যদি স্ত্রীর ভরণ-পোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ না করেন তাহলে স্ত্রী বা তার অভিভাবক স্থানীয় চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করতে পারবেন। চেয়ারম্যান স্বামীর আয় অনুসারে খোরপোষ নির্দিষ্ট করে দেবেন।

দেন-মোহর

বিবাহনামা অনুসারে মোহরানার টাকা স্ত্রী দাবী করলে তা তৎক্ষণাৎ পরিশোধ করতে হবে। এই হচ্ছে বাংলাদেশের মুসলিম পরিবার আইনের সারমর্ম।

১৯৬১ সালের অডিন্যান্স অনুযায়ী তালাক সম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারে কতগুলো ফরম্যালিটি রাখা হয়। যেমন তালাক ঘোষণার পর স্বামী যত শীঘ্র সম্ভব চেয়ারম্যানকে লিখিত নোটিশ দেবেন। এবং নোটিশের একটি নকল স্ত্রীকে দেবেন।

অন্যথায় এক বছর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা হবে। তালাক প্রত্যাহার না হলে চেয়ারম্যানকে নোটিশ দেবার পর নব্বই দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ হয় না।

তালাক ব্যতীত অন্যভাবে বিচ্ছেদ হলে, যেমন স্বামী তার স্ত্রীকে খোরপোষ না দিলে, আইন অনুসারে অন্যকে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া চেয়ারম্যানের কাছে আবেদন করতে পারেন। চেয়ারম্যান বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি সালিশ পরিষদ গঠন করবেন। এবং এই সালিশ পরিষদ স্বামী কর্তৃক দেয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করে একটি সার্টিফিকেট দিতে পারবেন। স্বামী বা স্ত্রী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত ফি দিয়ে সার্টিফিকেটটি পুনর্বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট মহকুমা অফিসারের নিকট আবেদন করতে পারবেন এবং তার সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত। সে ক্ষেত্রে এর বৈধতা সম্পর্কে আদালতে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না। কাবিন নামায় দেনমোহর পরিশোধের পদ্ধতি সম্পর্কে কোন উল্লেখ না থাকলে দেনমোহরের সমস্ত অর্থ স্ত্রী দাবী করলে তা তৎক্ষণাৎ স্বামী দিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন। মুসলিম বিবাহ আইন মোহরানা প্রথাকে মেয়েদের একটি অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করে। আমাদের সামাজিক মনস্তত্ত্বও তাই-ই বলে। কিন্তু মূলতঃ কি তাই? দেনমোহর কি নারীকে পণ্য হিসেবে উপস্থাপিত করে না? স্মরণ করিয়ে দেয় না দাসযুগকে?

মূল্যবোধ পরিবর্তনশীল, তাই একযুগে যা ছিল অধিকার আজ তাই-ই অবমাননাকর। আইনের জন্যে নতুন নতুন নীতিমালা প্রণীত হচ্ছে, গৃহীতও হচ্ছে, কিন্তু মৌলিক পরিবর্তন এগুচ্ছে কি? ১৯৬১ সালের মুসলিম পরিবার আইন তৎকালীন পাকিস্তানের মহিলাদের সৎ, সাহস ও সংগ্রামে অর্জিত ফল। যদিও অসম্পূর্ণ, খণ্ডিত।

হিন্দু আইনে বিবাহ বিচ্ছেদ

১৯৪৬ সালের আগ পর্যন্ত হিন্দু আইনে স্ত্রী ত্যাগের ব্যবস্থা থাকলেও, স্বামী ত্যাগের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। '৪৬ সালে প্রথম বিবাহ বিচ্ছেদের ওপর আইন পাশ হয়। ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইনের ১৩ নং ধারায় বিচ্ছেদের কতগুলো নির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন: ধর্মান্তর গ্রহণ, ব্যাভিচার, যৌনব্যাধি, মস্তিষ্ক বিকৃতি, নিরুদ্দিষ্ট হওয়া, কুষ্ঠ রোগ, সন্ন্যাস গ্রহণ এবং দাম্পত্য কর্তব্যে বিরত থাকা। ১৯৭৬ সালে এই আইনে সংশোধনী দেওয়া হয় এবং বিচ্ছেদের শর্তাবলীর পরিবর্তন ঘটানো হয়। বিচ্ছেদের শর্তগুলোর মধ্যে কুষ্ঠ ও যৌন রোগ সম্বন্ধে যে তিন বছরের সময়কাল নির্দিষ্ট ছিল, সেই সময়কালটি সংশোধিত আইনে তুলে দেয়া হয়। Judicial sepapration অর্থাৎ আইনগতভাবে পৃথক বসবাসের ডিক্রি হয়ে যাবার পর হিন্দু বিবাহ আইনের বিধান মত দু'বছরের পরিবর্তে ১ বছর সহবাস না করলে বিচ্ছেদের জন্য আবেদন আনা যেতে পারে বলে সংশোধনী আইনে বলা হয়েছে। হিন্দু বিবাহ আইনের ১৩ নং ধারায় সঙ্গে যুক্ত ১৩-এ এবং ১৩-বি উপধারায়ও

গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটানো হয়। হিন্দু বিবাহ আইনে বিয়ের পর তিন বছর অতিবাহিত না হলে বিচ্ছেদের ব্যবস্থা নেয়া যায় না বলে যে বিধান আছে তার মেয়াদ এক বছর করা হয়েছে সংশোধিত আইনের ১৪ নং ধারায় পরিবর্তন ঘটিয়ে।

বাংলাদেশের নারী সমাজ তাদের অধিকার নিয়ে ভাবেন না

'বিবাহ' শব্দের আভিধানিক অর্থ বিশেষভাবে বহন। অর্থাৎ বিবাহ শব্দের মৌলিক তাৎপর্য দাঁড়াচ্ছে 'যাকে বিশেষভাবে বহন করা হয়'। তাহলে আক্ষরিক এবং ব্যবহারগত দু' অর্থেই বিবাহ শব্দটি মেয়েদের জন্য অসম্মানজনক।

মুসলিম বিবাহ একটি চুক্তি। এই বিবাহ চুক্তির শর্তাদি নির্দিষ্ট ফর্ম কাবিন নামায় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা থাকে। এবং এই সব শর্তাবলী যথাযথ পূরণের মাধ্যমে বর-কনে, অভিভাবক, উকিল, সাক্ষী ও কাজীর স্বাক্ষর করতে হয় এই কাবিন নামায়।

এই বিবাহ দলিল (কাবিননামা) পারিবারিক জীবনের একটি অতি মূল্যবান দলিল। বিশেষ করে মহিলাদের জন্য। পুরুষ প্রধান সমাজ তাদের কি দিচ্ছে তার নজির এই দলিল। কিন্তু ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্তরের মহিলাদের সাথে আলাপ করে দেখেছি অধিকাংশই জানেন না কাবিননামাতে কি লেখা আছে। বেশীর ভাগই স্বাক্ষর করেননি। তাদের পক্ষ থেকে অভিভাবকরা স্বাক্ষর করেছেন। তারপর এই দলিলটি একটি সাধারণ স্মারকলিপি হিসেবে গণ্য হয়েছে। কেউ এটি যত্ন করে তুলে রেখেছেন, কেউ বা হারিয়ে ফেলেছেন। এটা নিয়ে বিশেষ মাথাও ঘামাননি, কোনো আগ্রহ বা কৌতূহল নিয়ে পড়ে দেখেননি ওতে কি লেখা আছে।

অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত মহিলাদের এ বিষয়ে অজ্ঞানতা স্বাভাবিক এবং ক্ষমার্হ। কিন্তু শিক্ষিত মহিলাদের এই অজ্ঞানতা বিস্ময়কর। আইন তাদের জন্য সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে কতখানি অধিকার নির্দিষ্ট করেছে এ বিষয়ে তারা কিছু জানেন না। তাদের সামাজিক অবস্থান সমাজে পুরুষদের অনেক নীচে নির্দিষ্ট। এবং তারা এই আইনের মর্যাদা ও স্বীকৃতিহীন জীবনের কাছে আত্মসমর্পণ করে আপোষ করছেন, দিন যাপন করছেন।

কাবিন নামাতে স্ত্রীদের কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা, কতখানি আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দেয়া হয়েছে এ বিষয়ে তারা অবহিত কিনা এ নিয়ে এক জরীপ করা হয়।

এই সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৮০% কিছুই জানেন না। এদের অনেকে মোহরানার অঙ্ক ঠিকমত বলতে পারেননি। শতকরা ৬০ জন মোহরানার অঙ্ক ঠিক জানেন মাত্র। শতকরা ৩০ জন বলতে পেরেছেন কাবিনে তার স্বামীকে তালাক দেবার অধিকার আছে বলে। স্বামী বিদেশে থাকলে ভরণপোষণ না করলে তিনি তালাক দিতে পারবেন।

কাবিনে লেখা বিষয়বস্তু সম্পর্কে যারা জানেন না তাদের কয়েকজন

সেলিনা চৌধুরী (গৃহিণী); মাহমুদা খাতুন (অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়); অধ্যক্ষ সৈয়দা শামসে আরা বেগম (সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ); অধ্যাপিকা নাইমা আলী (সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়); গীতি আরা চম্পা (ব্যবস্থাপনা পরিচালিকা এডকম এডভার্টাইজার); অধ্যক্ষ হোসনে আরা শাহেদ ; নাজমা রনবী (গৃহিণী); প্রভাষক আনোয়ার জাহান ; অধ্যাপিকা রুবী রহমান ; নাইমা মনসুর (গৃহিনী); মিসেস ওয়াদুদ (ফার্মাসিস্ট ; জাহানারা আহসান (গৃহিণী); উম্মুল ফাতাহ (শিক্ষয়িত্রী, মোহাম্মদপুর গার্লস স্কুল); সাহেদা আলতামাস (নৃত্য শিল্পী); মুনিরা ইকবাল (সহকারী অধ্যাপিকা, সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ); অধ্যাপিকা কাজী মদিনা ; রোকেয়া রহমান (শিক্ষয়িত্রী, ভিকারুননেসা নূন স্কুল); মাহবুবা রশিদা (শিক্ষয়িত্রী, অগ্রণী স্কুল); নাসিমুন আরা হক (সাংবাদিক); সেলিমা খালেক (প্রভাষক, আদমজী কলেজ); রহিমা পাশা (গৃহিণী); হামিদা খামিদা খানম (প্রভাষক, উদ্ভিদ বিজ্ঞান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়); রানু মহসিন (গৃহিণী); দিনারজাদী মাহফুজউল্লাহ (কর্মজীবী); হাজেরা মতিন (গৃহিনী); মালেকা বেগম (সম্পাদক, সচিত্র সন্ধানী); গীতি বিল্লাহ (পোশাক ডিজাইনার); মুনিরা ইমদাদ (ব্যবসায়ী); জিনাত রেহানা (গৃহিণী); লায়লা হাসান (নৃত্য শিল্পী); রওশন আরা আক্তার (গৃহিণী): জোহরা রহমান (গৃহিণী) পারভিন কাদের (গৃহিণী); সেহেলী চৌধুরী (গৃহিণী); হালিমা বেগম (প্রভাষক, তিতুমীর কলেজ); সেলিনা বেগম (গৃহিণী); সাহেদা আলম (সংবাদ প্রযোজিকা, বিটিভি); কানিজ সারোয়ার খান (ভিডিও ফটোগ্রাফার); মমতাজ বেগম (প্রভাষক, বদরুন্নেসা কলেজ); সিরিয়া হক (গৃহিণী); সেহেলী সুলতানা (গৃহিণী); জান্নাতুল ফেরদৌস (গৃহিণী); নুরজাহান বেগম (এক্সরে বিভাগ, ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন); নাদেরা খাতুন (গৃহিণী); সালেহা বেগম (গৃহিণী); মোস্তফা খাতুন (গৃহিণী); পিয়ারা বেগম (গৃহিণী); আসিয়া খাতুন (গৃহিণী); নাগিনা রহমান (গৃহিণী); জোরো খাতুন (গৃহিণী); তাহমিনা সিরাজ (গৃহিণী) ফরিদা বেগম (গৃহিণী); নাগিস হোসেন (গৃহিণী); রহিমা বেগম (গৃহিণী); আফরোজা ফেরদৌস (গৃহিণী); হোসনে আরা ফেরদৌস (গৃহিণী); সাইদা কবির (গৃহিণী); সালেহা আখম (গৃহিণী); বেগম বুলবুল আহমেদ (গৃহিণী); রাবিয়া খাতুন (গৃহিণী); মালেকা পারভিন (গৃহিণী); আনোয়ারা বেগম (গৃহিণী); হাসিনা ইফতেখার (গৃহিণী); সুরাইয়া কবীর (গৃহিণী); রাজিয়া বেগম (গৃহিণী); নাজমা ইসমাইল (গৃহিণী); নুরুন্নাহার বেগম (গৃহিণী); সাইদা চৌধুরী (গৃহিণী); মাসুদা খাতুন (গৃহিণী); খুরশীদ জাহান (গৃহিণী); নাইমা আক্তার (গৃহিণী); শাহনাজ হাসান হাসান (গৃহিণী); শবনম নেসার (গৃহিনী); মাজেদা খোন্দকার (গৃহিণী)।

কাবিনে লেখা বিষয়বস্তু সম্পর্কে যারা জানেন তাদের কয়েকজন

অধ্যাপিকা জাহেরা আশরাফ (ইতিহাস বিভাগ, বদরুন্নেসা কলেজ); রেখা আহমেদ (গ্রুপ থিয়েটার); শিরিন আমিন (গৃহিণী); খালেদা আনোয়ার

(গৃহিণী) ; মাহমুদা চৌধুরী (সাংবাদিক) ; হাবিবা আখতারী (গৃহিণী) ; হাফসা খান (গৃহিণী) ; খাদিজা এদিব (গৃহিণী) ; শিরিন রহমান (গৃহিণী) ; শামীন আজাদ (অধ্যাপক, সাংবাদিক) ; হামিদা খান (প্রভাষক, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ) ; সেলিনা মাহমুদ (গৃহিণী) ; নাসরিন চৌধুরী (গৃহিণী) ; সুরাইয়া এনাম (গৃহিণী) ।

অচেতন সচেতনরাও

এ শহরের শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত মহিলাদের সাথে আইন সম্মত বিবাহ দলিল কাবিনামার শর্তাবলী সম্পর্কে কথা বলে দেখা গেছে শতকরা ৮০ জন এ বিষয়ে অবহিত নন। উচ্চ শিক্ষিত মহিলাদের এই অজ্ঞতা রীতিমত বিস্ময়কর। নিজস্ব পরিমণ্ডলে অত্যন্ত সুপরিচিত কয়েকজন মহিলার বক্তব্য এখানে আমরা তুলে দিচ্ছি।

প্রশ্নভুক্ত বিষয় ছিল : (১) তিনি কি জানেন বিয়ের দলিল কাবিননামাতে কি কি আছে ? (২) কি কি অধিকার আছে ? (৩) মোহরানা কত ? (৪) তালাক দেবার অধিকার আছে কি ?

এডকম বিজ্ঞাপন সংস্থার স্বত্বাধিকারী পরিচালিকা গীতি আরা সাফিয়া চম্পা এ সম্পর্কে জানেন না কিছু। তার বক্তব্য : "কাবিননামা কাগজে দলিল মাত্র। পুরুষরা এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপিকা মাহমুদা খাতুনও জানেন না। তার বক্তব্য : "ওটা চোখেও দেখিনি, রেজিষ্ট্রি হয়েছিল কিনা তাও জানি না। মোহরানা কত মনে নেই।"

সিদ্ধেশ্বরী কলেজের অধ্যক্ষ সৈয়দা শামসে আরা বেগম বলেন, "শর্ত সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই আমার। মোহরানা ২৫ হাজার টাকা।"

আরো বিস্ময়কর ও কৌতুকজনক বিষয় এই যে, সাপ্তাহিক বিচিত্রার সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী, যিনি নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সক্রিয় ও নারী প্রগতির অকুণ্ঠ সমর্থক, তাঁর স্ত্রী সেলিনা চৌধুরী জানেন না কাবিননামার বিষয়ভুক্ত শর্তাবলী। তিনি কাবিননামার হদিসও জানেন না।

দৈনিক বাংলার ফিচার লেখিকা এবং শেরে বাঙলা কলেজের অধ্যক্ষ হোসনে আরা শাহেদ এ বিষয়ে আধাআধি জানেন. মোহরানা ৩০ হাজার টাকা এটুকু তাঁর মনে আছে।

কবি রুবী রহমানও জানেন না তাঁর বিয়ের দলিলটিতে কি আছে।

এ বিষয়ে গ্রুপ থিয়েটারের বিশিষ্ট অভিনেত্রী রেখা আহমদের মন্তব্য : "কাবিন একটা ফার্স, ওতে মেয়েদের অধিকার স্বীকৃত নয়।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞানদের প্রভাষক হামিদা খানম জানেন, তবে আধাআধি। তাঁর তালাক দেবার অধিকার আছে।

বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী লায়লা হাসান সযত্নে সংরক্ষণ করেছেন তাঁর কাবিন-নামা। কিন্তু তিনিও জানেন না ওর মধ্যে কি লেখা আছে।

জনপ্রিয় চিত্র নায়ক বুলবুল আহমদের স্ত্রী ডেইজী আহমদও জানেন না এ বিষয়ে কিছু।

সাংবাদিক শামীম আজাদ এ বিষয়ে বিশেষ ওয়াকিবহাল। প্রসঙ্গত তিনি একটি কৌতুকজনক বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন "কাবিননামায় একটি ঘর পূরণ করতে হয়, পাত্রী কুমারী না বিবাহিতা। কিন্তু স্বামী বিয়ে করেছিলেন না কুমার এ বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই।"

চিত্র সমালোচক মাহমুদা চৌধুরী জানেন. তাঁর তালাক দেবার অধিকার আছে মোহরানার অঙ্কও তিনি মনে রেখেছেন।

ইডেন মহাবিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাষক সানজিদা আক্তার জানেন কাবিননামা তাকে কতটুকু অধিকার দিয়েছে।

বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের নেত্রী মহিলা পরিষদের সম্পাদক এবং সাপ্তাহিক সচিত্র সন্ধানীর সম্পাদক মালেকা বেগম জানেন না কাবিননামায় প্রদত্ত অধিকার সম্পর্কে। তিনি যদিও জানেন আন্তর্জাতিক মহিলা বিষয়ক আইন, জানেন অগ্রসর দেশগুলোর মহিলাদের অধিকার বিষয়ক আইন সম্পর্কে। এ বিষয়ে তার মত ঃ "আত্মনির্ভরশীল, কোনো মহিলার কাবিন নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই।"

বিশিষ্ট চিত্রকর কার্টুনিস্ট রণবীর স্ত্রী, নাজমা রণবীও কাবিননামার খোঁজ রাখেন না।

সাংবাদিক নাসিমুন আরাও কাবিন সম্পর্কে অজ্ঞ।

দেখা যাচ্ছে প্রগতিশীল আলোকপ্রাপ্ত মহিলারা যথেষ্ট অধিকার সচেতন হওয়া সত্ত্বেও স্বদেশের আইন জানা নেই তাদের। এরা অনেকে আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত। দাবী তোলেন বাংলাদেশের নারী সমাজের জন্য সে রকম আইন। এরা সচেতন, তবে তাদের চেতনার প্রকাশ ঘটেছে খণ্ডিতভাবে। সামগ্রিকভাবে নারী সমাজের জন্য এ মুহূর্তে যে আইন প্রয়োজন তা অর্জন করতে প্রচলিত আইনকে জানতে হবে, তাকে ভাঙতে ও বদলাতে হবে।

উপসংহার

তালাকের ব্যাপারটা পুরোপুরি একতরফা। সূর্যবানু খোজো বা মেহেরুন্নেসার মত কুলবধূরা জানতেই পারে না কখন কিভাবে তার সাধের সংসার অন্য আর একজন মহিলার হাতে সমর্পিত হয়। ওরা সন্তানকে দুধে-ভাতে বাঁচিয়ে রাখতে ভয় পায়। স্বামী পরিত্যক্তা সূর্যবানু বা খোদেজারা একপাল সন্তান নিয়ে অধিকারবিহীনভাবে, অনেক লোকলজ্জা ও ভ্রূকুটি সয়ে দিনে দিনে বেড়ে উঠতে থাকে অনাদরে, অবহেলায়। তালাকপ্রাপ্ত শিক্ষিত মহিলাদের কথা আলাদা—কারণ তাদের মাথার ওপর রয়েছে ছাদ,

খাবারের ভাবনাও তাদের করতে হয় না। তবু এরাই বিভিন্ন মেট্রোপলিটান মহিলা সংগঠনের নেত্রীপদ অলংকৃত করে রেখেছেন। মাঝে মধ্যে প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকেন, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে জোরালো দাবী উত্থাপন করেন, বস্তি এবং শিল্প এলাকার মেয়েদের নিয়ে মিটিং-মিছিল করেন। কিন্তু তা রোটারী ক্লাবের বাৎসরিক পদযাত্রার মত শহরের দর্শনীয় বস্তু হয়ে ওঠা ছাড়া আর কিছুই হয় না।

কাগজে আইন আছে, কিন্তু তার প্রয়োগ নেই। অথবা যারা ভুক্তভোগী তারা ঐ আইনের নাগাল পায় না। তাই বিবাহ বিধিবদ্ধ দলিল করে যাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল সেই ধনী ও মধ্যবিত্ত সমাজে যেমন এসব ঘটনা ঘটেছে ও ঘটছে তেমনি যারা সংখ্যায় বিপুল, অশিক্ষায়, দারিদ্র্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন নিয়ে বেঁচে আছে, তাদের বিয়ে সংঘটিত হয় মুখে মুখে খেয়াল খুশীমত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাজী থাকে না এদের বিয়েতে পৌরহিত্য করবার জন্য। ফুল বা প্রকৃতিকে সাক্ষী রেখে খুশীমত বিয়ে হয়, কোন দলিল থাকে না। স্বামী মুখে তিনবার তালাক উচ্চারণ করলে মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে সর্বহারা হয়। ওদের প্রায় নিস্তরঙ্গ জীবনে 'তালাক' একটা প্রচণ্ড ঢেউয়ের মত—একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

বর্তমান প্রচলিত পারিবারিক আইনের অবস্থান ইসলাম থেকে অনেক দূরে। মেয়েদের জন্য ইসলাম প্রদত্ত অধিকারের নামগন্ধ নেই এই আইনে। প্রাক ইসলাম যুগে নারীদের যে অধিকার ছিল তা পরবর্তী কালে মুসলিম সমাজপতিরা হরণ করেছেন। মেয়েদের পর্দার অন্তরালে পাঠিয়ে তাদের শক্তিহীন, স্থবির করে তোলা হয়েছে ক্রমাগত।

মোদ্দা কথা, সে আইন পুরুষদের জন্য, সে আইন মেয়েদের জন্য নয়। পারিবারিক জীবনের জটিল মুহূর্তে এই আইন না থাকা অত্যন্ত সঙ্কটজনকরূপে দেখা দেয়। সুস্থ সুখী দম্পতিদের জন্য কোন কিছু লাগে না, কিন্তু সে বন্ধন মোচনের সহজ সম্মানজনক সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়।

এই প্রেক্ষিতে ১৯৬১ সনের মুসলিম পরিবার আইন অসম্পূর্ণ। কারণ সেখানে মেয়েদের অধিকার স্বীকৃত নয়!

সুতরাং এদের জন্যে আইন চাই। এদের বিয়েকে মজবুত, জীবনকে নিরাপদ করবার জন্য আইন দরকার। কিন্তু শুধু আইনই যথেষ্ট নয়—এদের বিয়ে যাতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয় সেদিকে যেমন সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে তেমনি প্রতিটি বিয়ের রেজিস্ট্রেশন হওয়া ও তা নথিভুক্ত করা আরো জরুরী। আর সবচাইতে বড় কথা এই যে অশিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে এ ব্যাপারে সচেতনতা জাগ্রত করতে হবে। পত্রিকার পাতায় লিখিত বিবৃতি দিলে কোন কাজ হবে না। কারণ মহিলা সংগঠনের নেত্রীদের এটা অনুধাবন করতে হবে যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলে খবরের কাগজ পৌঁছে না; তেমনি দরিদ্র শ্রেণীর বধূ মাতা কন্যাদের অক্ষর জ্ঞানের সংগেও পরিচয় নেই। সুতরাং আইন যাতে পালিত হয়, সেজন্য সর্বাগ্রে ওদেরকে সচেতন করতে হবে এবং শিক্ষিতা মেয়েদেরও নিজেদের অধিকার রক্ষার স্বার্থে হতে হবে সচেতন।

বাজারের-মধু মধু নয়

বিশেষ প্রতিবেদক

ভুমিকা

কয়েকদিন আগে গিয়েছিলাম আজিমপুরে খালার বাসায়। ভোরে ঘুম থেকে ওঠে নাস্তার টেবিলে গিয়ে দেখি, দুই ছেলেসহ খালা আমার মধু মাখিয়ে পাউরুটি পরম তৃপ্তিতে খাচ্ছেন। আমি তো অবাক। চিরদিন দেখি সকালে সেদ্ধ আটার রুটির চল। এখন কি পরিবর্তন! জিজ্ঞেস করতেই বেরিয়ে আসলো আসল তথ্য।

টিভি এবং খবরের কাগজে এপির মধুর বিজ্ঞাপন দেখে খালু এখন হঠাৎ করে দীর্ঘায়ু হওয়ার সাধনায় ব্যস্ত। তাই অমনি কিনে নিয়ে এসেছেন এক বোতল মধু। এবং এখন বাড়ির ছেলে বুড়ো সকলে মিলে এপি'র মধুর সাহায্যে দীর্ঘায়ু ও শক্তি অর্জনের সাধনায় ব্যস্ত।

সত্যিই তো! সহজেই যদি এমন দীর্ঘায়ু লাভ করা যায়, তাহলে ক্ষতি কি?

শুধু আমার খালার বাড়িতে নয়, দীর্ঘায়ু ও শক্তি অর্জুনের সাধনায় এখন কমবেশী সকলেই দুর্বল। এই দুর্বলতা অবশ্য কয়েক বছর হল সৃষ্টি হয়েছে। কতকগুলো আয়ুর্বেদীয় কোম্পানী রেডিও, টিভি, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে সাইনবোর্ড বসিয়ে প্রতিনিয়ত এ সম্পর্কে আকর্ষণীয় ও তন্বী নারীর হাতে মধুর বোতল শুদ্ধ ছবিসহ প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। প্রথম প্রথম হয়ত মানুষ এসব প্রচারণা উপেক্ষা করবে, সাত-সতেরো ঝামেলায় হয়ত ভুলে থাকতে চাইবে এসব বিজ্ঞাপনী প্রচার। কিন্তু তারপর, মানুষ যাবে কোথায়? বিজ্ঞাপনের মোহজালে পড়ে, হয়ত বা সকালে রুটির সংগে কোন ভাজি তৈরীর ঝামেলার কথা ভেবে তাকে কিনতেই হবে মধু। আর কিনতে গেলেই, শক্তি বা এপি'র দোকান রয়েছে ক্রেতার বাড়ির মোড়ে। ক্রেতা হয়ত ভাববে, এত বড় প্রতিষ্ঠান, নিশ্চয় নির্ভরযোগ্য মধু। ব্যস। তারপরে কিনে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে দীঘায়ু ও শক্তি অর্জনের নিয়মিত সাধনা শুরু হয়।

আমাদের প্রশ্ন সত্যিই কি মধু খেলে দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়? আর যে দোকান থেকে মধুটা আপনার ঘাম ঝরানো পয়সা দিয়ে কিনে নিয়ে এলেন, তাও কি আসল মধু? আসুন, এবার সমস্ত বিষয়টা একটু নেড়েচেড়ে দেখা যাক।

মধুর ব্যবহার, উপকারিতা ও ইতিহাস

মধু ব্যবহারের ইতিহাস অনেক পুরনো। ঔষধীর গুণাবলী এবং মিষ্টির উৎস হিসেবে মধু প্রাচীন কাল থেকেই জনপ্রিয়। প্রাচীন মিশরে বিভিন্ন উপাদান সজীব রাখার জন্যে মধু ব্যবহার করা হতো। ভারতে এবং পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য দেশে ফল সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন খাদ্য প্রস্তুতে মধু ব্যবহার করা হতো। শুধু এ কয়েকটি ক্ষেত্রেই নয়—মধু ব্যবহার আরও ব্যাপক।

সাধারণভাবে মধুর ঔষধীর গুণাবলী সম্পর্কে আমরা কম-বেশী জানি। অনেক চিকিৎসক দুধের সংগে মধু মিশিয়ে বাচ্চাদের (বোতল দুধ নয়) সেবনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মধুতে ডেক্সট্রোজ (Dextrose) নামক যে উপাদান থাকে তা দ্রুত রক্তে মিশে যেতে পারে। মধুতে এমন সব উপাদান আছে যা তাৎক্ষণিকভাবে শক্তি উৎপাদনে সহায়তা করে। মধুর এই বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে কোন কোন চিকিৎসক বহুমূত্র রোগগ্রস্ত রোগীদের মধু সেবনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। বিশেষ জাতের পরাগ থেকে তৈরী মধু কুশ জ্বর (Hay fever) উপশমে সহায়তা করে।

মধুতে কিছু এণ্টিসেপ্টিক উপাদান থাকায় মধুকে কাটা, ছড়ে যাওয়া, পোড়া, এবং ফাটা স্তন (Sore nipple) নিরাময়ে ব্যবহার করা চলে। সিগারেট ও তামাক শিল্পে সুগন্ধি হিসেবে মধু ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া হিমাগারে ডিম সংরক্ষণেও মধু ব্যবহার করা হয়।

জলীয় পদার্থ ধারণের কারণে বেকারী শিল্পেও মধু ব্যবহৃত হয়। তবে মনে রাখতে হবে মধুর এসব ঔষধীয় গুণাবলী একমাত্র খাঁটি মধুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

মৌমাছি ও ফুল

ফুল ও মৌমাছির মধ্যে সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। মৌমাছির জীবন পুরোপুরি ফুল নির্ভর। কেননা ফুলই মৌমাছির খাদ্যের যোগান দেয়। সাধারণভাবে আমরা জানি ফুল তার সৌন্দর্যে গন্ধে আমাদের নয়ন-মন তৃপ্ত করে। কিন্তু ফুলই আবার মৌমাছিকে তার পরাগ (Pollen) এবং সুধা (Nectar) যোগান দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। কোন সন্দেহ নেই যে, পৃথিবীর প্রাচীনত্বের সংগে মৌমাছি ও ফুলকে আলাদা করে দেখা যায় না।

পরাগ আহরণের জন্যে মৌমাছি ফুলে থেকে ফুলে উড়ে উড়ে বেড়ায় এবং আহরিত পরাগের খুব সামান্য অংশই তাদের পরাগ থলি থেকে বাইরে পড়ে। কিন্তু সামান্য যেটুকু পরাগই বাইরে নিঃসৃত হোক না কেন তা মূলতঃ উদ্ভিদের পরাগায়ণে (Cross pollination) সাহায্য করে। মধু এবং মোম উৎপাদনের তুলনায় মৌমাছি কর্তৃক উদ্ভিদের ঐ পরাগায়ণের ব্যবহারিক মূল্য অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভবত এ কারণেই ব্যাপকভাবে কৃষি কাজ এবং নগরায়ণের ফলে যেসব এলাকায়

মৌমাছিদের চলাচল বিনষ্ট হয়েছে, সেসব অঞ্চলে মৌমাছির সংখ্যা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

বীজ ও ফলের জন্যে অনেক উদ্ভিদেরই পতংগ মারফত পরাগায়ণ আবশ্যক। এই পরাগায়ণের কাজটা মৌমাছিদের দ্বারা প্রাকৃতিকভাবেই হয়ে আসছিল। কিন্তু বছরের অধিক সময় ধরে লাভজনক কৃষি পণ্য উৎপাদন করে (ফুল গাছ কেটে) এ পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। পতংগ মারফত বিশেষতঃ মৌমাছিদের দ্বারা পরাগায়ণে ফুল অপরিহার্য। কিন্তু আগেই বলেছি যে, ফুলগাছ কেটে লাভজনক ফসল উৎপাদনের প্রক্রিয়া যখন থেকে শুরু হয়েছে তখন মৌমাছিরা বেঁচে থাকার প্রয়োজনে ফুল শোভিত অঞ্চলে অথবা অরণ্যে চলে যায়! এছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষি অর্থনীতিকে গড়ে তোলার জন্যে আবাদযোগ্য জমিতে ব্যাপক হারে কীটনাশক, ছত্রাক-নাশক ব্যবহার করা হতে থাকলে বহু মৌমাছি মারা যায়।

পরবর্তী পর্যায়ে মৌমাছির উপকারিতা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে বিভিন্নভাবে মৌমাছিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা চালান হয় এবং এতে তারা সফলও হয়েছে অনেকাংশে।

ফুলের সুধা থেকে মধুঃ উৎপাদন প্রক্রিয়া

বিভিন্ন জাতের ফুলে যে সুধা (Nectar) থাকে, তা-ই মধু উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল। এটা চিনির এমন এক জলীয় মিশ্রণ যাতে ফ্রাকটোজ (Fructose). গ্লুকোজ এবং সুক্রোজ (Sucroes) আছে। এতে আরো আছে সামান্য প্রোটিন, লবণ এসিড এবং প্রয়োজনীয় তেল। যদিও কিছু কিছু ফুলে ভিন্ন ধরনের চিনি ও অন্যান্য যোগ পাওয়া যায়, তথাপি সুধার ৯৯% ভাগই হচ্ছে উল্লেখিত তিন ধরনের চিনি। সুধায় কতটুকু চিনি থাকবে তা ফুলের প্রজাতি মাটি, পরিবেশ এবং বিশেষ করে আর্দ্রতার (Moisture) ওপর নির্ভর করে। সুধায় চিনির হার ৩%—৪% থেকে ৮০% ভাগ পর্যন্ত হয়ে থাকে। সাধারণতঃ মৌমাছিরা এক সময়ে একই প্রজাতির উদ্ভিদের ফুল থেকে সুধা আহরণ করে মধু উৎপাদন করে। সুধায় ১৫% ভাগের কম চিনি থাকলে মৌমাছি তা আহরণ করে না।

সুধা থেকে মধু তৈরীর জন্যে মৌমাছি ঐ চিনি ও সুক্রোজকে সাধারণ চিনি. গ্লুকোজ ও ফ্রাকটোজে রূপান্তরিত করে। এ রূপান্তর প্রক্রিয়ায় মৌমাছি তার লালাগ্রন্থিতে উৎপন্ন বিশেষ ধরনের এনজাইম ব্যবহার করে। রূপান্তরিত এই নতুন উপাদানকে এরপর এমনভাবে বাষ্পীভূত করা হয় যাতে তা থেকে জল অপসারিত হয়ে চিনির মাত্রা ৮০%তে পেঁছে। অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট বেশী থাকে বলে মধুতে খাদ্য শক্তি থাকে প্রচুর।

উপযোগী আবহাওয়ায় একদল কর্মী মৌমাছি সবসময়ই মাঠে থাকে—ফুল তথা সুধার সন্ধানে। পরাগ ও সুধার সন্ধান পেলেই তারা অন্যান্য মৌমাছিদের আকৃষ্ট করে সেখানে নিয়ে আসে। পথ দেখিয়ে মৌমাছিদের খাদ্যের উৎসের দিকে নিয়ে

আসার প্রক্রিয়া মৌমাছির নিখুঁত হিসাব জ্ঞানের পরিচয়বাহী। একটি কর্মী মৌমাছি নতুন পাওয়া সুধার নমুনা নিয়ে মৌ কলোনীতে ফিরে যায়। এই প্রাপ্তি সংবাদ বিশেষ "নৃত্য" এবং "পুচ্ছ নৃত্যের" মাধ্যমে সে অন্যকে জানায় এবং ইতিমধ্যে নতুন প্রাপ্ত সুধার নমুনা অন্যান্য কর্মী মৌমাছিকে দেয়। এরপর নবনিযুক্ত কর্মীবাহিনী প্রথম কর্মী মৌমাছির নির্দেশিত পথে উড়ে গিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধানে (একই সুধার) নেমে পড়ে। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে যতক্ষণে না কলোনীর সকল কর্মী মৌমাছি সুধা আহরণে নেমে পড়ে।

সুধা আহরণকারী মৌমাছি মৌচাকে ফিরে আসার পর ঐ সুধা এক বা একাধিক মৌমাছির কাছে জমা দেয়। সুধা জমা গ্রহণকারী মৌমাছি তাদের মুখের সাহায্যে বিশেষ ভাবে প্রক্রিয়াজাত করার পর (লালাগ্রন্থির এনজাইমের সাহায্যে) তা মধু কুঠুরীতে জমা রাখে। আগেই বলেছি ঐ প্রক্রিয়াজাত করার সময়ই আহরিত সুধা থেকে জল অপসারণ করা হয়।

বিশ্বের মধু উৎপাদন

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মতে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মধু উৎপাদনের দিক থেকে শীর্ষস্থানে অবস্থান করছিল যথাক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং আর্জেন্টিনা। এই চারটি দেশের বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ নীচের ছকে দেখান হলো।

দেশের নাম	বাৎসরিক উৎপাদন
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	>১০০০০০ মেট্রিক টন
কানাডা	>১০,০০০ ,,
অস্ট্রেলিয়া	১৫,০০০ ,,
আর্জেন্টিনা	১৫,০০০ ,,

মধু উৎপাদনকারী অন্যান্য দেশগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে যুক্তরাজ্য, স্পেন, পোলান্ড ইতালী, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, ডেনমার্ক এবং পূর্ব জার্মানী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে পশ্চিম জার্মানী ছিল শীর্ষস্থানীয় মধু উৎপাদনকারী দেশ। এছাড়া যুগোশ্লাভিয়া বুলগেরিয়া, অষ্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ডেও মধু উৎপাদিত হয়।

বাংলাদেশে মধুর উৎপাদন

মৌ বাক্স আবিষ্কারের পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মৌমাছি পালনের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বাংলাদেশে মৌমাছির পালন এখনো তার শৈশবব্যবস্থা অতিক্রম করেনি। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক) দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলে মৌমাছি পালন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

এইসব কেন্দ্রে মোটামুটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তরুণ-তরুণী মৌমাছি পালনের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলেও এই কার্যকর্মে তেমন সাফল্য আসেনি আর্থিক ও অন্যান্য কারণে। যদিও এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে মৌমাছি পালন ও মধু উৎপাদনকে অর্থকরী শিল্প হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

পরিবারিক বা খামার পর্যায়ে মৌমাছির চাষ করা চলে। যেসব খামারে মৌমাছির পালন করা হয়, তাকে এপিয়ারী বলে। এপিয়ারী প্রতিষ্ঠা মানেই মধু শিল্প প্রতিষ্ঠা।

বাংলাদেশে মধুর বার্ষিক উৎপাদন কত? এর কোন পরিসংখ্যান নেই। শেরে বাংলা নগরের খামার বাড়ীতে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে আমি ব্যর্থ হই। মৌমাছির ওপর তাদের প্রকাশিত পুস্তিকা সংগ্রহ করাও সম্ভব হয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির বক্তব্য ছিল "শেষ হয়ে গেছে, নেই।" বার বার অনুরোধ করেও ঐ পুস্তিকা পাওয়া সম্ভব হয়নি। পরে পথে বেরিয়ে মনে হলো বাংলাদেশে এটাই স্বাভাবিক ঘটনা। প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে হয়ে থাকে না নতুবা খবর রাখতেই তাদের অনীহা।

সুতরাং বাংলাদেশে মধুর বাৎসরিক উৎপাদনের কোন সুনির্দিষ্ট হিসাব দেয়া সম্ভব নয়। আমরা এখানে একটি মৌ বাক্স থেকে বৎসরে গড়ে কতটুকু (এবং দ্বিতীয় বৎসরে) মধু উৎপন্ন হতে পারে তার হিসেব তুলে ধরছি। স্মরণ রাখতে হবে যে বাংলাদেশে কতগুলো এপিয়ারী আছে এবং পারিবারিক ভিত্তিতেই বা কতজন মৌমাছি পালন করেন সে তথ্যও আমাদের অজানা।

লক্ষ্যণীয় প্রথম বছরের তুলনায় দ্বিতীয় বছরে মধু উৎপাদনের পরিমাণ বেশী। এর কারণ হলো প্রথম বছরে মৌমাছি মধু উৎপাদনের সংগে সংগে মৌচাকের প্রয়োজনীয়তা পূরণেও কাজ করে।

বাজারের মধু, মধু নয়

বাজারে হরেক রকমের বোতলে বিভিন্ন কোম্পানীর মধু বিক্রি হয়। আদিতে, অর্থাৎ দেড় দশক আগেও বাংলাদেশের বাজারে বোতলজাত দেশী মধু বিক্রি হতে দেখা যায়নি। নবাবপুর রোডে মতি এন্ড কোং শুধু খাবার জন্যে নয়, চোখে লাগাবার জন্যেও ছোট ছোট শিশিতে মধু বিক্রি করে। তাদের ভাষ্যানুযায়ী এতে চোখের ছানি পড়া, পর্দা পড়া এবং অন্যান্য চোখের পীড়ায় উপকার পাওয়া যায়। এই বক্তব্য কতটুকু সত্য এবং কতটুকু প্রচারণা সেটা যাচাই করে দেখা উচিত।

মধু খেলে কাশির উপশম হয় বলে যে প্রচারণা চালান হয় তারও কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। প্রকৃত সত্য হলো মধুতে কাশি সারে না। মধুর মিষ্টি স্বাদের জন্যে কাশি (কফ) তরল হতে কিছুটা সহায়তা করে মাত্র—কফ উৎক্ষেপণে মোটেই কাজে লাগে না মধু। বাচ্চারা আবার ঐ মিষ্টি স্বাদের জন্যেই মধু খেতে পছন্দ করে।

মৌমাছি কর্তৃক ফুলের পরাগ ও সুধা আহরণের মাধ্যমে মধু উৎপাদনের জটিল

আসার প্রক্রিয়া মৌমাছির নিখুঁত হিসাব জ্ঞানের পরিচয়বাহী। একটি কর্মী মৌমাছি নতুন পাওয়া সুধার নমুনা নিয়ে মৌ কলোনীতে ফিরে যায়। এই প্রাপ্তি সংবাদ বিশেষ "নৃত্য" এবং "পুচ্ছ নৃত্যের" মাধ্যমে সে অন্যকে জানায় এবং ইতিমধ্যে নতুন প্রাপ্ত সুধার নমুনা অন্যান্য কর্মী মৌমাছিকে দেয়। এরপর নবনিযুক্ত কর্মীবাহিনী প্রথম কর্মী মৌমাছির নির্দেশিত পথে উড়ে গিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধানে (একই সুধার) নেমে পড়ে। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে যতক্ষণে না কলোনীর সকল কর্মী মৌমাছি সুধা আহরণে নেমে পড়ে।

সুধা আহরণকারী মৌমাছি মৌচাকে ফিরে আসার পর ঐ সুধা এক বা একাধিক মৌমাছির কাছে জমা দেয়। সুধা জমা গ্রহণকারী মৌমাছি তাদের মুখের সাহায্যে বিশেষ ভাবে প্রক্রিয়াজাত করার পর (লালাগ্রন্থির এনজাইমের সাহায্যে) তা মধু কুঠুরীতে জমা রাখে। আগেই বলেছি ঐ প্রক্রিয়াজাত করার সময়ই আহরিত সুধা থেকে জল অপসারণ করা হয়।

বিশ্বের মধু উৎপাদন

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মতে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মধু উৎপাদনের দিক থেকে শীর্ষস্থানে অবস্থান করছিল যথাক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং আর্জেন্টিনা। এই চারটি দেশের বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ নীচের ছকে দেখান হলো।

দেশের নাম	বাৎসরিক উৎপাদন
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	>১০০০০০ মেট্রিক টন
কানাডা	>১০.০০০ ,,
অস্ট্রেলিয়া	১৫,০০০ ,,
আর্জেন্টিনা	১৫,০০০ ,,

মধু উৎপাদনকারী অন্যান্য দেশগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে যুক্তরাজ্য, স্পেন, পোলান্ড ইতালী, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, ডেনমার্ক এবং পূর্ব জার্মানী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে পশ্চিম জার্মানী ছিল শীর্ষস্থানীয় মধু উৎপাদনকারী দেশ। এছাড়া যুগোশ্লাভিয়া বুলগেরিয়া, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ডেও মধু উৎপাদিত হয়।

বাংলাদেশে মধুর উৎপাদন

মৌ বাক্স আবিষ্কারের পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মৌমাছি পালনের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বাংলাদেশে মৌমাছির পালন এখনো তার শৈশবাবস্থা অতিক্রম করেনি। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক) দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলে মৌমাছি পালন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

এইসব কেন্দ্রে মোটামুটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তরুণ-তরুণী মৌমাছি পালনের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলেও এই কার্যকর্মে তেমন সাফল্য আসেনি আর্থিক ও অন্যান্য কারণে। যদিও এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে মৌমাছি পালন ও মধু উৎপাদনকে অর্থকরী শিল্প হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

পারিবারিক বা খামার পর্যায়ে মৌমাছির চাষ করা চলে। যেসব খামারে মৌমাছির পালন করা হয়, তাকে এপিয়ারী বলে। এপিয়ারী প্রতিষ্ঠা মানেই মধু শিল্প প্রতিষ্ঠা।

বাংলাদেশে মধুর বার্ষিক উৎপাদন কত? এর কোন পরিসংখ্যান নেই। শেরে বাংলা নগরের খামার বাড়ীতে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে আমি ব্যর্থ হই। মৌমাছির ওপর তাদের প্রকাশিত পুস্তিকা সংগ্রহ করাও সম্ভব হয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির বক্তব্য ছিল "শেষ হয়ে গেছে, নেই।" বার বার অনুরোধ করেও ঐ পুস্তিকা পাওয়া সম্ভব হয়নি। পরে পথে বেরিয়ে মনে হলো বাংলাদেশে এটাই স্বাভাবিক ঘটনা। প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে হয়ে থাকে না নতুবা খবর রাখতেই তাদের অনীহা।

সুতরাং বাংলাদেশে মধুর বাৎসরিক উৎপাদনের কোন সুনির্দিষ্ট হিসাব দেয়া সম্ভব নয়। আমরা এখানে একটি মৌ বাক্স থেকে বৎসরে গড়ে কতটুকু (এবং দ্বিতীয় বৎসরে) মধু উৎপন্ন হতে পারে তার হিসেব তুলে ধরছি। স্মরণ রাখতে হবে যে বাংলাদেশে কতগুলো এপিয়ারী আছে এবং পারিবারিক ভিত্তিতেই বা কতজন মৌমাছি পালন করেন সে তথ্যও আমাদের অজানা।

লক্ষ্যণীয় প্রথম বছরের তুলনায় দ্বিতীয় বছরে মধু উৎপাদনের পরিমাণ বেশী। এর কারণ হলো প্রথম বছরে মৌমাছি মধু উৎপাদনের সংগে সংগে মৌচাকের প্রয়োজনীয়তা পূরণেও কাজ করে।

বাজারের মধু, মধু নয়

বাজারে হরেক রকমের বোতলে বিভিন্ন কোম্পানীর মধু বিক্রি হয়। আদিতে, অর্থাৎ দেড় দশক আগেও বাংলাদেশের বাজারে বোতলজাত দেশী মধু বিক্রি হতে দেখা যায়নি। নবাবপুর রোডে মতি এন্ড কোং শুধু খাবার জন্যে নয়, চোখে লাগাবার জন্যেও ছোট ছোট শিশিতে মধু বিক্রি করে। তাদের ভাষ্যানুযায়ী এতে চোখের ছানি পড়া, পর্দা পড়া এবং অন্যান্য চোখের পীড়ায় উপকার পাওয়া যায়। এই বক্তব্য কতটুকু সত্য এবং কতটুকু প্রচারণা সেটা যাচাই করে দেখা উচিত।

মধু খেলে কাশির উপশম হয় বলে যে প্রচারণা চালান হয় তারও কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। প্রকৃত সত্য হলো মধুতে কাশি সারে না। মধুর মিষ্টি স্বাদের জন্যে কাশি (কফ) তরল হতে কিছুটা সহায়তা করে মাত্র—কফ উৎক্ষেপণে মোটেই কাজে লাগে না মধু। বাচ্চারা আবার ঐ মিষ্টি স্বাদের জন্যেই মধু খেতে পছন্দ করে।

মৌমাছি কর্তৃক ফুলের পরাগ ও সুধা আহরণের মাধ্যমে মধু উৎপাদনের জটিল

প্রক্রিয়ার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। সঙ্গত কারণেই বলা যেতে পারে যে কারখানা থেকে সুদৃশ্য বোতলজাত হয়ে সেসব মধু বাজারে আসে তা আদৌ মধু নয়, কতগুলো রাসায়নিকের সংমিশ্রণ মাত্র। যে কারণে প্রাণী দেহের রক্ত, মাংস অথবা অন্য কোন অংগ অকৃত্রিমভাবে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরী অসম্ভব ব্যাপার, সেই একই কারণে মৌমাছি কর্তৃক উৎপাদিত মধু মানুষের হাতে কারখানায় তৈরী হতে পারে না। প্রস্তুতকারী কোম্পানীগুলো এ সত্য জানে বলেই প্রচারণায় সময় "সুন্দরবনের খাঁটি মধু" কথাটা জুড়ে দেয়। ভাবখানা এই, মধু খাঁটি না হোক, খাঁটির লেবেল দেখেই লোকে ভুলবে। এবং হচ্ছেও তাই।

ওষুধ নীতিতে ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় ওষুধ নিষিদ্ধ হবার পর মধুর উৎপাদন ও প্রচারণা বেড়ে যায়। এপি'র মধুর ব্যাপক প্রচারণা (টিভির রঙীন প্রচারণাসহ) সাম্প্রতিক ঘটনা। এপি'র দেখাদেখি শক্তি ঔষধালয়ও বাজারে বোতলজাত মধু ছেড়েছে—বলা বাহুল্য কারখানার তৈরী। কোম্পানীগুলো অবসরপ্রাপ্ত এবং ভীম রীতিগ্রস্ত (enile) বৈজ্ঞানিক (?) ভাড়া করে কারখানায় মধু নামক এক বিচিত্র রাসায়নিক যৌগ তৈরী করে রমরমা ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। মধুর পাশাপাশি এপি'সহ বিভিন্ন কোম্পানী আবার বোতলজাত সরবতও বাজারে ছেড়েছে (এ বিষয়ে পরবর্তী কোন সংখ্যায় আলোচনা করার ইচ্ছে আছে)। মানুষ এগুলো সম্পর্কে, এ সবের উপাদান সম্পর্কে কিছুই জানতে পারে না বলে প্রচারণার মোহের কাছে পরাজিত হয়। ক্ষতিকর বলে নিষিদ্ধ হয়েছে ১৭০৭টি ওষুধ, ক্ষতিকর মৃতসঞ্জিবনী সুধা এবং এ জাতীয় সরবতও কম-বেশী ক্ষতিকর।

আমরা পরীক্ষাগারে বাজারে প্রাপ্ত বিভিন্ন দেশীয় ব্র্যান্ডের মধু পরীক্ষা করেছি। মৌচাক থেকে আহরিত মধুর সংগে পরীক্ষা ফলাফল যাচাই করে দেখা গেছে, বোতল জাত মধুতে মধুর সামান্যতম হদিশও নেই। তাহলে বোতলজাত মধুতে (?) আছে কি ?

সাধনার মধু বাজারে পাওয়া যায়নি। পরীক্ষাকৃত কোন কোম্পনীর মধুই বিজ্ঞান সম্মত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি। প্রতিটিতে অত্যধিক জীবাণু দোষণ রয়েছে। সব দোষগুণ বিবেচনা করে বলা যায় কারখানায় তৈরী বোতলজাত মধু, মধুর যোগ্য নয়— রাস্তা থেকে কেনা মধু অপেক্ষাকৃত ভাল, তবু খাবার উপযোগী নয়।

মধুর উপাদান সম্পর্কে আরো কিছু কথা

মধুর প্রতি মানুষের আকর্ষণ দীর্ঘদিনের। এ আকর্ষণের মূল কারণ সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থে মধুর দীর্ঘ প্রশস্তি। 'দুধ ও মধুর বয়ে যাওয়া দেশের' কথা বাইবেলে উল্লেখ আছে। কোরান, হাদিসেও নিয়মিত মধু ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। এমনকি হোমার, হিরোডোটাস ও অন্যান্য প্রাচীন লেখকদের সাহিত্যেও মধুর স্তুতি রয়েছে।

মধুতে কি থাকে ? আগেই বলেছি মধুতে প্রচুর পরিমাণে চিনি থাকে। এর

প্রায় অর্ধেকই ডেক্সট্রোজ বা গ্লুকোজ যা সহজেই শরীরে বিশোষিত (Absorb) হয়ে যায়। সম্ভবতঃ সে কারণেই রিকেটগ্রস্ত পুষ্টিহীন শিশুর অন্ত্রের প্রদাহ ও অপূর্ণাঙ্গ (Premature) শিশুদের মধু খাওয়ানো হয়। দূরপাল্লার দৌড়বিদ ও অন্যান্য শ্রেণীর খেলোয়াড়রাও দীর্ঘস্থায়ী বা দীর্ঘ সঞ্চয়ী শক্তির জন্যে স্পোর্টস বা খেলার পূর্বে মধু খেয়ে থাকেন। এটারও একটা যুক্তি সংগত কারণ রয়েছে। মধুতে গ্লুকোজ ছাড়া অন্যান্য জাতের চিনিও যথেষ্ট পরিমানে রয়েছে যেমন লেভুলোজ বা ফ্রাকটোজ, সুকরোজ বা সারারণ চিনি, মলটোজ প্রভৃতি। ফ্রাকটোজ, গ্লুকোজের মত অত দ্রুত শরীরে বিশোষিত হয় না। ফ্রাকটোজ প্রথমে গ্লাইকোজেনে পরিবর্তিত হয়, পরে ধীরে সুস্থে ডেক্সট্রোজ বা গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়। মধুর এক অংশ শরীরে দ্রুত শক্তি যোগায় গ্লুকোজের মাধ্যমে। অপরপক্ষে এ শক্তি বহাল থাকতে থাকতেই, লেভুলোজ ধীরে ধীরে গ্লুকোজে পরিণত হয়ে শক্তিকে দীর্ঘস্থায়ী করে। এই সুবিধার জন্যে সাধারণ কায়িক শ্রমিকরা সুবিধা পেলে একটু মধু চেখে নেবার চেষ্টা করে। চিনির কারণে মধুর জলীয় অংশ (Moisture) ধারণের বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে।

সব মধুই রাসায়নিক দিক থেকে এসিড। এতে সাইট্রিক, ম্যালিক ফসফেরিক, লেকটিক, টারটারিক, অক্সালিক, বুটারিক ও ট্যানিক এসিড রয়েছে। মধুর এন্টিসেপটিক ক্ষমতার কারণই ঐসব এসিড। মধুর সাথে মিশ্রিত থাকে এসিটা-কোলিন, ঈষ্ট (East), সামান্য এস্ট্রোজেন জাতীয় হরমোন। থারাপিন ও মিথেন এনথ্রানিলেটের কারণে মধুতে একটা ঝাঁজ পাওয়া যায়। 'কলুনা ভালগারিম' নামক একটি বিশেষ ধরনের প্রোটিনের কারণে সত্যিকার ভাল মধু জেলীসদৃশ এবং অনেকক্ষণ নাড়লে পর পদ্মা বা সুন্দরবনের মধু তরল হয়। চিনির অপভ্রংশ এনথোসায়ানিন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মধুতে থাকে এবং এটাই মধুকে উজ্জল রঙ দেয়।

মধুতে প্রায় সর্বপ্রকার খনিজ পদার্থই থাকে কিন্তু পরিমাণ অতি সামান্য। শরীরের সৌষ্ঠব ও শক্তির জন্যে খনিজ পদার্থের প্রয়োজন রতিতুল্য। মধুতে যেসব খনিজ পদার্থ বাছাই থাকে তার তালিকা ঃ

লৌহ, তামা, ম্যাংগানিজ, নিকেল, ফসফরাস, সিলিকন, এলুমিনিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, কেলসিয়াম, ফসফরাস সিলিকা, সোডিয়াম, ক্লোরিন, সালফার প্রভৃতি। ভিটামিন ও ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স জাতীয় ভিটামিনও রয়েছে, যা মধুতে সামান্য মাত্রায় ভিটামিন ও ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স জাতীয় ভিটামিনও রয়েছে, যা শর্করা ও আমিষের দ্রবণে কিছুটা সাহায্য করে। মধুতে পরিবর্তনশীল (Variable) মাত্রায় ভিটামিন-সি রয়েছে।

খাঁটি মধুর উপাদানের কারণে কোনপ্রকার জীবাণু রোগ উৎপাদনে সক্ষম মাত্রা কখনও থাকে না। নকল বা ফ্যাক্টরীতে চিনি গুড় মিশিয়ে উৎপাদিত মধুতে অত্যাধিক পরিমাণে রোগ জীবাণু থাকে যা বিভিন্ন প্রকার রোগ বিশেষতঃ ডায়ারিয়া ও অন্ত্রের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর ও বিলম্বিত প্রদাহ সৃষ্টি করে থাকে।

উপসংহার

সুস্বাস্থ্যের জন্যে প্রয়োজন স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপন স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপনের মৌল উপাদান হচ্ছে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা প্রভৃতি। সুস্বাস্থ্য লাভের অন্যতম প্রধান সোপান শিক্ষা। এই শিক্ষার অভাবই তৃতীয় বিশ্বের মানুষকে পংগু করে রেখেছে। অশিক্ষার কারণে বিপুল সংখ্যক লোক ক্ষতিকর ওষুধ, অখাদ্য, কুখাদ্য খেয়ে দুঃসহ জীবন যাপন করছে। মুনাফালোভী কোম্পানীগুলো এরই সুযোগ নিয়ে বাজারজাত করছে মধু এবং অন্যান্য অনিষ্টকারী পণ্য।

যে কোন খাদ্যই সুষ্ঠু ও সঠিক পদ্ধতিতে তৈরী না হলে তা রোগ বিস্তারে সহায়তা করে, শরীরে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কারখানায় তৈরী মধু আমাদের সুস্বাস্থ্যের এবং দীর্ঘ জীবনের গ্যারান্টি দিতে সক্ষম—এ বক্তব্য কোন মতেই তাই মেনে নেয়া যায় না। মধু উৎপাদনকারী দু'কোম্পানীতে বাংলাদেশ সরকারের একজন প্রাক্তন তথ্য সচিবের স্বার্থ রয়েছে বলেই কি সরকার এদের বল্গাহীন মিথ্যা প্রচারণায় নীরব? শক্তি ও আয়ুর্বেদীয় ফার্মেসীর সংগে স্বাস্থ্য সচিবের (কারও মতে) পারিবারিক স্বার্থও জড়িত। আমরা মনে করি নিরপেক্ষভাবে যথাযথ রাসায়নিক পরীক্ষা না করে শুধু ওষুধ বা মধু নয়—সবরকম বোতলজাত খাদ্যের প্রচার ও বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করা উচিত।

দেশের প্রচার যন্ত্রসমূহের মনোভাবও এই সংগে বদলানো উচিত। ক্রেতা স্বার্থের কথা বিবেচনা না করে শুধুমাত্র অর্থের লালসায় ক্ষতিকর বিজ্ঞাপন গ্রহণ ও প্রচার নিম্ন রুচির পরিচায়ক ও জনস্বার্থ বিরোধী। এ সব বিজ্ঞাপন বন্ধ করলে পত্রিকা ওয়ালা, টেলিভিশন বা রেডিওর যেটুকু আর্থিক ক্ষতি হবে তার তুলনায় দেশের জনগণের লাভ হবে বিপুল।

তথ্য সূত্র ঃ

১. Encyclopaedia Britannica
২. বিসিক প্রকাশিত 'মৌমাছি পালন' সংক্রান্ত পুস্তিকা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ এ, এম, এম সাইফুল্লাহ, প্রযুক্ত কর্মকর্তা, মৌমাছি পালন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী।

ফুফাতো ভাইয়ের সাথে মামাতো বোনের প্রেম স্বাস্থ্যসম্মত নয়

মনে মনে একটা শিশুর কথা চিন্তা করুন যার মাথার খুলি নেই, মগজ সামান্য থাকতে পারে অথবা নেই। মাথার খুলি দেখতে না পাওয়ায় মুখ খুব বড় মনে হবে। দুই চোখ এবং জিহ্বা কিছুটা বেরিয়ে আছে...। আপনি নিশ্চয় শিউরে উঠছেন। এমন শিশুর কথা ভাবতে সবারই ভয় লাগার কথা। কিন্তু যে মা বাস্তবে এই শিশুর জন্ম দেবেন—সেই মা, সেই দম্পতির কথা একবার চিন্তা করে দেখুন।

অথচ আমাদের দেশে সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথা অনুসারে অসংখ্য দম্পতি ও তাদের সন্তান এই ঝুঁকির সম্মুখীন। এ ধরনের শিশু জন্মের খবর সংবাদপত্রগুলিতেও অনেক সময় দেখা যায়।

উপরে যে শিশুর বর্ণনা দেয়া হলো ইংরেজীতে তাকে বলা হয় এনেনকেফালাস অর্থাৎ মস্তকবিহীন বা দানব শিশু। আগেই বলা হয়েছে এসব শিশুর মগজ কিছুটা থাকতে পারে অথবা নাও থাকতে পারে। মস্তিষ্কের বিকৃতি ছাড়াও এদের এডরেনাল এবং পিটুইটারী গ্ল্যান্ড তৈরী হয় না। মস্তকবিহীন শিশুদের শতকরা ৭০ ভাগেই মেয়ে।

এনেনকেফালাসের কারণ সম্পর্কে ঠিক করে কেউই কিছু বলতে পারেন না। তবে জ্ঞাতি ভাইবোনের মধ্যে (চাচাতো, মামাতো, ফুফাতো, খালাতো) বিয়ে হওয়া দম্পতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী এমন হতে দেখা গেছে। অনেক ক্ষেত্রে কোন কোন মহিলা পরপর চারবার দানব শিশু জন্ম দিয়েছেন। উত্তরাধিকার সূত্রে বংশানুক্রমিক বিকৃতি এভাবে সন্তানে বর্তায় বলে বিশ্বাস করা হয়। অনেকে অবশ্য নোংরা পরিবেশ ও দারিদ্রকে এজন্য দায়ী করে থাকেন। তবে বেশীর ভাগ বিজ্ঞানী উত্তরাধিকার ও জ্ঞাতিভাই বোনের বিবাহ সম্পর্ককে দানব-সন্তান-এর কারণ হিসেবে মনে করেন।

সাভার থানার এক মহিলা এসেছিলেন গত ১৩ই শ্রাবণ গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র হাসপাতালে বাচ্চা হবে বলে।

মহিলার মাস পুরা হয়েছে। এর আগের দুটি সন্তান। দুটিই জীবিত এবং ছেলে। স্বামী ব্যবসা করে। শ্বশুর-শাশুড়ী আছে এবং তারা সুস্থ।

প্রসবের সময় জরায়ু-মুখে হাত দিয়ে নরম তুলতুলে দলার মত কি যেন ঠেকল। শিশুর মাথাও নয়। হলে চুল থাকত। অনেক সময় পর ক্রমশঃ সেটি নেমে এলো।

অনেকটা কেটে ফেলা পায়ের মত। ক্র্যাচে ভর দিয়ে চলার সময় যেমন ঝুলে থাকে—সেরকম দেখতে। অঙ্গটি কোমর থেকে নীচের দিকে ঝুলে আছে। পা অথবা জননেন্দ্রিয়ের কোন চিহ্ন নেই। উপরের দিকে, সমস্ত শরীর স্বাভাবিক মনে হয়।

শিশুটি মৃত ভূমিষ্ঠ হয়। ফুল সম্পূর্ণ পড়ে। শিশুর পোস্টমর্টেম করা সম্ভব হয়নি। করতে পারলে আরও কিছু বিকৃতি হয়তো ধরা পড়তো।

এ ক্ষেত্রেও যেটা লক্ষণীয় তা হলো মহিলাটির স্বামী তার ফুফাতো ভাই। তবে এর আগে আর কোন ছেলেমেয়ে এভাবে জন্মেওনি, মারাও যায়নি।

বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম ছাড়াও অনেক সময় দেখা গেছে দীর্ঘদিন পক্ষাঘাতে ভুগে ছেলেমেয়ে মারা গেছে। এই পক্ষাঘাতের কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে পিতা-মাতা জ্ঞাতি সম্পর্কীয়। এদেশে একজন প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীর পরিবারে এমন ঘটনা ঘটেছে। বিলাতে নটিংহামের সিটি হাসপাতালে একবার এক পাকিস্তানী মুসলমান মহিলা আসেন সন্তান প্রসবের জন্য। তার গর্ভধারণের তখন সাতাশ সপ্তাহ চলছিল। প্রসবের আগে নিয়মিত পরীক্ষার সময় যেটুকু অস্বাভাবিকতা ধরে পড়ে তাহলো গর্ভস্থ শিশুর নড়াচড়া তুলনামূলক ভাবে কম মনে হয় এবং গর্ভের সময় অনুযায়ী শিশু আকারে বাড়েনি। আয়রণ ভিন্ন আর কোন ওষুধও তিনি খাননি। প্রসব বেদনা যথাযথ এবং প্রসবে কোনরকম অসুবিধা হয়নি। মহিলার একটি মেয়ে হয়েছিল।

জন্মের পর শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এবং মুখের মারাত্মক বিকৃতি চোখে পড়ে। শিশুটির ওজন ছিল সোয়াসেরের মত। ঠোঁট ছোট ও কাটা। চোয়াল দুটো বেশী উঁচু এবং মুখের তালু সম্পূর্ণ চেরা। নাক বসা, চোখ দুটো বেশ দূরে সরিয়ে বসানো। এতে করে একপাশ থেকে দেখলে মুখমণ্ডল মনে হবে মাঝে বসে যাওয়া। মাথাটি বেশ ছোট। ঘাড় খাট। বাইরের কান দুটো ভালভাবে তৈরী হয়নি।

মুখের এই বিকৃতি ছাড়াও চারহাত-পায়ের হাড়গুলো ছিল আকারে ছোট। ইংরেজীতে একে বলে টেট্রোফোকোমেলিয়া। বৃদ্ধাঙ্গুলসহ দুহাতে ছিল মাত্র তিনটি করে আঙ্গুল। দুপায়ের চতুর্থ ও কড়ে আঙ্গুল ছিল জোড়া লাগানো (সিনডাকটাইলি)। ভগাঙ্কুর এবং জননেন্দ্রিয় সঠিক আকার ধারণ করেনি।

শিশুটি জন্মের ১৭ ঘণ্টা পরেই মারা যায়। পোস্টমর্টেমে ফুসফুসের অপরিণত অবস্থা ধরা পড়ে এবং বুকে বেশ কিছু সিস্ট পাওয়া যায়। এই সব জন্মগত বিকলাংগতার বৈশিষ্ট্যগুলো রবার্টস সিনড্রোমের উদাহরণ। রোগটি বিরল হলেও জন্মগত এই বিকৃতির বহু তথ্য ইতিমধ্যে হস্তগত হয়েছে।

জন বি. রবার্টস ১৯১৯ সালে সর্বপ্রথম এই রোগের ব্যাখ্যা দেন। তিনি এক ভাই ও বোনের মধ্যে একই রকম বিকৃতির কথা উল্লেখ করেন। সেসময় সারা বিশ্বে মাত্র ২৪টি এ ধরনের কেসের কথা প্রকাশিত হয়। এই সব শিশু খুব কমই বেঁচে থাকে। তবু এক সাম্প্রতিক রিপোর্টে এ ধরনের ৫ জন শিশু জীবিত থাকার কথা

দাবী করা হয়। উক্ত পাঁচ জনের মধ্যে এক জনের বয়স ১৯। এদের দৈহিক বৃদ্ধি খুব কম বলে পর্যবেক্ষণ-রিপোর্ট উল্লেখ করা হয়। এবং মানসিক দিক থেকে এরা অপরিণত রয়ে গেছে বলে জানা যায়।

রোগটি রবার্ট'স সিনড্রোম কিনা তা জানার জন্য অন্যান্য যেসব কারণে জন্মগত বিকলাঙ্গতা ঘটে তার সাথে তুলনা করে দেখতে হবে। থেলিডোমাইডজনিত (ফোকামেলিয়াতেও) একই ধরনের প্রত্যঙ্গ বিকৃতি দেখা যায়। কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে মুখমণ্ডল এবং জননেন্দ্রিয়ের বিকৃতি তেমন ধরা পড়ে না। এ ছাড়া সবগুলো প্রত্যঙ্গ একইভাবে বিকৃত হয় না।

বিভ্রান্তি

সুডোথেলিডোমাইড সিনড্রোমের লক্ষণকে অনেক সময় রবার্ট সিনড্রোম বলে ভুল হতে পারে। এক্ষেত্রে দৈহিক উচ্চতা কম, হাত ছোট হয় এবং অনেক সময় বড়ো আঙ্গুল থাকে না। মাথার চুল পাতলা হয় এবং মানসিকতার দিক থেকে এরা তুলনামূলকভাবে সমবয়সীদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে থাকে। এ সব লক্ষণযুক্ত রোগ সাধারণত রবার্ট সিনড্রোমের মত ততটা মারাত্মক হয় না।

বেশ কিছু পরিবারে এ রোগের প্রকোপ দেখা গেছে। এদের মধ্যে হাত পা ছাড়াই অনেক শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে। এছাড়া অন্য কোন ধরনের বিকৃতি এদের মধ্যে পাওয়া যায়নি। এরা অনেকেই বয়ঃপ্রাপ্তিকাল পর্যন্ত বেঁচে থেকেছে এবং একই রোগে আক্রান্ত শিশুর জন্ম দিয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকায় জন্মগত বিকলাঙ্গসহ এমন অনেক শিশুর সন্ধান পাওয়া গেছে। হ্যানহার্ট'স সিনড্রোমে চেহারা ও প্রত্যঙ্গের বিকৃতি পাওয়া যায়। মুখমণ্ডলের বিকৃতির মধ্যে চোয়াল ছোট হওয়া (মাইক্রোনাথিয়া), প্রত্যঙ্গ সমূহের মধ্যে যে কোন একটি অথবা চারটিরই খর্বতা লক্ষ্য করা গেছে! বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে বা স্বাভাবিক জীবন-যাপনের দিক থেকে এদের অবশ্য খুব একটা অসুবিধা হয় না।

উত্তরাধিকার

রবার্ট'স সিনড্রোম যে বংশ পরম্পরায় সংক্রামিত হয় একথা আজ সবাই স্বীকার করে নিয়েছেন। মানব কোষে 'জিন' নামে এক ধরনের উপাদানের মাধ্যমে বংশানুক্রমিক ধারা পিতা-মাতার শরীর থেকে সন্তানের শরীরে পার হয়ে যায়। রবার্ট'স সিনড্রোমে এ ধরনের নষ্ট-জিনের বাহক হয়েও বাপ-মা নিজেরা শারীরিক ভাবে সুস্থ থাকে। ম্যাকুকসিকের 'কেটালগ অবমেনডেলিয়ান ডিজিজ' পুস্তকে এই রকমের জন্মগত বিকলাঙ্গতার উত্তরাধিকার সূত্র সম্পর্কিত ঘটনার কয়েকশো বর্ণনা আছে। বংশগত কারণে একটি বিকলাঙ্গ শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর আরও শিশু বিকলাঙ্গ হয়ে জন্ম নিতে পারে। পিতা-মাতার অটোজম এই জিন বহন করে।

উক্ত পাকিস্তানী মহিলার সন্তান প্রসবের তিনমাস পর স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই নটিংহাম সিটি হাসপাতালে জেনেটিক পরামর্শ কেন্দ্রে উপদেশের জন্য পাঠানো হয়। অবশ্য এই তিনমাস সময় নেয়ার পেছনে যুক্তি ছিল। স্বভাবতঃই ছেলে-মেয়ে মারা গেলে বাবা-মা বিশেষ করে মা মানসিক দিক থেকে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। এক্ষেত্রে তারা মনে করেন যে শিশুর মৃত্যুর জন্য তারাই দায়ী। জীবনের উপর তাদের ঘৃণা জন্মে যায়। তারা মনের দিক থেকে এতই ভেঙে পড়েন যে কোন যুক্তিপূর্ণ আলোচনায় যোগ দেবার মত মানসিক অবস্থা তাদের ছিল না।

শিশুর মৃত্যুজনিত এই শোক কাটিয়ে মানসিক স্থিরতা ফিরে আসতে তাদের কম করে হলেও তিন মাস সময় প্রয়োজন। আর এই ভাবাবেগের জের তো চলবে কয়েক বছর ধরে। মনের এমন জটিল অবস্থা পরামর্শদানের জন্য বাধাস্বরূপ।

প্রথম দিকে স্বামী ভদ্রলোকটি বিভিন্ন কারণে ক্লিনিকে হাজিরা দিতে পারেননি। অন্যদিকে মহিলাটি ইংরেজী জানাতেন না বলে আলোচনায় বেশ অসুবিধা হতো। তবে দোভাষী হিসেবে ভদ্রমহিলার ১৩ বছরের ননদ আসায় সমস্যার কিছুটা সুরাহা হয়। আলোচনার পর তাদের পরিবারের যেসব তথ্য পাওয়া যায় তার উপর ভিত্তি করে একটি বংশতালিকা দাঁড় করানো হয়।

ঐ বংশতালিকা অনুযায়ী রবার্ট সিনড্রোম আক্রান্ত শিশুটির বাবা-মা পরস্পর মাসতুতো ভাইবোন। ২৮ বছর বয়স্ক স্বামীটি তার পরিবারে বড় ছেলে। তার তিন বোনের বয়স যথাক্রমে ১৩, ১২ এবং ৭ বৎসর। ছোট চার ভাইয়ের বয়স ১১, ১০, ৯ ও ৫। এদের সবারই ভাল স্বাস্থ্য। তার এক বোন কোলে থাকতেই মারা যায়। মৃত্যুর কোন কারণের কথা তারা বলতে পারে না। স্বামীটির পিতামাতা দু'জনেই জীবিত ও সুস্থ।

জ্ঞাতিভাইবোন বা একই গোত্রের মধ্যে বিবাহ এই রোগের কারণ হিসেবে ধরে নেয়া যায়। কোন কোন সম্প্রদায়ের ভিতর জ্ঞাতিভাইবোনের বিয়েকে প্রাধান্য দেয়া হয়। ফলে কারও অস্বাভাবিক 'জিন' থেকে থাকলে একই বংশের ভিতরে ঘুরে ঘুরে বংশ পরম্পরায় এই জিনের সংক্রমণ সম্ভাবনা অনেক গুণ বেড়ে যায়। এতে অবস্থা আরও গুরুতর হয়ে ওঠে। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যদি এই জিনের অংশীদার হন তবে তাদের সন্তানের বিকৃতির সম্ভাবনা বেশী থাকে।

পাশ্চাত্য দেশগুলিতে জ্ঞাতিভাই-বোনের মধ্যে বিয়ের অনুমোদন তেমন নেই। হতে পারে, এ ধরনের রোগ বিস্তারের আশংকা এর অন্যতম কারণ। তারা মনে করেন বংশগত এসব রোগ পশ্চাদমুখী অনুন্নত মানসিকতার একটি কারণ। এ জন্যই তারা নিজের গোত্রের ভিতর বিবাহ অনুমোদন করতে চাননা।

স্ত্রীর বয়স ১৯ বছর। তিনি তার পরিবারের তৃতীয় সন্তান। তার তিন ভাইয়ের বয়স ২৪, ২২ এবং ১৫। বড় ভাইয়ের সন্তান দুইটি। তারা বেশ স্বাস্থ্যবান।

ভদ্রমহিলার পরে তিনজন মারা যায়। এদের একজন ৪ বছর বয়সে, একজন দশ সপ্তাহ ও বাকী জন জন্মের সময় মারা যায়। এদের তিনজনের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায়নি। ভদ্রমহিলার পরিবারে নিকট আত্মীয়দের মধ্যে কারো কোন রকম শারীরিক বিকলাংগতার সাক্ষ্য নেই। এদের মধ্যে রবার্ট সিনড্রোমে আক্রান্ত হয়ে কেউ জন্মেছে এমন কোন প্রমাণ নেই।

মহিলাটি যখন জেনেটিক পরামর্শের জন্য হাসপাতালে যাওয়া আসা শুরু করলেন, তখন তিনি দ্বিতীয় বারের মত গর্ভধারণ করেছেন। আর এই গর্ভধারণ করার জন্য যারা তাকে পরামর্শকেন্দ্রে উপদেশ দিচ্ছিলেন—তাদের আরও বেশী সতর্ক হতে হয়। প্রথমবার দেখা হলে স্বামী সাথে না থাকায় তাকে কোন পরামর্শ দেবারই চেষ্টা চালানো হয়নি। পরামর্শের সময় স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই থাকা দরকার! জেনেটিক প্রণালী সম্পর্কে বিশেষ ধারণা না থাকলে পরামর্শ দেয়া মুশকিল হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে স্বামীর উপস্থিতি আরও প্রয়োজনীয় ছিল কারণ তিনি ইংরেজী বলতে ও বুঝতে পারেন।

দ্বিতীয় দফা সাক্ষাতের দিন ধার্য্য করার জন্য পরামর্শ কেন্দ্র থেকে একজন হেলথ ভিজিটর তাদের বাড়ীতে যান। এবং তাদের সাথে দেখা করে স্বামীর উপস্থিত থাকার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে বলেন।

প্রথমে স্বামীকে বংশগত এই রোগের কাঠামো ও বিস্তার সম্পর্কে বোঝানো হয়। তিনি তখন স্ত্রীকে নিজেদের ভাষায় আবার তা বুঝিয়ে দেন। প্রতি চারটি গর্ভধারণের একটিতে এই রোগ বিস্তারের যে সম্ভাবনা তার উপর বেশী জোর দেয়া হয়। দম্পতিদের পাল্টা কোন প্রশ্ন থাকলে তার জন্য সুযোগ দেয়া হয়। তাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেয়া হয়। বিকলাংগ শিশু জন্ম দেয়ার ব্যাপারে বাবা-মার যে কোন হাত নেই—একথা বুঝিয়ে বলা হয়। কারণ শিশুর মন বা শরীরের উপর জিনের যে প্রভাব তাতে দম্পতির কিছুই করার নেই।

বৌটির মনের অবস্থা সম্পর্কে কিছু ধারণা করা মুশকিল। গর্ভধারণ বা শিশু মৃত্যুর ব্যাপারকে একেক সম্প্রদায় একেক ভাবে গ্রহণ করে। এশীয় প্রায় সকল সম্প্রদায়ে গর্ভধারণ ও বংশগত বিকৃতিকে ভাগ্য বলে ধরে নেয়া হয়। কাজেই ভদ্র মহিলা পুনরায় গর্ভধারণের ব্যাপারটিকে সহজভাবে গ্রহণ করেছেন। স্বামীর সিদ্ধান্তকেই স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছেন।

জন্মের আগে রোগ নির্ণয়

যেহেতু বৌটি ইতিমধ্যে আবার গর্ভ ধারণ করেছেন তাই জন্মের আগে রোগ নির্ণয় প্রতিক্রিয়াকে এ ব্যাপারে খাটানোর চেষ্টা করা হয়। আলট্রাসাউন্ড পরীক্ষায় ১৬ থেকে ২০ সপ্তাহ গর্ভ ধারণের পর ফোকোমেলিয়া ধরা পড়ে। কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মতে গর্ভাধারনের ২০ থেকে ২৪ সপ্তাহ পর নেয়া এক্সরে পরীক্ষার ফলাফল অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য। এক্সরের সময় বিকীরণ যদি নিয়ন্ত্রিত রাখা যায় তাহলে

মা ও ভ্রূণ দুইয়েরই গোনাডের ওপর কোন প্রতিক্রিয়ার ভয় থাকে না। এক্সরে করে রোগ নির্ণয় করতে অনেক সময় লাগায় প্রসবকাল বিপজ্জনকও হতে পারে।

জন্মের আগে শিশুকে পরীক্ষা করার আরেক উপায় হচ্ছে ফোটোস্কোপি। পশ্চিমাদেশগুলির খুব কম চিকিৎসাকেন্দ্রেই এই ব্যবস্থার সুবিধা আছে। এই ব্যবস্থায় একটা টেলিস্কোপ জাতীয় যন্ত্র মায়ের পেটের চামড়া ও জরায়ু কেটে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। এটা করার জন্য রোগীকে সাধারণ বা আংশিক অবচেতনের ব্যবস্থাও গ্রহণ করা যেতে পারে। ফোটোস্কোপি ১৮ থেকে ২০ সপ্তাহের মধ্যে ঠিক সময় মতো করানো হয়েছে কিনা তা আলট্রা সাউণ্ড প্রাথমিক পরীক্ষা দ্বারা যাচাই করা হয়। ভ্রূণ বিকৃতির বিভিন্ন দিক এভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়। ফোকোমেলিয়া এবং ক্লেফটলিপ সাথে সাথে ধরা পড়ে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় গর্ভপাত হবার ভয় থাকে শতকরা পাঁচ থেকে দশ ভাগ। স্বামী-স্ত্রী দুজনকে সব বুঝিয়ে বলার সময় তাদের মানসিক প্রতিক্রিয়ার ওপর নজর রাখা হয়। তাঁদের সাথে জন্মের আগে রোগ নির্ণয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনার পর পরিষ্কার বোঝা যায় যে গর্ভপাতকে তারা মানসিকভাবে মেনে নিতে পারবেন না।

ধার্মিক পরিবার

স্বামীর মতে যদিও তার ধর্মে গর্ভপাত নিষিদ্ধ নয় তবুও তাদের পরিবার এটি মেনে নিতে পারবে না। আত্মীয়-স্বজন সবাই ধার্মিক এবং তাদের কাছে মানুষের জীবন খুবই মূল্যবান কাজেই গর্ভপাতে তাদের রাজী হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। এ ব্যাপারে তার স্ত্রীও তার সাথে পুরোপুরি একমত বলে স্বামীটি বিশ্বাস করে। ফলে এটা বোঝা গেল যে শিশু না জন্মানো পর্যন্ত দম্পতি দারুণ ভয় পাচ্ছে। এরপর স্বাস্থ্য পরিদর্শক তাদের বাড়ীতে সাক্ষাতের পরিকল্পনা করেন।

এই ঘটনাটিতে জেনেটিক পরামর্শের প্রয়োজনীয় দিকগুলির উদাহরণ পাওয়া যায়। এক দুর্ঘটনা আবার ঘটার ঝুঁকি নেয়ার আগে সঠিক রোগ চেনা খুব জরুরী। হাত পা ইত্যাদি শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি অনেক কারণেই বিকৃত হতে পারে। তবে একই কারণে বার বার বিকৃতি ঘটার সম্ভাবনা অনেক কম বা একেবারেই শূন্য। আলোচ্য দম্পতিকে এ সব কথা জানিয়েই পরামর্শ কেন্দ্রে আসার কথা বলা হয়েছিলো কিন্তু রোগ নির্ণয়ের পর যখন রবার্টস সিনড্রোম আবার ধরা পড়লো তখন বিকলাংগ শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার শঙ্কাও বেড়ে গেলো। এই কেসের বেলায় ক্লিনিক্যাল পরীক্ষায় রোগ নির্ণয় করা হয়। আগের মত বিকলাংগ শিশুর ময়না তদন্তের পরীক্ষাও এই ব্যাপারে বেশ কাজে লাগে। জন্মগত বিকলাংগ শিশু যখন মারা যায় তখনই তার ময়না তদন্ত করে রাখা উচিত। গর্ভপাতজাত বিকলাংগ শিশুরও ময়না তদন্ত করে রাখা উচিত। রোগ নির্ণয়ের জন্য অনেক সময় ক্রোমোজোমস বিশ্লেষণও দরকার হয়ে পড়ে। জেনেটিক রোগ প্রায় ঠিক ঠিক ধরে ফেলা যায় বলে এ ক্ষেত্রে পারিবারিক ইতিহাস এবং বংশ কাঠামো দরকার হয়। সাধারণতঃ তিন পুরুষের বংশ কাঠামো এবং ইতিহাস নিয়ে এ পরীক্ষা চালানো উচিত। বিলাতে প্রবাসী পরিবারের বহু

বিচিত্র সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক বৈষম্যের কারণে তাদেরকে জেনেটিক পরামর্শ দেয়ার ক্ষেত্রে নানান জটিলতার সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত গবেষণার দরকার।

যে কোন ব্যাপারেই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নেয়া বেশ কঠিন। পরামর্শ ও আলোচনার বিস্তারিত ব্যাখ্যার পরও দম্পতির সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক দরকার হয়ে পড়ে—এটা একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। সংশ্লিষ্টগোষ্ঠীর ব্যক্তিদের সহযোগিতারও প্রয়োজন আছে।

সবশেষে সব রকমের জেনেটিক পরামর্শ সমবেদনার ভংগিতে দেয়া উচিত, যারা এই পরামর্শ দেবেন তারা অস্বাভাবিক শিশুর জন্মের সাথে জড়িত মানসিক সমস্যা সম্পর্কে যেন সচেতন থাকেন।

পরিশিষ্ট

মহিলাটি দ্বিতীয়বার আরেকটি বিকলাংগ শিশুর জন্ম দেন। ছেলেটি ৩১ সপ্তাহ গর্ভে থাকার পর ভূমিষ্ঠ হয়। ওজন মাত্র আধা সের। প্রথমটির চেয়ে এর অংগ বিকৃতি আরো বেশী ছিলো। হাইপোপ্লাটিক গণ্ডাস্থি এবং অস্পষ্ট আকৃতির মুখাবয়ব নিয়েই তার জন্ম হয়। এই শারীরিক বিকৃতি ফটোস্কোপিতে তো ধরা পড়তোই এমনকি এক্সরেতেও ধরা পড়তে পারতো। রবার্টস সিনড্রোম আক্রান্ত দুটি শিশু প্রসবের পরে পরবর্তী শিশু জন্মালেও—বিকলাংগ শিশু জন্মানোর সম্ভাবনা পূর্বের মতোই 'প্রতি চারটিতে একটি' এরকমই থেকে যায়।

পশ্চিমা দেশগুলিতে জন্মপূর্ব রোগ নির্ণয় এবং গর্ভপাতের ব্যাপারে দম্পতিরা এখন আগের চাইতে অনেক বেশী আগ্রহী। তাই জেনেটিক পরামর্শ কেন্দ্র দিন দিন তাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগও পাচ্ছে বেশ।

পরিস্থিতি : বাংলাদেশ

রবার্টস সিনড্রোম এদেশে কত ভাগ শিশুর ক্ষেত্রে হতে দেখা যায়—এ পরিসংখ্যান দেয়া মুশকিল। তবে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের মতে বাংলাদেশে এর প্রকোপ কম নয়।

বাংলাদেশ মুসলমান প্রধান দেশ। এদেশে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগই মুসলমান। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে জ্ঞাতিভাইবোনদের মধ্যে প্রেম ও বিবাহের প্রচলন আছে। এটি ধর্মীয় কোন অনুশীলন নয়। কিন্তু প্রথাটি এমন ভাবে ব্যবহার হয়ে আসছে যেন ধর্মীয় অনুশাসনেরই নামান্তর।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠানের ১৩ জন পুরুষ ও ১৭ জন মহিলা মোট ৩০ জন কর্মীর ওপর এক জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে যে ৩ জন কর্মীর পিতামাতা আপন চাচাতো ভাই-বোন এবং ৫ জন কর্মী নিজেদের খালাতো-চাচাতো-মামাতো ভাইবোনকে বিয়ে করেছেন। এই কর্মীদের পরিবারের ১৫ জন চাচাতো ভাইবোনকে

বিয়ে করেছেন, ৪ জনের বিয়ে হয়েছে খালাতো ভাইবোনের সাথে। মামাতো ফুফাতো ভাইবোনকে বিয়ে করেছেন ১১ জন। ৩০ জন কর্মীর পরিবারে ৩৯ জন দম্পতি চাচাতো মামাতো ফুফাতো খালাতো ভাইবোন।

সেক্ষেত্রে উপরের আলোচনা থেকে আমরা যে চিত্রটি পাই সে অনুযায়ী বাংলাদেশে রবার্টস সিনড্রোমের প্রকোপ বেশ হবার কথা। কিন্তু সঠিক পরিসংখ্যান না থাকার জন্য এবং সবগুলি কেস যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট না হওয়ার ফলে পরিস্থিতি যাচাই করা মুশকিল। জন্মগত বিকলাংগতাকে অধিকাংশ পিতামাতাই ভাগ্যের ফের বলে ধরে নেয়ায় এই বিড়ম্বনা ঘটে।

যাহোক, যাদের মামাতো, চাচাতো ভাই-বোনদের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেছে—তাদের নতুন করে ভাবনার অবকাশ নেই। কিন্তু যারা এখনও ওপথ মাড়াননি বা এমন বিয়ে করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা বিষয়টি ভেবে দেখতে পারেন।

বাঙালীর কোষ্ঠকাঠিন্যে ওষুধ কোম্পানীর পকেট ভারী

—সরোজেন্দ্র মোহন ঘোষ

পেট ভরে খাওয়া এবং মন খুলে পেট পরিষ্কার করে পায়খানা করার আকাংখা বাঙালীর দীর্ঘদিনের। প্রথমটি দুর্লভ, প্রায় স্বপ্ন। তাই দ্বিতীয়টিতে চাপ বেশী। ভালভাবে দু'বেলা খেতে না পারার বাস্তবতাকে বাঙালী ভুলে যেতে চায় রাতে মুখ খুলে হা করে ঘুমিয়ে, বাতাস খেয়ে স্বপ্ন দেখে। অধিকাংশ বাঙালী হা করে ঘুমায় বলে, নাক দিয়ে বাতাস না টেনে সরাসরি মুখ দিয়ে বাতাস টানে। এতে পেট সহজে বাতাসে ভরে যায়, পেট ফেঁপে উঠে। আর সকালে উঠে পেট খালি করার আগ্রহটা বেড়ে যায়।

নগরীর বস্তির পায়খানার সামনে বস্তিবাসীর লাইন, গ্রামে নদী ও পুকুরের পাড়ে সারিবদ্ধ মানুষের বসে থাকা কিংবা শহরের হোস্টেল বা মেসের বাথরুমের সামনে বোর্ডারদের ঘন ঘন আনাগোনা সকালের সাধারণ দৃশ্য।

সকালে উঠে পায়খানা করার ব্যাপারটা আমাদের কথা ও উপকথার অংশ। সকালে পায়খানা করার ব্যাপার নিয়ে রাজার সাথে গোপাল ভাঁড়ের কথোপকথন আমাদের অনেকেরই জানা। এবং পায়খানা করা নিয়ে আমাদের দুর্বলতার কথা ওষুধ কোম্পানীর ব্যবসায়ীদেরও অজানা নয়। ব্যবসায়ীরা মানুষের অজ্ঞতা ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিজ্ঞাপনের দৌলতে অচলকে সচল করে তোলে। সারিবদ্ধ বিজ্ঞপনের ফাঁদে পা দেননি এমন লোক কোটিতে গুটিক মেলে। ভাবনা-চিন্তার অবসর পর্যন্ত থাকে না, ঝট করে বিজ্ঞাপনের জালে আটকে পড়ি। অনেক সময় এর ফল বিষময় হয়ে দাঁড়ায়। তখন কপালে করাঘাত করা ছাড়া উপায় থাকে না। ব্যবসায়ীদের কারণে পায়খানা নিয়মিত প্রতিদিন না হবার ডাক্তারী নাম কোষ্ঠবদ্ধতা। আজকাল কোষ্ঠবদ্ধতায় অর্থাৎ পায়খানা কষে যাওয়া রোগে অনেকেই ভুগছেন। ঠিকমতো পায়খানা না হওয়ার দরুন শরীরের মধ্যে এক ধরনের অসোয়াস্তি দারুণ উৎপাত শুরু করে। এরা যখন বিজ্ঞাপনে দেখেন কোষ্ঠবদ্ধতা সারানোর ভাল ওষুধ বেরিয়েছে অমনি সেটি জোগাড় করার ধান্ধায় কোমর বেঁধে নেমে পড়েন। এবং জোগাড় হলেই খেয়ে নেন। এতে কাজ কিছু হয় না তেমন বলতে চাই না। তবে যেটুকু বলা অন্যায় হবে না, তা হল, এভাবে আমরা দিনকে দিন ওষুধে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছি।

যখন তখন ওষুধ খাওয়া যে বোকামি এবং এর পরিণতি যে মারাত্মক সে কথাটি একবারের জন্যও আমরা ভেবে দেখি না। কিন্তু ভেবে দেখা উচিত। কারণ খাদ্যবস্তু হজম হয় এক ধারাবন্ধ প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতির নিয়ামক হল পাকস্থলীর (Stomach) ক্ষুদ্র অন্ত্র (Small Intestine)। ক্ষুদ্র অন্ত্র যখন স্বাভাবিক নিয়মে একটা কিছু হজম করার কাজে ব্যস্ত থাকে, সেই সময়ে হঠাৎ কোনো 'রেচক ওষুধ' (Laxatives) অর্থাৎ কোষ্ঠবদ্ধতা সারানোর ওষুধ খেলে, ক্ষুদ্র অন্ত্রের স্বাভাবিক কাজকর্মে স্বভাবতই ব্যাঘাত ঘটে। শুধু তাই নয়, এর ফলে পাকস্থলীর বৃহৎ অন্ত্রের স্বাভাবিক কাজেও ছিঁটেফোটা গোলমালের আভাস দেখা দেয়। বৃহৎ অন্ত্র (Large Intestine) তখন প্রয়োজনীয় 'পটাসিয়াম' এবং সোডিয়াম' ঠিকমতো শোষণ করতে পারে না।

প্রাকৃতিক নিয়মে যে ভিটামিন-'বি' শরীরের মধ্যে গঠিত হয়, সেগুলোর উৎপাদনও ব্যাহত হয় ওই ওষুধের অর্থাৎ 'রেচক ওষুধের' (Laxatives) প্রভাবে। তাছাড়া এসব রেচক ওষুধের মধ্যে যে খনিজ তেল থাকে তার প্রভাবে তেলে দ্রবণীয় ভিটামিন-'এ' এবং 'ডি'-ও শরীর থেকে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়।

'রেচক ওষুধ' (Laxatives) খাওয়ার জন্য শরীরে নানা ধরনের উপসর্গ পর পর এসে হাজির হয়। যেমন, (ক) কোষ্ঠবদ্ধতা। ওষুধ খেয়ে কোষ্ঠবদ্ধতা সারাতে গিয়ে কোষ্ঠবদ্ধতাকে আরো ডেকে আনা হয়। (খ) কতগুলো কঠিন অসুখের (দূষিত ক্ষত, অন্ত্রের খিঁচুনি বা ক্যানসার প্রভৃতি) প্রাথমিক লক্ষণগুলো বুঝতে অসুবিধা ঘটে।

কতকগুলো বহুল প্রচারিত 'রেচক ওষুধ' আজকাল বাজারের যত্রতত্র পাওয়া যায়। এগুলো ব্যবহার করার পরে পাকস্থলীর মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনা শুরু হয়। ফলে অন্ত্রপেশীগুলো অস্বাভাবিক উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং খুব তাড়াতাড়ি কাজ করতে শুরু করে। এভাবে হুড়োহুড়ি করে কাজ করার জন্য এক সময়ে ওই পেশীগুলোর মধ্যে চরম অবসাদের ঢল নামে। অর্থাৎ বেশি খাটুনির জন্য দম ফুরিয়ে যায়। তখন ওই 'রেচক ওষুধে' কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর তো হয়-ই না বরং আরো বেড়ে যায়।

বিজ্ঞাননির্ভর সত্য আবিষ্কার হওয়ার আগে লোকের ধারণা ছিল, কোষ্ঠকাঠিন্য হলে পাকস্থলীর ত্যাজ্য পদার্থগুলো শরীরের মধ্যে জমা হয়ে রক্তকে দূষিত করে। এজন্য মাথাধরা, অবসাদ এবং অন্যান্য উপসর্গ শরীরে দেখা দেয়। এর উত্তরে তখনকার এক বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন, "এটা কি করে হয়? যদি সত্যিই এ ধরনের বিষক্রিয়া শরীরের মধ্যে ঘটতো তা হলে শুধুমাত্র পায়খানা করালেই এ থেকে রেহাই পাওয়া যেত না। কারণ সারা শরীরই তখন বিষাক্ত হয়ে যেত। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি, বেশি খেলে বা শরীরের বিশেষ অসুবিধা হলে বমি হয়ে অনেক কিছু বেরিয়ে যায়। শরীরের মধ্যে কোনো ধরনের 'বিষ' সৃষ্টি হলে শারীরিক প্রক্রিয়াতেই অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মে 'বিষহীন' উপাদানে পরিণত হয়। পরে 'লিভার' ও 'কিডনী' সেটিকে শরীর থেকে বের করে দেয়।"

যাহোক 'অন্ত্রে বিষ সৃষ্টির' এই নিছক বাজে ধারণাটি আজও লোকের মন থেকে দূর হয়নি।

অনেকেই বলেন, নিয়মিত কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়া দরকার। এ প্রসঙ্গে জানা উচিত মল নির্গমনের কোনো ধরাবাঁধা ছক নেই। সপ্তাহে একবার মাত্র পায়খানা হওয়াটাও সব সময় অস্বাভাবিক কিছু নয়।

মনের কল্পনাপ্রসূত এই বাজে ধারণাগুলোকে দূর করার জন্য প্রত্যেকেরই পাকস্থলীর (Stomach) কার্যধারা সম্পর্কে বিস্তারিত খবর জেনে রাখা উচিত। পাকস্থলী সংশ্লিষ্ট (ক) ক্ষুদ্র-অন্ত্র (Small Intestine) এবং (খ) বৃহৎ-অন্ত্র (Large Intestine) নামে যে দু'টি অন্ত্র রয়েছে, খাদ্যবস্তু হজম করা এবং মল অপসারণ করার ব্যাপারে এদের ভূমিকা বিশেষ লক্ষ্যণীয়। ২০ থেকে ২৫ ফুট লম্বা ক্ষুদ্র অন্ত্র দেখতে তেমন আহামরি কিছু নয়। কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে এটিকে একটা বিশিষ্ট রাসায়নিক ফ্যাকটরীর সংগে তুলনা করা যায়। এই ক্ষুদ্র অন্ত্র খাদ্যবস্তুগুলোকে ভেঙে ব্যবহারযোগ্য উপাদানে পরিণত করে। 'লিভার' আর 'প্যানক্রিয়াস' নামক দেহযন্ত্রের হজমকারী রসের সাহায্য নিয়ে ক্ষুদ্র-অন্ত্র 'স্টার্চকে' (Starch) ব্যবহারযোগ্য চিনিতে (Sugar), প্রোটিনকে অ্যামাইনো এসিড এবং চর্বিকে (Fat) ফ্যাটি এসিডে রূপান্তর ঘটায়। ক্ষুদ্র অন্ত্রের প্রায় ২ লক্ষ গ্রন্থি (Gland) প্রত্যেক দিন প্রচুর রস নিঃসরণ করে। এই রসের সাহায্যে হজম প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত হয়। ক্ষুদ্র অন্ত্রের পার্শ্বস্থিত 'ভিলাই' (Villii) নামক স্তরটি হজম করা 'প্রোটিন' এবং 'কার্বহাইড্রেটকে' রক্ত প্রবাহের মধ্যে মিশিয়ে দেয় আর 'ফ্যাট'কে মিশিয়ে দেয় লসিকা প্রবাহের (Lymphatic System) মধ্যে। ৩ থেকে ১৫ ঘণ্টা পর 'মিউকাস' এবং 'সেল-শেড' (Cell Shed) দ্বারা গঠিত 'মণ্ড' এবং খাদ্যবস্তুর বাকি অংশটুকু ক্ষুদ্র অন্ত্র থেকে ৫ থেকে ৬ ফুট লম্বা বৃহৎঅন্ত্রে পেঁছে যায়। তখন বৃহৎঅন্ত্র ৩/৪ ঘণ্টার মধ্যে, কখনো বা এর থেকে একটু বেশী সময় নিয়ে এটাকে পুনরায় শোষণ (Absorb) করতে থাকে।

ক্ষুদ্র অন্ত্র সাধারণতঃ জীবাণুশূন্য থাকে কিন্তু বৃহৎ অন্ত্রের মধ্যে অনেক জীবাণু স্তূপীকৃত থাকে। এই জীবাণুর কথা শুনে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কারণ এরা অনেকেই মিত্রভাবাপন্ন। মূল্যবান সব ভিটামিন তৈরীর কাজে এরা খুব সাহায্য করে।

ক্ষুদ্র অন্ত্র থেকে যে পদার্থগুলো বৃহৎঅন্ত্রে আসে সেগুলো থেকে জল এবং লবণ শোষণ করার কাজটি করে বৃহৎ অন্ত্র। এই শোষণ কাজের মধ্যে কিছুটা তারতম্য ঘটলেই তরল পদার্থ এবং খনিজ পদার্থের মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হয়।

পাশ্চিমী সভ্যতা ও কোষ্ঠবদ্ধতা

যাইহোক কখনো কখনো রেচক ওষুধের (Laxatives) জন্যই হোক বা অমনি অমনিই খাদ্যবস্তুগুলো মাঝে মাঝে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি বৃহদঅন্ত্রের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যায়। বৃহদ অন্ত্র তখন ঐগুলো থেকে অতোটা তাড়াতাড়ি আর জল শোষণ করার সময় পায় না। এজন্য অনেকটা মূল্যবান 'পটাশিয়াম'ও নষ্ট হয়ে

যায়। 'পটাশিয়াম মাত্রাতিরিক্ত নষ্ট হলে শ্বাসপ্রশ্বাসের পেশী এবং হৃদযন্ত্রের ক্ষতি হতে থাকে।

অনেকেই পুঁজিবাদ ও পশ্চিমী সভ্যতাকে ভিন্ন করে দেখা সঠিক মনে করেন না। উপনিবেশিকতার সাথে পুঁজিবাদের সম্পর্ক অত্যন্ত আত্মিক। উপনিবেশিকতা ও পুঁজিবাদ পশ্চিমী সভ্যতার বাহন। মূলতঃ উপনিবেশীকরণের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে পশ্চিমী সভ্যতা। পরিবর্তন হয়েছে আফ্রিকা ও এশিয়ার জনগণের জীবনযাত্রার। যোগ হয়েছে তাদের শরীরে নতুন রোগ যা ছিল অতীতে অজ্ঞাত, অপরিচিত।

পশ্চিমী সভ্যতায় অনুপ্রবেশের পূর্বে এশিয়া ও আফ্রিকায় কোষ্ঠবদ্ধতা, উত্তেজনা-প্রবণ অন্ত্রের লক্ষণ (Irritable Bowel Syndrome, Diverticular Disease) প্রভৃতি রোগ ছিল অনুপস্থিত। কারণ এসব দেশের লোকেরা বিশেষতঃ গ্রামের অধিবাসীরা প্রতিদিন কাঁচা ফলমূলই খেত ন্যূনতম ৫০ গ্রাম (প্রায় এক ছটাক) এবং দৈনিক গড়ে পায়খানা করতো ২৫০ গ্রাম; যা ইউরোপ আমেরিকার লোকের জন্য স্বপ্নেও অকল্পনীয়। ইউরোপ আমেরিকার লোকদের মত আমাদের দেশবাসীদেরও তন্তুবিহীন (Fibreless) খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা বেড়েছে এবং বেড়েই চলেছে। তাদের অনুকরণে আমরা বর্তমানে খাচ্ছি আখ বা গুড়ের পরিবর্তে ধবধবে সাদা চিনি (সাহেবদের রঙের সাথে মিল আছে বৈকি ?) ঢেঁকিছাটার পরিবর্তে অটোমেটিক মেশিনের চাউল গম বা আটার পরিবর্তে ধবধবে সাদা ময়দা। চালের পিঠার স্থান দখল করেছে ময়দার তন্তুবিহীন শর্করা রুটি, পরোটা (Refined Carbohydrate)। এসব উন্নতমানের (?) খাদ্য গ্রহণই অন্ত্রের বহু রোগের কারণ। তন্তুর দু'টি বিশেষ গুণ রয়েছে। প্রথমতঃ ছোট অন্ত্রের বিজারক রসে (Small Intestine's Enzyme) তন্তু দ্রবীভূত হয় না বলে, তন্তু সরাসরি তন্তুরূপে বৃহদন্ত্রে (Colon) প্রবেশ করে। দ্বিতীয়তঃ জল ধারণের অস্বাভাবিক ক্ষমতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এক গ্রাম গাজর (Carrot) তন্তুর ২৩ গ্রাম জল ধারণের ক্ষমতা রয়েছে। ফলে বৃহদন্ত্রে সুনিয়ন্ত্রিত গতি সঞ্চার হয়। এবং পায়খানার পরিমাণ বাড়ে।

পুঁজিবাদ ও যান্ত্রিক সভ্যতা বুর্জোয়াদের জীবনকে করেছে অত্যন্ত আয়েসী ও আরামপ্রদ। একমাত্র কৃষক ও একশ্রেণীর শ্রমিক ছাড়া অন্যান্যদের শারীরিক পরিশ্রম কমিয়েছে, সাপ্তাহিক কর্ম ঘণ্টাও কমিয়েছে (অবশ্য দারিদ্র ও অনাহার হ্রাস করেনি)। শারীরিক গতি হ্রাস ও গতিহীনতা কোষ্ঠবদ্ধতার অন্যতম কারণ। ওষুধের কারণেও কোষ্ঠকাঠিন্য সৃষ্টি হয়। পরিচিত ওষুধের মধ্যে নিম্নলিখিত ওষুধগুলো কোষ্ঠবদ্ধতার সাথে সম্পর্কিত। আফিম জাতীয় ওষুধ (মরফিন, বেলাডোনা প্রভৃতি), কতক এণ্টাসিড, আয়রণ (লৌহ) টেবলেট, কেলসিয়াম ও বিসমাথ লবণ এট্রোপিন ও এট্রোপিন জাতীয় ওষুধ যথা হাইওসিন (বাণিজ্যিক নাম এসপাসমোনিল বুটাপান, বাসকোপান, থাইসোমাইড স্পানিল প্রভৃতি), প্রোপানথিলিন (বাণিজ্যিক নাম প্রোবানথিন), ডাইসাই-ক্লোমিন (বাণিজ্যিক নাম মারবেন্টিল, সাইক্লোমিন প্রভৃতি), অক্সিফেন সাইক্লামিন (বাণিজ্যিক নাম 'ডেরিকন')। এছাড়া আরও বহু ওষুধ রয়েছে যা দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে কোষ্ঠকাঠিন্য সৃষ্টি করে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, গর্ভধারণ, স্নায়ু

ও মেরুদণ্ডের কতক রোগ, অন্ত্রের ক্যান্সার ও প্রতিবন্ধকতা এবং হরমোন ও বিপাকীয় (Hormonal & Metabolic) কারণেও কোষ্ঠকাঠিন্য হয়।

আবেগ, অভ্যাস ও কোষ্ঠবদ্ধতা

কোনো কারণে স্নায়ু উত্তেজিত হলে বা রাগ হলে হজম ক্রিয়ার ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। Sigmoidoscope নামক একটি যন্ত্রের সাহায্যে গবেষকরা দেখেছেন, যখন কেউ রেগে লাল হন বা চিন্তায় অস্থির হন তখন তার অন্ত্রের নালিগুলোর রঙও লাল হয়ে ওঠে। এবং ওই নালিতে খিঁচুনি শুরু হয়। ফলে বৃহদন্ত্রের কাজ শ্লথ হয় এমনকি অনেক সময় থেমেও যায়। এই সময়ে অন্ত্র ত্যাজ্য পদার্থ থেকে প্রচুর তরল পদার্থ শোষণ করে নেয়। পরিণতিতে কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয়। এজন্য আজকাল চিকিৎসকরা বিশ্বাস করেছেন এবং বলছেন, কোষ্ঠবদ্ধতার অন্যতম মুখ্য কারণ হল মনের উদ্বিগ্ন ভাব বা অস্থিরতা। তাছাড়া কোষ্ঠবদ্ধতা সম্পর্কে অকারণ অস্বাভাবিক ভীতিও কোষ্ঠবদ্ধতা সৃষ্টির সহায়ক।

হঠাৎ একদিন পায়খানা না হলেই আমাদের চিন্তা হয়। দেরী না করে হয়তো তখনি আমরা রেচক ওষুধ (Laxatives) খেয়ে নিই। ফলে ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় জমা মল সবটুকুই নালি থেকে বেরিয়ে যায়। তখন আবার এই শূন্য নালি পূরণ হতে কমপক্ষে তিন দিন সময় লাগে। এই ২।৩ দিন স্বভাবতই পায়খানা হয় না, হলেও কম হয়। এ থেকে আবার চিন্তা শুরু হয়। সংগে সংগে আর একটি রেচক ওষুধ খেয়ে নিই। এভাবে ধীরে ধীরে আমরা রেচক ওষুধে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি এবং কোষ্ঠবদ্ধতাকে সোহাগ করে ডেকে আনছি। কারণ রেচক ওষুধে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে তখন ওই ওষুধে আর কোনো কাজই দেয় না।

কোষ্ঠকাঠিন্যের ওষুধের প্রকারভেদ

পারগেটিভ (Purgative) বা কোষ্ঠশোধক, কেথারটিক (Cathartic) বা মল পরিশোধক, এভাকোয়েন্ট (Evacuant) বা মল নিঃসারক, এপেরিয়েন্ট (Aperient) বা বিরেচক প্রভৃতি ল্যাক্সাটিভ (Laxative) বা রেচক (মৃদুভেদক) ওষুধেরই সমার্থক শব্দ।

রেচক ওষুধকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়—

(১) মল কোমলকারক (Faecal Softners, Emollients)—ডাইওকটিল, লিকুইড প্যারাফিন প্রভৃতি। এরা মূলতঃ অন্ত্রকে পিচ্ছিল করে মল নিঃসরণে সহায়তা করে। অন্ত্রের দেহকোষ থেকে কতক জল বের করে অন্ত্রের পৃষ্ঠ টান (Surface Tension) কমায় এবং মলকে নরম বা তরল করে। ডাইওকটিল এডিনল সাইক্লেজকে (Adenyl Cyclase) উদ্দীপ্ত করে অন্ত্রের রস বাড়িয়ে দেয়। ফলে অন্ত্রের গতি কিছুটা বাড়ে। অর্শ (Haemorrhoids) ও মলদ্বার চিরে (Anal Fissure) এসব রেচক স্বল্পকালীন পর্যায়ে ব্যবহার চলে। লিকুইড প্যারাফিন দীর্ঘদিন বা বেশীমাত্রায় ব্যবহার শিশু ও বৃদ্ধদের লিপয়েড নিউমোনিয়া সৃষ্টি করে। পাকস্থলী ও অন্ত্রের ক্যান্সারের সম্ভবনার হারও বৃদ্ধি পায় বলে অনেকে মনে করেন।

বিভিন্ন রেচক ওষুধের কার্যপদ্ধতি ও সময়কাল

রেচক ওষুধ	কোথায় মূলতঃ কাজ করে	মাত্রা	কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজনীয় সময় এবং কখন মুখে খেতে হয়।
লিকুইড প্যারাফিন ডাইও-	মল কোমলকারক	১০-৩০ মিলিলিটার	একবারে বিকেলে খেতে হয়।
কটিল	মূলতঃ ছোট অন্ত্রে	২০-১০০ মিলিগ্রাম	সারাদিনে ২-৪ মাত্রায় খাওয়া চলে
মিথাইল সেলুলুজ	স্থূল কোষ্ঠশোধক	১-১'৫ গ্রাম	(১-৩ ঘণ্টা) সকালে
গমের ভুষি (Boan)	উভয় অন্ত্রে শক্ত মলে	পর্যাপ্ত পরিমাণ	ইসবগুলের শরবত সকালে বা
ইসবগুলের ভুষি (Ishaguhla Husk)		ঐ	রাতে খেলে চলে
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	উভয় অন্ত্রে আধা শক্ত	৫-১৫ গ্রাম	১-৩ ঘণ্টা, সকালে।
ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড	(Semi solid) মলে	৩ গ্রাম	উপমহাদেশের রোগীরা সাধা-
সোডিয়াম সালফেট		৫-১৫ গ্রাম	রণতঃ রাতে খায়
সোডিয়াম পটাসিয়াম টারট্রেট		৫-১৫ গ্রাম	
রেড়ির তেল	উত্তেজক ছোট অন্ত্রে	৫-১৫ মিলিলিটার	২-৬ ঘণ্টা, সকালে খালি পেটে।
ছেনা	বৃহদ অন্ত্রে	২০০-৬০০ মিলিগ্রাম	রাতে ৬-১০ ঘণ্টা
কাসকারা		১০০-২০০ মিলিগ্রাম	রাতে ৮-১২ ঘণ্টা
বিসাকোডিল		৫-১০ মিলিগ্রাম	রাতে ৬-১০ ঘণ্টা
ফিনালোপথালিন		৫০-৩০০ গ্রাম	রাতে ৬-৮ ঘণ্টা

(২) স্থূল কোষ্ঠশোধক (Bulk Purgatives)—জলধারক কলয়েড ও খাদ্যতন্তু [যথা মিথেল সেলুলজ, গমের ভুষি, ইসবগুলের ভুষি, ডুমুর আগর, (Agar) প্রভৃতি] এবং অজৈব লবণ (ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, সোডিয়াম সালফেট, সোডিয়াম-পটাসিয়াম টারটেট, ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোঅক্সাইড প্রভৃতি) অন্ত্রের জল টেনে নিয়ে মলের পরিমাণ বাড়িয়ে এবং অন্ত্রে অবস্থানরত দ্রব্যের সংযোগী ক্ষমতা বা সান্দ্রত্ব কমিয়ে অন্ত্রের স্বাভাবিক গতিশীলতা অধিকতর কার্যকর করে কোষ্ঠশোধনের কাজ করে। তবে এ ওষুধগুলো কার্যকর হতে বেশ সময় লাগে। সাধারণতঃ ইলিওসটমী ও কলোসটমী (এক প্রকার শল্য চিকিৎসা। মূলতঃ অন্ত্রের ক্যান্সার রোগীদের অন্ত্রের অংশ কেটে বাদ দেয়া হলে পেট দিয়ে মলদ্বার সৃষ্টি), আলসারোটিভ কোলাইটিস, দীর্ঘস্থায়ী ডায়রিয়া সম্মিলিত ডাইভারটিকুলার রোগ ও উত্তেজনাপ্রবণ অন্ত্রের লক্ষণ (Irritable Bowel Syndrome)। আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে স্থূল কোষ্ঠশোধক কার্যকর। বিভিন্ন প্রকার স্যালাইন এনেমা (Enema) এবং 'মিল্ক অব ম্যাগনেশিয়াসমূহ স্থূল কোষ্ঠশোধক।

(৩) উত্তেজক রেচক ওষুধ (Stimulant Laxatives)—পুরনো দিনের জোলাপ পারদ থেকে শুরু করে আরবদেশের উদ্ভিদ 'ছেনা' (Senna), কালিফোর্নিয়ার গাছড়া ক্যাসকারা, চীনদেশের "রুবারব" এবং আমাদের দেশের রেড়ির তেল সবই উত্তেজক দলভুক্ত। এছাড়াও এই দলে রয়েছে কৃত্রিম রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে তৈরী বিসাকোডিল (বাণিজ্যিক নাম ডালকোল্যাক্স), সোডিয়াম পাইকোসালফেট ও ফিনোল-পথালিন (বাণিজ্যিক নাম এগারল) অন্ত্রে উত্তেজনা সৃষ্টি করা উত্তেজক রেচক ওষুধসমূহের কাজ। ফলে অন্ত্রের কাজের গতি অস্বাভাবিকভাবে ত্বরান্বিত হয়।

এসব ওষুধ প্রায়শঃ পেটে চিনচিনে ব্যথা সৃষ্টি করে এবং দীর্ঘ ব্যবহারে অন্ত্রীয় কার্যকারিতা একেবারে নিঃশেষ করে দেয় (Atonic Non-functioning Colon)। শিশু ও গর্ভবতীদের এসব ব্যবহার মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। উল্লেখযোগ্য যে, কালের গতিতে পারদ জোলাপ, রেড়ির তেল ও ফিনোলপথালিনের কোষ্ঠশোধক হিসেবে ব্যবহার নেই বললেই চলে।

কি করণীয়

নিয়মিত রেচক ওষুধ ব্যবহারে অন্ত্রের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হতে বাধ্য। তখন নিজের নিয়মে আর পাকস্থলী কাজ চালাতে পারে না। তবে তাই বলে কি 'রেচক ওষুধ' ব্যবহার একেবারেই বন্ধ করে দিতে হবে? না। যেমন ধরুন, অপারেশন বা এক্স-রে-র প্রয়োজনে অন্ত্রনালী শূন্য করতে হলে, রুগীর রোগ নিরাময়ের জন্য অথবা যে সব বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের স্বাভাবিক ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে রেচক ওষুধ (Laxatives) ব্যবহার তো করতেই হবে।

এখন হয়তো প্রশ্ন আসতে পারে, কোষ্ঠকাঠিন্য হলে তখন কি করা উচিত? এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা বলেন, এক, প্রচুর পরিমাণে তরল পানীয় খেতে হবে। এ জন্য দিনে সাত/আট গ্লাস জল খাওয়া উচিত। জল যত বেশী খাবেন ততই ভাল। দুই,

খাদ্যবস্তুর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে তরকারি এবং ফল জাতীয় খাদ্য রাখা দরকার। বরই, ডুমুর, জাম, লিচু, পেয়ারা, জামরুল, কামরাঙ্গা, আমড়া, তেঁতুল, তেঁতুল ও কাঁঠালের বিচি, আম, কাঁঠাল, আনারস, যখন যে ফল পাবেন তখন তা খাবেন। কোষ্ঠবদ্ধতা আপনার নাগালে আসবে না, এ নিয়ে ভেবে সময়ক্ষেপণ করবেন না। এবং তিন, যখনই পায়খানায় বেগ হবে তক্ষুণি পায়খানায় যেতে হবে। বারে বারে পায়খানা চেপে রাখলে পরবর্তী সময়ে কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দিতে পারে।

শিশুদের কোষ্ঠ শিথিল করানোর ওষুধ খাওয়ানো কেবল অনুচিত নয়, এটা ক্ষতিকর। কোন শিশুর কোষ্টবদ্ধতা দেখা গেলে (অর্থাৎ ৩-৪ দিনেও একবার পায়খানা না হলে) তার খাদ্য অভ্যাসের পরিবর্তন প্রয়োজন। তাকে চিনি জাতীয় খাদ্য একটু বেশী পরিমাণে খাওয়ালে বা দুগ্ধ জাতীয় খাদ্যের সাথে চিনি মিশিয়ে খাওয়ালে পায়খানা নরম হবে। তরল পদার্থ বেশী করে খাওয়াবেন।

সবশেষে বলতে হয়, পাকস্থলীর অন্ত্রগুলোকে নিজের নিয়মে কাজ করতে দিন। বাইরে থেকে কিছু আমদানি করে ওদিকে জ্বালাতন না করাই ভাল। যদি নেহাৎ কোনো অসুবিধা হয়, চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। লাল আটা এবং ঢেঁকি ছাঁটা চাল খাওয়া ভাল। রাতে ভাত না খাওয়াই ভাল। সকালে উঁচু নিচু জায়গায় ভ্রমণ স্বাস্থ্যপ্রদ। ব্যায়াম করুন, সম্ভব হলে জমিতে বা বাগানে কাজ করুন। সোজা কথায় কেবল চেয়ারে বসে থাকবেন না কিছু শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করবেন।

লেখক পরিচিতি

সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অফিসার
স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন
কলিকাতা।

তথ্যসূত্র

(১) Current Medical Diagnosis and Treatment, 1985 Edited by M.A. Krupp & others. Lange Publications, USA.

(২) British National Formulary, No. 9, 1985 Jointly Published by British Medical Association and Pharmaceutical Society of Great Britain.

(৩) Basic & Clinical Pharmacology, 1984 Edited dy B. G. Katzung Lange Publications USA.

(৪) Clinical Pharmacology, by D. R. Lawrence & P. N. Bennett. UK 1983.

ধূমপানে শুক্র বৈকল্য ঘটতে পারে

বিশেষ প্রতিবেদক

ধূমপানের জন্মকথা

ধূমপানের প্রসারের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারের সাথে জড়িত। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের মাধ্যমে ইউরোপীয়দের ধূমপানের সাথে পরিচিতি ঘটে। তারা আমেরিকান ইন্ডিয়ানদেরকে পাইপের মাথায় পাতায় আগুন দিয়ে মুখ দিয়ে টানতে দেখেন। প্রথমে ভেবেছিলেন এটা 'আগুন দেবতার' উপাসনা বা এক প্রকার অস্ত্র। সত্বর তারা উপলব্ধি করেন যে, আনন্দ ও স্নায়ু উত্তেজনার জন্য এটা বিশেষ একপ্রকার পাতার ধোঁয়া সেবন। এই পাতাই পরবর্তী কালে তামাক পাতা বা 'নিকোটিনিয়াম তাবাকাম' নামে সারা পৃথিবীতে পরিচিত হয়।

আমেরিকান ইন্ডিয়ানরা ধোঁয়া টেনে মুখ দিয়ে বের করে দিতেন বলে ধোঁয়া ফুসফুসে প্রবেশ করতো না। ফলে স্বাস্থ্যের জন্য ততটা ক্ষতিকর ছিল না। তামাকের জন্মভূমি ভার্জিনিয়া, মধ্য-আমেরিকা, ব্রাজিল, কিউবা ও কেরিবিয়ান দেশসমূহ। কলম্বাস ও তার সহযাত্রীরা তামাক চারা ইউরোপে আনেন। পর্তুগালের রাজধানী লিসবনস্থ ফরাসী রাষ্ট্রদূত জঁা নিকোট (Jean Nicot) তামাক পাতায় ওষুধি গুণাবলী আছে ভেবে ফরাসী দেশে তামাকের বিস্তার ঘটান এবং পরবর্তীকালে তারই নামানুসারে তামাক গাছের নামকরণ হয় 'নিকোটিনিয়াম তাবাকাম" (Nicotinium Tabaccum)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় প্রথম বৃটিশ উপনিবেশ স্থাপন এবং রানী প্রথম এলিজাবেথের প্রিয়পাত্র, লেখক ও নাবিক স্যার ওয়াল্টার রেলী (১৫৫৪-১৬১৮ খ্রীঃ) বৃটেনবাসীকে ধূমপানের সাথে পরিচিত করান। এর পূর্বে বৃটেনে ধূমপানের প্রচলন ছিল না। এ সম্পর্কে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। বৃটিশ গায়না পরিভ্রমণ শেষে স্যার ওয়াল্টার রেলী লন্ডনে ফিরে তার বাসভবনে বসে এক শীতের সকালে ছোট মাটির পাইপের মাথায় তামাক পাতায় আগুন দিয়ে ধোঁয়া সেবন করছিলেন, তখন তার চাকর সাহেবের মুখে আগুন দেখে হতভম্ব হয়ে যায় এবং রেলী সাহেবের গায়ে মুখে আগুন লেগেছে মনে করে সাহেবের গায়ে কয়েক বালতি জল ঢেলে দেয়। এর ফলে রেলী সাহেব বেশ কয়েকদিন শয্যাশায়ী ছিলেন।

রাণী প্রথম এলিজাবেথ রেলী সাহেবের মুখ থেকে গন্ধ বের হচ্ছে বলে অভিযোগ করলে, স্যার ওয়াল্টার উত্তর দেন যে, তামাক সেবন দুর্গন্ধময় নয় বরঞ্চ এটা পৌরুষত্ব ব্যঞ্জক। ওয়াল্টার সাহেব দীর্ঘদিন পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। তার লেখনী ও বক্তব্যের কারণে ধূমপান সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন অভ্যাসরূপে সমাজের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে দ্রুত ব্যাপ্তি লাভ করে।

কিউবা, মেক্সিকো, ব্রাজিল ও মধ্য আমেরিকায় দীর্ঘদিন ধরে সিগারের প্রচলন ছিল। তামাক পাতাকে ভুট্টা পাতা দিয়ে জড়িয়ে সিগার তৈরী করা হতো। মধ্য আমেরিকায় 'মায়া' সভ্যতার নিদর্শন বিভিন্ন মাটি, তামা, লৌহ ও স্বর্ণ পাত্রের গাত্রে 'সিগার' উৎকীর্ণ দেখা যায়। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দশম শতাব্দী থেকেই নিশ্চিতভাবে সেখানে তামাকের প্রচলন ছিল। 'মায়া' ভাষায় 'সিকার' (Sikar) শব্দের অর্থ ধূমপান। 'সিকার' থেকে স্পেনিশ 'সিগারো' (Cigarro) শব্দের উৎপত্তি। স্পেন থেকে ইউরোপের অন্যান্য দেশে ক্রমে 'সিগারের' প্রসার ঘটে। ১৮১৪ সনে স্পেনে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় বৃটিশ সৈনিকরা সিগারের সাথে পরিচিত হয় এবং তারাই বৃটেনে সিগারের প্রসার ঘটায়। সিগারের পরের ধাপ সিগারেট শব্দটির উদ্ভব ফ্রান্সে। ১৮১৪ সনে স্পেনে নেপোলিয়নের সৈন্যদের সিগার জাতীয় ধূমপানের সাথে সংযোগ হয়। তারাই ফ্রান্সে ধূমপানের আদি প্রবর্তক।

আমেরিকার আজটেকরা (Aztecs) কাগজ বা বেতের নলের ভিতর তামাকের গুড়ো ঢুকিয়ে ধূমপান করতো। এটাই সম্ভবতঃ পৃথিবীর আদি সিগারেট। ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনের ধনী-অভিজাত সম্প্রদায় সিগারের গোড়ার যে অংশটা খেয়ে ছুড়ে ফেলে দিতেন, সে অংশটা সেভিলের ভিখারীরা কুড়িয়ে, সিগার থেকে তামাকের গুড়ো বের করে নিতো এবং তা ছেঁড়া কাগজে পেঁচিয়ে পাকিয়ে ধূমপান করতো। এটা গরীব মানুষের ধূমপান বলে পরিচিত ছিল—'পেপেলেটস্' (Papeletes) বা 'সিগারিলোস' (Cigarillos)। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সিগারিলো আভিজাত্য লাভ করে সিগারেটে পরিণত হয়।

১৮৫৩ সনে বাষ্প পরিচালিত প্রথম সিগারেট ফ্যাক্টরী স্থাপিত হয় কিউবার রাজধানী হাভানায়। ১৮৮০ সালে জেমস্ বনস্যাক প্রথম সিগারেট তৈরী মেসিনের পেটেন্ট রেজিষ্ট্রী করান আমেরিকায়। ১৮৮৪ সনে এ মেসিনের সংগে সিগারেট কাগজে সিগারেটের নাম ইত্যাদি ছাপাবার যন্ত্রও সংযোজিত হয়। এই মেসিনে দৈনিক একলক্ষ সিগারেট তৈরী হতো। ১৮৮০ সালে আমেরিকায় ৫০ কোটি সিগারেট উৎপাদিত হয়, ১৮৮৫ সনে ১০০ কোটি এবং ১৮৯৫ সনে ৪০০ কোটি সিগারেট উৎপাদিত হয়।

১৮৮৩ সনে W. D. & H.O. Wills বিলেতে (ক্যাপষ্টান, উইলস্ সিগারেটের প্রস্তুতকারক) বনস্যাক পেটেণ্টকৃত সিগারেট উৎপাদন মেসিন স্থাপন করেন। দুই মহাযুদ্ধে ইউরোপ ও আমেরিকায় সিগারেটের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। বিংশ

শতাব্দীতে পঞ্চাশের দশকে টিপড সিগারেট এবং ষাটের দশকে ফিল্টারযুক্ত সিগারেটের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে।

তৃতীয় বিশ্বে ধূমপানের প্রসার

স্পেনিশ ও পর্তুগীজ ব্যবসায়ীরা আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ধূমপানের খবর ছড়ালেও অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তামাকের উৎপাদন আমেরিকা, ইউরোপ ও তুরস্কেই সীমাবদ্ধ ছিল। বৃটিশ ঔপনিবেশিক বিস্তারের সাথে সাথে আফ্রিকা ও এশিয়ার পরাভূত দেশসমূহে ক্রমান্বয়ে কিছু কিছু করে তামাক পাতার উৎপাদন শুরু হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এ উৎপাদন তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, ঔপনিবেশিক শাসন শেষ হবার পর পরই সদ্য-মুক্তিপ্রাপ্ত আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহে দ্রুত ধূমপান প্রসার লাভ করে। খাদ্য শস্যের জমিগুলো তিন দশকের মধ্যে তামাক চাষের জমিতে পরিণত হয় এবং আরও হচ্ছে। একই ঘটনা ঘটেছে ভারত, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, মালয়, কেনিয়া, পাকিস্তান, জাম্বিয়া এমন কি তানজানিয়াতেও। এই কারণে ১৯৭১ সনে বৃটিশ মেডিকেল জার্নালের সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল "আমরা আমাদের দেশে (ইউরোপ ও আমেরিকায়) সিগারেটে আসক্ত কোটি কোটি ক্রীতদাস সৃষ্টি করেছি। এটা আমাদের কর্তব্য যে, এ আসক্তির দাসত্ব আমরা যেন আফ্রিকা ও এশিয়ার নবীন দেশসমূহে রপ্তানী না করি।

ফাউ (জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা)-এর মতে, ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৫ সনের মধ্যে পৃথিবীতে তামাকের ব্যবহার ৩—৫% বেড়েছে। ১৯৭৫ সন থেকে উন্নত দেশসমূহে ধূমপান কমতে থাকে, অপর পক্ষে অনুন্নত দেশসমূহে দ্রুত ধূমপানের প্রসার হতে থাকে। বিষয়টা নিম্নলিখিত ছক থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে।

মহাদেশ ভিত্তিক দেশসমূহ	১৯৮০ সনে ধূমপানের হার (%) বৃদ্ধি
আফ্রিকা	৩৩%
লাটিন আমেরিকা	২৪%
এশিয়া (জাপান ব্যতীত)	২৩%
পশ্চিম ইউরোপ	১৩%
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা	৩·৭%

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, তৃতীয় বিশ্বে তামাক চাষের ব্যাপ্তি এবং ধূমপানের দ্রুত প্রসার সম্পর্কিত তথ্য অত্যন্ত সীমিত। এতদসত্ত্বেও, এটা নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে, অপরিণত বয়স্ক ও তরুণদের মধ্যে ধূমপান দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। আগে এসব দেশে মহিলাদের ধূমপান করতে দেখা যেতো না বলা চলে। বর্তমানে সমাজের

উঁচু স্তরের মহিলাদের অনেককেই নারী স্বাধীনতার নামে ধূমপান করতে দেখা যায়।

তৃতীয় বিশ্বের ধূমপানের দ্রুত বিস্তৃতি বুঝতে হলে, পৃথিবীর তামাক সম্রাটদের জানা প্রয়োজন। তামাক জগতের প্রধান সম্রাট—'বাট' (BAT—বৃটিশ আমেরিকান টোবাকো) 'বাটের' সৃষ্টি হয়েছিলো বৃটিশ ও মার্কিন তামাক ব্যবসায়ীদের দীর্ঘ দিনের ব্যবসায়িক যুদ্ধের সন্ধির ফলশ্রুতিতে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধিতে কোন মারপ্যাঁচ ছিল না। সারা পৃথিবীকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। বৃটেন, আমেরিকা এবং বাকী বিশ্ব। 'আমেরিকার টোবাকো কোম্পানী' স্বদেশে অবস্থান করবে এবং আমেরিকা শাসন করবে। অন্যদিকে বৃটিশ ইম্পিরিয়াল টোবেকো কোম্পানী স্বদেশে থেকে বৃটেনকে শোষণ করবে। উভয় মিলে সৃষ্টি করলো 'বাট'—তারা বাকী বিশ্ব শাসন করবে। এই কোম্পানিগুলোর পরের স্তরে অবস্থান করছে ফিলিপ মরিস এবং আর. জে. রেনল্ডস। রথম্যান বলুন, 'বেনসন এন্ড হেজেস' বলুন, মলবরে, কেন্ট, গোল্ডফ্লেক বলুন, অথবা গোল্ডলিফ, ক্যাপস্টান বা স্টেটস এক্সপ্রেস যাই হোক না কেন, এগুলো এদেরই কেউ না কেউ নিয়ন্ত্রণ করছে। এক রথম্যান ছাড়া বাকীগুলো 'বাট' স্বনামে বা বেনামীতে সাবসিডিয়ারী কোম্পানীর মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সিগারেট বাজারজাত করে থাকে। বাংলাদেশ টোবাকো কোম্পানী (বি টি সি) 'বাটের' সাবসিডিয়ারী কোম্পানী।

'বাট' দুটি নিয়ম (অনিয়ম) এর মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বে তার বাজার দ্রুত সম্প্রসারণ করেছে এবং আরও করছে। অনুন্নত দেশ ও সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের 'বাটের' সাবসিডিয়ারী কোম্পানীর ডিরেক্টার, ম্যানেজিং ডিরেক্টার ও চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করে বাট তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের শাসন ও আইনকে ভ্রুক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ করেছে। উদাহরণ হিসেবে কেনিয়ার কথা ধরা যাক।

অধ্যাপক জোসেফ মাইনা মুনগাই নাইরোবী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান এবং নাইরোবী মেডিক্যাল কলেজের বর্তমান ডীন। ধূমপানের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জনসাধারণকে সজাগ করার জন্য তিনি সচেষ্ট। 'বাট'কে স্বদেশে কতকগুলো স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আইন মেনে সিগারেট বাজারজাত করতে হয়। এই আইনগুলো কেনিয়াস্থ 'বাট'-এর উপর কেন প্রযোজ্য হবে না এজন্য তিনি দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। কিন্তু খুব সুবিধে করতে পারছেন না। এর কারণ কি ?

কেনিয়াস্থ 'বাট' এর চেয়ারম্যান বুথেল মারকো জিকাগো নাইরোবী বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিলেরও চেয়ারম্যান। বৈবাহিক সূত্রে তিনি কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট জমো কেনিয়াত্তার পরিবারের সাথে সম্পর্কিত।

নদীতে বাস করে কি কুমীরের সাথে ঝগড়া চলে ?

তৃতীয় বিশ্বে ধূমপানের প্রসার

তৃতীয় বিশ্বে ধূমপানের দ্রুত প্রসারের অন্যতম কারণ বিজ্ঞাপন। বাংলাদেশে

একমাত্র মাসিক গণস্বাস্থ্য ছাড়া প্রায় সব পত্র-পত্রিকায় সিগারেট ও ধূমপানের বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। বাংলাদেশে সিগারেট কোম্পানীগুলো বিজ্ঞাপনে মোট কত টাকা ব্যয় করে থাকে তার কোন হিসেব নেই বলে উদাহরণ হিসেবে তৃতীয় বিশ্বের অপর দেশ মালয়েশিয়ার কথাই ধরা যাক। 'বাট' (BAT—বৃটিশ আমেরিকান টোবাকো) ও রথম্যান এক বছরেই (১৯৭৭ সনে) সিগারেটের বিজ্ঞাপনে ব্যয় করেছে ২০৯ মিলিয়ন স্টার্লিং পাউন্ড (১৩ কোটি টাকা)। বিজ্ঞাপনের অর্ধেকেরও বেশী ব্যয়িত হয়েছে টেলিভিশন, সিনেমা, সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে বিজ্ঞাপনে। জাতীয় স্পোর্টস', স্কুল কলেজের খেলাধুলা, ফুটবল, ক্রিকেট ও সাঁতার প্রতিযোগিতা থেকে শুরু করে রোটারী লায়নস ক্লাবের হাঁটা প্রতিযোগিতা, বিচিত্রানুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতারও বিজ্ঞাপনের অর্থ ব্যয় করা হয়। বিজ্ঞাপনের ভাষাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—'Join the smart set'; 'King size Cigarette of International success'; 'Enjoy that fine clear head feeling,' 'That very special taste of success'। এগুলোর বাংলা করলে দাঁড়ায়—'বুদ্ধিমান মানুষের সাথে যোগ দিন'; 'দীর্ঘাকৃতি সিগারেটে (কিংসাইজ) আন্তর্জাতিক সাফল্য'; 'প্রচ্ছন্ন অনুভূতি উপভোগ করুন,' 'সাফল্যের বিশেষ স্বাদ গ্রহণ করুন'। প্লেয়ার এর গোল্ড লিফ সিগারেট আরও একধাপ এগিয়ে গেছে—তারা বিজ্ঞাপনে লিখছে 'For very important people' (খুব গুরুত্বপূর্ণ লোকদের জন্য) সিগারেট কোম্পানীর বিজ্ঞাপনগুলো নিশ্চিতভাবে ধনী তরুণ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে। তবে তাই বলে তারা গরীবদের কথা ভুলে যায় নি। মালয়েশিয়ায় সিগারেট কোম্পানীর রেডিওতে বিজ্ঞাপনে শতকরা ১০ ভাগ অর্থ ব্যয় করে। গরীবের টেলিভিশন দেখার সুযোগ কম এবং পত্রিকা পড়তে জানে না। কিন্তু রেডিও বার্তা গ্রামাঞ্চলে পৌঁছে। এবং রেডিওর বিজ্ঞাপন গরীবদেরই উদ্দেশ্যে। মালয়েশিয়ার 'বাট' রেডিওতে প্রচার করে থাকে—'State Express—Special taste of success' (সাফল্যের বিশেষ স্বাদের জন্য: স্টেট এক্সপ্রেস)—গরীবের ঘোড়া রোগ হবে না এমন কথা নিশ্চিত-ভাবে বলা যাবে না।

'বাট' এর সাবসিডিয়ারী পাকিস্তান টোবাকো কোম্পানীর কর্মকর্তা ডাঃ মমতাজ আহমদ ১৯৭৬ সনে টোকিওতে আন্তর্জাতিক তামাক বিজ্ঞান কংগ্রেসে দুঃখ করে বলেছিলেন, "এত বিজ্ঞাপনের পরেও পাকিস্তানের মোট ধূমপায়ীদের শতকরা ২% জন মাত্র মহিলা। তবে সুখের বিষয় যে, নারীমুক্তি আন্দোলন ও নগরায়নের ফলশ্রুতিতে ১৯৮০ সনের মধ্যে মহিলা ধূমপায়ীর সংখ্যা ৫% হবে বলে আশা করা যায়।',

উন্নত দেশসমূহে সিগারেটের বিজ্ঞাপন সম্পর্কে অত্যন্ত কড়াকড়ি করা হয়ে থাকে। তাই উন্নত দেশসমূহে সিগারেট কোম্পানীগুলো ভিন্নভাবে প্রচার কার্য চালিয়ে থাকে। সম্প্রতি লন্ডনে ইনস্টিটিউট অব অকোপেশনাল হেলথ বিল্ডিং-এর নির্মাণ কার্যের জন্য ইম্পিরিয়াল টোবাকো, গালাহায় রথম্যান জন প্লেয়ার প্রভৃতি কোম্পানী বিস্তর টাকা দান (বিনিয়োগ) করে সবাইকে জানানোর উদ্দেশ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়। বৃটিশ মেডিকেল জার্নালের সম্পাদকীয়তে দুঃখ করে মন্তব্য করা হয় যে, "বৃত্তিজ রোগের

(occupational disease)-এর বিস্তারের মূল কারণ ধূমপান। অথচ সিগারেট প্রস্তুতকারকই এসব রোগ সংক্রান্ত ইনস্টিটিউট তৈরীর জন্য ব্যয় করছে—ভূতের মুখে রাম নাম।"

ধূমপান ও স্বাস্থ্য

সিগারেটের ধোঁয়ায় কত রকমের ক্যানসার উৎপাদক বা ক্যানসার সৃষ্টিতে সহায়ক কেমিকেলস রয়েছে তার সঠিক সংখ্যা এখনও নির্ণীত হয়নি। তবে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সিগারেটের ধোঁয়ায় কমপক্ষে হলেও ৩০ (ত্রিশটি) ক্যানসার উৎপাদক উপাদানের উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে ক্ষতিকর বহু উপাদান এখনও অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে।

সিগারেটের প্রতিটি আবিষ্কৃত বা অনাবিষ্কৃত উপাদানই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। সবচেয়ে ক্ষতিকর উপাদান হলো 'টার' (Tar) এবং 'নিকোটিন' (Nicotine)। 'টার' ও 'নিকোটিনের' পরিমাণ কমালে স্বাস্থ্যের অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতি হবে, তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে 'নিরাপদ ধূমপান' (Safe Cigarette) বলে কিছু নেই।

সে কারণেই বিড়ি, হুকা, পাইপ বা চুরুট পানও নিরাপদ নয়। কারণ এগুলোও ক্ষতিকর উপাদান থেকে মুক্ত নয়। চুরুট এবং পাইপের ভিতরকার তামাকের মধ্যে যে ক্ষতিকারক উপাদান রয়েছে তা সিগারেটের চেয়েও মারাত্মকভাবে শক্তিশালী। এসবের দ্বারা ঠোঁটে ও মুখে ক্যানসার হবার সম্ভাবনা রয়েছে। পাইপ ও চুরুট-পায়ীদের মৃত্যুর হার অধূমপায়ীদের মৃত্যু হারের চেয়ে চার গুণ বেশী। বিড়ি ও হুকাও সমান ক্ষতিকর। ষাট দশকের পূর্ব পর্যন্ত উন্নত দেশসমূহে সিগারেটে ২ মিলিগ্রাম টার এবং ৩ মিলিগ্রাম নিকোটিন থাকতো। ১৯৭৭ সনের মধ্যে টারের হার ১৬.৬ মিলিগ্রাম এবং নিকোটিনের পরিমাণ ১.০৯ মিলিগ্রামে কমিয়ে আনা হয়। টার ও নিকোটিনের পরিমাণ কমানোর প্রক্রিয়া উন্নত বিশ্বে অব্যাহত রয়েছে কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের চিত্র ভিন্ন।

বিভিন্ন দেশে বিক্রীত প্রতি সিগারেটে 'টার'-এর পরিমাণ (মিলিগ্রাম)

ব্র্যানড্স	ফিলিপাইন	অস্ট্রেলিয়া	ইংল্যান্ড
কেন্ট	৩৩	১৫	১৩
কূল	৩২	১৫	—
মলবরো	২৫	১৪	১৫
চেস্টারফিল্ড	৩১	১৮	১৬

সিগারেট যে শরীরের জন্য কিরূপ ক্ষতিকর তা একটি ছোট উদাহরণ থেকে বুঝা যায়—একটি এবং কেবলমাত্র একটি সিগারেটই নাড়ীর গতি বাড়াবার জন্য

যথেষ্ট। সিগারেটের প্রথম টান দেবার সংগে সংগেই নাড়ীর গতি দ্রুত হয়। এটা সম্ভবতঃ নিকোটিনের কারণে হয়ে থাকে।

১৯৭০ সনে সিগারেটের আগুন বা ধূমপানের জন্য ব্যবহৃত ম্যাচ কাঠির আগুনে মার্কিন দেশে ১,০৭২০০ বাড়ীতে আগুন ধরে এবং এতে ৯৬ মিলিয়ন ডলার (১৯২ কোটি টাকা) মূল্যের সম্পত্তি বিনষ্ট হয় ও ১৮০০ জন মারা যায়। এবার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও ধূমপানের প্রতিক্রিয়ার হিসেব নেওয়া যাক। শতকরা ৮০ ভাগ ফুসফুসের ক্যান্সার (Lung cancer) ধূমপানের কারণে হয়ে থাকে। অধূমপায়ীদের চেয়ে ধূমপায়ীদের ফুসফুসের ক্যান্সার থেকে মৃত্যুর হার দশগুণ বেশী।

ধূমপায়ীরা প্রায়শঃ এমফিসিমা (Emphysema) ও ব্রঙ্কাইটিসে (Bronchitis) ভুগে থাকেন। মৃত্যুর চেয়ে বড় কথা হলো, ধূমপায়ীরা এসব রোগে ভোগে বলে প্রায় সময় কাজে অনুপস্থিত থাকে। এক বৃটেনেই ধূমপায়ীরা এমফিসিমা ও ব্রঙ্কাইটিসের কারণে ৩৫০,০০,০০০ (সাড়ে তিন কোটি) মানব দিবসে কাজে অনুপস্থিত ছিল।

অধূমপায়ীদের চেয়ে ধূমপায়ীরা অধিকতর পেপ্‌টিক আলসার ও হৃদরোগে ভুগে থাকে। যারা দিনে ১০টির কম সিগারেট পান করে থাকেন, তাদের মৃত্যুর হার অধূমপায়ীদের চেয়ে ৩৫ ভাগ বেশী। যারা ১০—১৯টি সিগারেট খেয়ে থাকেন, তাদের মৃত্যুর সম্ভাবনা অধূমপায়ীর চেয়ে ৭০ ভাগ বেশী হবে।

যারা দিনে ২০—৩০টি সিগারেট খান তাদের মৃত্যুর সম্ভাবনা ৯৫ ভাগ এবং যারা দিনে ৪০টি সিগারেট পান করেন তাদের মৃত্যুর সম্ভাবনা অধূমপায়ীর তুলনায় ১২৫ ভাগ বেশী।

যারা ২০ বৎসর বয়সের পূর্বে ধূমপান শুরু করেছেন তাদের মৃত্যুর সম্ভাবনা যারা ২৫ বৎসর বয়সে ধূমপান শুরু করেছেন তাদের চেয়ে অনেক বেশী। ধূমপায়ীরা যে অধূমপায়ীদের তুলনায় অধিক হারে পেপটিক আলসারে ও করোনারীতে (হৃদপিণ্ডের রোগ) ভুগে থাকেন কেবল তাই নয়, ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে পেপটিক আলসারের এনটাসিডের কার্যকারিতা কম এবং রোগ সারতে অধিকতর সময় প্রয়োজন হয়। সিগারেটের নিকোটিনের কারণে করোনারী ধমনীর সংকোচন হয়। ফলে হৃদপিণ্ডে কম রক্ত সরবরাহ হয়। এটাই হৃদরোগের উৎস।

ধূমপান ও গর্ভস্থ শিশু

গর্ভকালীন সময়ে মায়েরা ধূমপান করলে, নিকোটিন গর্ভস্থ শিশুর রক্তনালীর সংকোচন করে এবং শ্বাস প্রশ্বাসে অসুবিধা সৃষ্টি করে। কার্বন মনো-অক্সাইড শিশুর অক্সিজেন সরবরাহ কমিয়ে দেয় বলে শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং প্রসবকালে অধূমপায়ী মায়ের শিশুর চেয়ে গড়ে ৫.১ আউন্স (প্রায় তিন ছটাক) ওজন কম হয়। ধূমপায়ী মায়েরা অধিকতর মৃত শিশু (Still births) প্রসব করেন এবং তাদের শিশু মৃত্যুর হারও বেশী। ধূমপায়ী মায়েদের শিশুদের দৈহিক

ও মানসিক বৃদ্ধি স্বাভাবিক নয়। এদের গড়ন খাটো হয়, এরা পড়াশুনা ও সামাজিক মেলামেশায় যথেষ্ট পশ্চাদপদ থাকে। ধূমপায়ী মায়েদের ধূমপানের বিষক্রিয়া গর্ভস্থ ভ্রূণে ক্যান্সারের সম্ভাবনা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

ধূমপায়ী পিতা যদি মায়ের আশেপাশে বসে সারাদিনে একঘন্টা বা ততোধিক সময় ধূমপান করেন, তবে গর্ভস্থ শিশুর উপরোক্ত ক্ষতিসমূহ হবার সম্ভাবনা রয়েছে তো বটেই, মায়ের ক্ষতি পিতার ক্ষতির চেয়েও বেশী হবে।

সিগারেটের ধোঁয়ার মূল প্রবাহের (main stream) চেয়ে পার্শ্ব প্রবাহে (side stream) ক্যান্সার উৎপাদক বা সহায়ক কারসিনোজেনের পরিমাণ অধিকতর থাকে।

ধূমপায়ীরা সাধারণতঃ নিজের ধূমপানের মূল প্রবাহের কতক অংশ মাত্র শ্বাসের সাথে গ্রহণ করে থাকেন। অপরপক্ষে ধূমপায়ী স্বামীর সাথে ঘরে অবস্থানকারী অধূমপায়ী স্ত্রী মূল প্রবাহের চেয়ে পার্শ্ববর্তী প্রবাহের ধোঁয়া অধিকতর পরিমাণে শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে গ্রহণ করে থাকেন।

স্বামীর ধূমপানকালে গর্ভবতী স্ত্রী যদি এক ঘন্টাকাল অবস্থান করেন তবে যে পরিমাণ ডাইমিথাইলনাট্রোসামিন গর্ভবতী মা নিঃশ্বাসের সাথে গ্রহণ করবেন তা ফিল্টার বিহীন ১৫ টি সিগারেট বা ফিল্টারযুক্ত ৩৫টি (পঁয়ত্রিশ) সিগারেট পানের সমতুল্য। ধূমপায়ীর পাশে বসলে অপেক্ষাকৃতভাবে অধিক ক্যান্সার উৎপাদক কারসিনোজেন অধূমপায়ীর ফুসফুসে প্রবেশ করে।

ধূমপায়ী স্বামীর সঙ্গ যদি একান্তই পরিহার করা না যায়, তবে স্বামীর মুখোমুখি বসাই ভাল।

ধূমপান ও শুক্রের অস্বাভাবিকতা

ধূমপান যে শুধু ধূমপায়ী ও তার আশেপাশের লোকজনের ক্ষতি করে তা নয়। ধূমপান ধূমপানকারীর ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকেও পংগুত্বের অভিশাপে অভিশপ্ত করতে পারে।

বীর্যের পর্যাপ্ত সুস্থ ও স্বাভাবিক শুক্র স্বাভাবিক ও সুস্থ সন্তান-সন্ততি সৃষ্টির প্রথম মাপকাঠি। গবেষণাগারে লালিত ইঁদুরের অস্বাভাবিক শুক্রর হার মাত্র শতকরা ১—২ ভাগ। কিন্তু ইঁদুরকে অতি সামান্য পরিমাণে এক্সরে রশ্মি দিলেও অস্বাভাবিকতা ভয়ানকভাবে বেড়ে যায়।

সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীদের বীর্যে সুস্থ ও স্বাভাবিক পুরুষের তুলনায় অনেক বেশী অস্বাভাবিক ও ত্রুটি-বিচ্যুতিপূর্ণ শুক্র থাকে। সীসা কারখানার শ্রমিক, রঞ্জন রশ্মি (এক্সরে) দ্বারা চিকিৎসিত ব্যক্তি, রাসায়নিক (chemotherapeutic) দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসিত ক্যান্সার রোগীর বীর্যে বেখাপ্পা আকারের জটিলতাপূর্ণ অস্বাভাবিক শুক্র অধিকতর সংখ্যায় দেখা যায়।

১৯৬৯ সনে জার্মান বৈজ্ঞানিক এম, ভিকজিয়ান বীর্য এবং শুক্রর উপর ধূমপানের

প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক তথ্য উপস্থাপিত করেন। ভিকজিয়ানের তথ্য থেকে জানা যায় যে অধূমপায়ীদের চাইতে ধূমপায়ীদের শুক্রের অস্বাভাবিকত্বের ঘটনা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। তাঁর এই তথ্যের ভিত্তিতে রাসায়নিক প্রকরণাদি দিয়ে ইঁদুরের উপর প্রতিফলিত করে ইঁদুরের শুক্রর উপর ধূমপানের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিশদ পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয় এবং তাতে ভিকজিয়ানের তথ্যেরই সমর্থন পাওয়া যায়।

ভিকজিয়ানের তথ্য অনুসারে ৫০ জন অধূমপায়ীর মধ্যে অস্বাভাবিক শুক্র সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা যখন শতকরা মাত্র ১৯ জন তখন ধূমপানের পরিমাণ ও সময়ের বিভিন্নতাসহ ১২০ জন ধূমপায়ীর মধ্যে অস্বাভাবিক শুক্র সম্পন্ন ব্যক্তির সন্ধান মেলে ২৮% জন। এছাড়া সিগারেট গ্রহণের মাত্রার সাথে শুক্রে অস্বাভাবিকতার সম্পর্ক নির্ণয়মূলক একটি নিরীক্ষাও ভিকজিয়ান পরিচালনা করেন। ভিকজিয়ানের পরিসংখ্যান পুনঃবিশ্লেষণ করলে একটা বিষয় খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে ধূমপায়ীদের শুক্রে অস্বাভাবিকতার পরিমাণ অধূমপায়ীদের তুলনায় উল্লেখযোগ্য ভাবে বেশী। যারা প্রতিদিন একটা থেকে দশটা সিগারেট গ্রহণ করেন এবং যারা প্রতিদিন এগারো থেকে বিশটি সিগারেট গ্রহণ করেন তাদের মধ্যে অস্বাভাবিকতার তেমন তারতম্য দেখা যায় না।

কিন্তু যারা প্রতিদিন একুশটি থেকে ত্রিশটি সিগারেট গ্রহণ করে থাকেন ধূমপায়ীদের মধ্যে তাদের শুক্রাণুতে অস্বাভাবিকতার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেশী।

ভিকজিয়ানের প্রকাশিত তথ্যানুসারে অতিরিক্ত ধূমপানকারীদের ক্রমোজমে অস্বাভাবিকতার হার বেশী পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে ক্রমোজম (Chromosome) বংশপরম্পরিত ধারার সংবাদ ও ব্যক্তির বিশেষত্ব বহন করে থাকে। অধূমপায়ীদের তুলনায় ধূমপায়ীদের প্রান্তিক রক্ত (peripharal blood) শ্বেতকণিকায় সাথী ক্রোমাটিড বিনিময়ের হারও বেশী।

ধূমপায়ীদের প্রস্রাবে ক্যান্সার উৎপাদক মুটাজেনিক জাতীয় ক্ষতিকর উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়। ভগ্ন স্বাস্থ্যের অধূমপায়ী এবং নিঃশ্বাসের সাথে ধোঁয়া ভিতরে গ্রহণ করেন না এমন ধূমপায়ীদের প্রস্রাবেও এমনটি দেখা যায় না। এছাড়াও সিগারেটের ঘনীভূত ধোঁয়া ব্যাকটেরিয়ার ক্যান্সার উৎপাদক এবং গবেষণাগারে মানুষের শ্বেতকণিকায় সাথী ক্রোমোটিড বিনিময়ের (Sister chromatid exchange) হারের প্রবৃদ্ধি হিসেবে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। এসব থেকে উপসংহার টানলে এ বিষয়টিই আরো জোড়ালো হয় যে সিগারেট গ্রহণ করা ক্যান্সার উৎপাদক মুটাজেনিক প্রমোদেরই নামান্তর মাত্র। অবশ্য প্রজনন প্রক্রিয়ার উপর ধূমপানের প্রতিক্রিয়া নিরূপণের গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে মাত্র একটি প্রকাশিত প্রতিবেদন পাওয়া যায় যেখানে ধূমপানের সাথে ধূমপায়ীদের ঔরসজাতের মধ্যে অধিকতর শিশু মৃত্যু এবং জন্মগত অস্বাভাবিকতার হার লক্ষ্য করা গেলেও এখনও সম্পূর্ণ বিষয়টা প্রচ্ছন্নই রয়ে গিয়েছে। এডিনবার্গ জেনারেল হাসপাতালের চারজন বিশেষজ্ঞ

ধূমপায়ীদের বীর্যে অস্বাভাবিক শুক্র সংখ্যাধিক্যতা সম্পর্কিত তথ্যটির সত্যতা প্রমাণের জন্য দু'দল মানুষ (অধূমপায়ী এবং ধূমপায়ী) বেছে নিয়ে নিরীক্ষা শুরু করেন। তাদের গবেষণার বিস্তারিত তথ্যাদি চিকিৎসা জগতের অত্যন্ত খ্যাতনামা পত্রিকা "লেনসেটের" ২১শে মার্চ, ১৯৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিলের ইভান্স ও ফ্লেচার, এবং ওয়েস্টার্ন জেনারেল হাসপাতালের প্রজনন বিষয়ক শল্য বিশেষজ্ঞ টরেনস ও হারগ্রীভ প্রাথমিক পরীক্ষার জন্য একটি সাব ফার্টালিটি ক্লিনিক সমবেত পুরুষদের শুক্রের নমুনা সংগ্রহ করেন। ধূমপানের অভ্যাস, মদাসক্তি, পেশা, ওষুধের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃত প্রশ্নমালা তৈরী হয়েছিল এবং নিরীক্ষার জন্য ধূমপায়ী এবং অধূমপায়ীদের নিয়ে দুটি পক্ষ গঠন করা হয়। শুক্রের উপর অন্যভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে এমন সম্ভাবনার লোকদের (যেমন যাদের মদাসক্তি আছে, রঞ্জন রশ্মির বা বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যের দ্বারা চিকিৎসা নিয়েছেন, কোন রকমের অপারেশনের সম্মুখীন হয়েছে অথবা সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য হরমোন চিকিৎসা বা ওষুধপত্র গ্রহণ করেছেন) বাদ দেয়া হয়। সবশেষে প্রত্যেক দলে ৪৩ জন করে লোককে বাছাই করা হয়।

বিশ্লেষণের জন্য ধূমপায়ী এবং অধূমপায়ী উভয় দলের মধ্যে শুক্রের ঘনত্ব অনুসারে বিভিন্ন গ্রুপ করা হয় অর্থাৎ (২০ × ১০৬/ মিলিলিটার, (২০ – ৪০) × ১০৬/মিলিলিটার, (৩০ – ৬০) × ১০৬/মিলিলিটার এবং ৬০ × ১০৬/মিলিলিটার (এম এল) শুক্রের ঘনত্বের উপরও অনেক সময় গঠন প্রকৃতির অস্বাভাবিকতা নির্ভর করে। তাই ধূমপায়ী এবং অধূমপায়ীদের মধ্যে এরকমের বিভাজনের আশ্রয় নেয়া হয়েছিল। যকৃতের অস্বাভাবিকতা, ভাইরাসজনিত অসুস্থতায় বা এ্যালার্জী ইত্যাদির কারণে শুক্রের ঘনত্বের রকমফের ঘটতে পারে এবং পরিণতিতে শুক্রের অগ্রভাগে চোখে পড়ার মতো পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। যাদের স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছেন বা যারা ইতিপূর্বে পিতা হয়েছেন তাদেরকেও সমভাবে ধূমপায়ী বা অধূমপায়ী দলে ভাগ করে দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি শুক্র ঘনত্বের গ্রুপে ধূমপায়ী এবং অধূমপায়ী সমসংখ্যক সক্ষম পুরুষ রাখা হয়।

পরীক্ষার জন্য বিশুদ্ধ বীর্যের এক ফোঁটা স্লাইডের উপর ঢালা হয়, পাপানিকোলাই প্রক্রিয়ার (Papnicolaou technique) স্লাইডে বিধিবদ্ধ করা হয়, দাগ কাটা হয়। প্রতিটি স্লাইডের ১০০টি শুক্রকণিকার গঠন প্রকৃতির স্বাভাবিকতা /অস্বাভাবিকতা নির্ণয় করা হয়। অস্বাভাবিকগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যেমন ঃ বড়, ছোট, তেরছা, মোটা, বহুমাথা, বহু বা অস্বাভাবিক লেজ, অস্বাভাবিক মধ্যভাগ, অপরিণত অবস্থা, অবয়বহীন, কোষ বিম্বকিত (Vacuolated) বা অতিস্বল্প কোষপ্রাণ সম্বলিত (Cytoplasmic droplets)।

বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৪৩ জন অধূমপায়ীর ক্ষেত্রে স্বাভাবিক শুক্রের পরিমাণ যেখানে ৫৭.৭ + ১.২৮% সেখানে ধূমপায়ীদের স্বাভাবিক শুক্রের পরিমাণ ৫২.৯ + ১.৪৭% ; এ থেকে ১% ভাগ ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট পার্থক্যের ইংগিত পাওয়া যায়। ধূমপায়ী ও অধূমপায়ীদের এককভাবে বিশ্লেষণ করলেও একই ধরনের পার্থক্য ধরা পড়ে। ২৩

জন অধূমপায়ীর শুক্র গণনার ফলাফল যখন ৬০ × ১০⁶/এম এল—৫৯.৭ + ১'৩৮% সেখানে সমসংখ্যক ধূমপায়ীদের শুক্র গণনার ফল দাঁড়ায় ৫৩' ৮ + ১'৭৮; অর্থাৎ পুনরায় শতকরা ১% ভাগ, পার্থক্যের সুস্পষ্ট হিসাবের পক্ষেই রায় পাওয়া যায়। ধূমপায়ী বনাম অধূমপায়ীদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ সংশ্লিষ্ট চিত্রে আরেক-ভাবে দেখানো হয়েছে। এখানে ধূমপায়ী এবং অধূমপায়ীদের শুক্রের স্বাভাবিকত্ব ৩৬% থেকে ৭৫% শতাংশের সাতটি বিভিন্ন গ্রুপে তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানেও দু'দলের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে।

প্রতিদিন সিগারেট গ্রহণের পরিমাপের সাথে শুক্রর স্বাভাবিকত্বতের পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। দেখা গেছে সিগারেট গ্রহণের মাত্রাগত পার্থক্যের সাথে শুক্রের স্বাভাবিকত্বের সম্পর্ক তেমন ভাবে ফুটে না উঠলেও প্রতিদিন ১৫টি, ২০টি বা ৩০টি সিগারেট গ্রহণকারীর সাথে অধূমপায়ীদের পার্থক্য বেশ স্পষ্ট।

এডিনবার্গের ওয়েস্টার্ন জেনারেল হাসপাতালের চারজন বিজ্ঞানী সর্বশেষে যে গবেষণা করেছেন সেখানে এটা খুবই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে যে ধূমপায়ীদের মধ্যে শুক্র অস্বাভাবিকত্বের ঘটনা যথেষ্ট বেশী। তবে তাঁরা তাদের তথ্য থেকে সিগারেট গ্রহণের মাত্রার সাথে শুক্র অস্বাভাবিকতার হ্রাসবৃদ্ধি অর্থাৎ কম সিগারেট গ্রহণ করলে অস্বাভাবিকতা কম হবে কিনা অথবা বেশী গ্রহণ করলে বেশী হবে এ ধরনের কোন সম্পর্ক দেখাতে পারেননি। তবে এমন কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে যা থেকে নিশ্চিত ভাবে বলা যায় সিগারেট গ্রহণের প্রাত্যহিক অভ্যাস এবং এ ধরনের সাথে প্রান্তিক রক্ত শ্বেতকণিকার ক্রমোজম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার একটা সম্পর্ক আছে। যারা অতিরিক্ত ধূমপান করেন এবং অতিরিক্ত 'টার' যুক্ত অপরিশোধিত (Unfiltered) সিগারেট গ্রহণ করেন, তাদের মধ্যেই ক্রমোজম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঘটনা বেশী থাকে।

এটা ঠিক যে, বিষয়টি সম্পর্কে আরো ব্যাপক গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। তবে এখন পর্যন্ত আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি তার উপর নির্ভর করে বলা চলে যে ধূমপানের সাথে শুক্রাণু গঠনের অস্বাভাবিকতার সম্পর্ক খুবই স্পষ্ট। শুক্রাণুর অস্বাভাবিকতা ও প্রজনন প্রক্রিয়ার যে কোন অশুভ প্রভাব প্রতিফলিত করতে পারে। ধূমপানের কারণে, আপনি না চাইলেও একটি পংগু শিশুর পিতা বা মাতা হয়ে যেতে পারেন। অতএব, সাবধান।

তথ্যসূত্র ঃ

১। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা ১৯৭১ সংস্করণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

২। বৃটিশ মেডিকেল জার্নাল, লণ্ডন ৪ঠা জুলাই, ১৯৮১।

৩। ধূমপানে বিপদ ঃ ধূমপান পরিত্যাগে মঙ্গল, আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি, নিউইয়র্ক, ১৯৭২।

৪। তামাক ও তৃতীয় বিশ্ব আগামীর মহামারী—মাইক মুলার, ওয়ার অন ওয়াণ্ট প্রকাশন, লণ্ডন, ১৯৭৮।

৫। দি লেনসেট, লণ্ডন ২১শে মার্চ ১৯৮১।

টনিকের অপর নাম মদ

বিশেষ প্রতিবেদক

ডাঃ মার্টিন সোয়েইজার তাঁর বাংগালী সহকর্মী

সাধারণত তিনি কথা বলেন আস্তে আস্তে, বিনয়ের সংগে, উত্তেজিত হতে তাঁর সহকর্মীরা কখনো তাঁকে দেখেন নি। পেশায় ডাক্তার, লণ্ডন থেকে পাশ করেছেন এবং প্রশিক্ষণ নিয়েছেন নিজ দেশ বৃটেনের বিভিন্ন হাসপাতালে। রংপুর দিনাজপুর পুনর্বাসন সংস্থার (আর. ডি. আর. এস.) অধিকর্তা হিসেবে বাংলাদেশে ছিলেন অনেক দিন। নতুন দায়িত্ব নিয়ে সম্প্রতি বৃটেনে ফিরে গেছেন। বিনয়ী ডাঃ মার্টিন সোয়েইজারকে সেদিন দেখা গেলো অবিনয়ী, কঠোর হয়ে উঠতে। বাংলাদেশে বহুজাতিক (মালটিনেশনাল) কোম্পানীগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি তাদের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন—অপ্রয়োজনীয় ওষুধ এদেশে কোম্পানীগুলো অবাধে চালাচ্ছে; আকাশচুম্বী মুনাফাতো লুটছেই, তা নিয়ে তর্ক বৃথা—ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা ডাক্তারদের সঠিকভাবে না জানিয়ে, ওষুধের খারাপ দিক লুকিয়ে রেখে ঐসব বহুজাতিক কোম্পানীগুলো এদেশে যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াচ্ছে।

ডাঃ মার্টিন সোয়েইজার রংপুর-দিনাজপুর, পুনর্বাসন সংস্থা স্বাস্থ্য প্রকল্পের জন্যে দেশ ও বিদেশে অত্যন্ত সুপরিচিত। বিদেশী বলে নয়, বরঞ্চ ভাল ডাক্তার হিসেবে তাঁর মতামতের অপরিসীম মূল্য আছে বলে এক বিদেশী সাংবাদিক তাঁকে বাংলাদেশের ওষুধের বাজার সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। সম্প্রতি বিদেশে বহুজাতিক ফার্মাসিউটিকেল কোম্পানীগুলো তৃতীয় বিশ্বে যেভাবে বাজে ও ক্ষতিকর ওষুধ বিক্রী করে মুনাফা লুটছে তা নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হচ্ছে। সে সবের সত্যতা যাচাই এবং এ বিষয়ের উপর ডকুমেণ্টারী ছবি করার জন্যে একজন বিদেশী সাংবাদিক এসেছিলেন ঢাকায়। 'টনিক' নামে এক ধরনের ওষুধের কথা উঠতেই ডাঃ সোয়েইজার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন "এদেশের ধর্মভীরু নিরীহ মানুষের ধর্মবিশ্বাসের তোয়াক্কা না করে, তাদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে, মিথ্যা কথা বলে, ওষুধ সম্পর্কে ভুল তথ্য পরিবেশন করে, কোম্পানীগুলো এদেশের মানুষকে 'টনিক'-এর নামে মদ খাওয়াচ্ছে। ইসলাম ধর্মে মদ নিষিদ্ধ—অথচ 'টনিক' বা বলবর্ধক এলিক্সির নামে সেই মদই খাওয়ানো হচ্ছে বাংলাদেশে।"

কি করে এই 'টনিক' নামের মদ একটি জীবনকে ধ্বংস করে দিতে পারে তার উদাহরণ দিলেন ডাঃ সোয়েইজার তাঁর প্রকল্পের এক বেদনাজনক অভিজ্ঞতা থেকে। তাঁর স্বাস্থ্য প্রকল্পের অত্যন্ত দায়িত্বশীল পদে থানা স্বাস্থ্য প্রধান ছিলেন একজন তরুণ স্বাস্থ্যবান মেধাবী যুবক। ভাল কর্মী, কাজে অত্যন্ত মনযোগী ও কর্মঠ। অথচ এক সময় দেখা গেলো তাঁর কাজের দক্ষতা কমে আসছে, সহকর্মীদের সংগে ব্যবহার ক্রমশ অশালীন হয়ে উঠছে, সেই আগের কর্মতৎপর দায়িত্ববান কর্মী ক্রমশঃ এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছালো যাতে তাকে দিয়ে আর যাই হোক প্রকল্পের থানা স্বাস্থ্য প্রধানের দায়িত্বে রাখা চলে না।

থানা স্বাস্থ্য প্রধানের অতীতের কর্মদক্ষতা এবং সততার জন্যে ডাঃ সোয়েইজারের বিশেষ দুর্বলতা থাকায় এ ব্যাপারে তিনি খোঁজ-খবর নিতে শুরু করলেন। জানা গেল কিছুদিন আগে শারীরিক দুর্বলতা ও অবসাদের জন্যে স্থানীয় এক ডাক্তারের পরামর্শে উক্ত যুবক স্কুইব কোম্পানীর ভিটামিন এলিক্সির 'ভারডিভিটন' খাওয়া শুরু করেছিলেন। 'ভারভিডটনে' মদের পরিমাণ শতকরা ১৭.৫ ভাগ, সবচেয়ে কড়া ওয়াইনে মদের পরিমাণ থাকে বড়জোর শতকরা ১৬ ভাগ। 'টনিক' নামের এই মদ খেলে মদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ভালো লাগে, আরো খেতে ইচ্ছে হয় ক্রমে মদাসক্তি জন্মে। থানা প্রধানেরও তাই হয়েছে। ক্রমশঃ মদের প্রতি নির্ভরশীলতা বেড়েছে। কাজের সময়ও তাকে 'ভারডিভিটন' খেতে হতো। এই ক্রমিক মদাসক্তির ফলে তার কাজের কর্মদক্ষতার ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। ডাঃ মার্টিন সোয়েইজার তাকে এই মদাসক্তি ছাড়িয়ে আনতে চেষ্টা করেন। তাঁর চেষ্টা সফল হয়নি। উল্লেখযোগ্য যে, ই আর স্কুইব এণ্ড সন্স একটি আমেরিকান কোম্পানী। ১৯৬৭ সনে তৎকালীন সরকারকে জীবনরক্ষাকারী ওষুধ স্ট্রেপটোমাইসিন কারখানা স্থাপন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এ দেশে স্কুইব ওষুধ বিক্রি শুরু করে। গত বছর স্কুইবের মোট বিক্রির পরিমাণ সাত কোটি ষাট লক্ষ টাকা। উল্লেখযোগ্য যে, স্কুইবের মদ সর্বস্ব আরেকটি ওষুধের নাম 'রুব্রাটন এলিক্সির'। এই দুটো টনিক বিক্রি করে স্কুইব বছরে কয়েক কোটি টাকা আয় করে। স্বাধীনতা উত্তরকালে স্কুইব বাংলাদেশ সরকারের সাথে যৌথ মালিকানায় চুক্তিবদ্ধ হয়। বাংলাদেশের মালিকানার অংশ চল্লিশ ভাগ আর স্কুইবের ষাট ভাগ। অথচ ওষুধের প্রকৃতি, বাজারজাতকরণ পদ্ধতি অর্থাৎ নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের কোন অধিকার নেই। শুধু স্কুইব নয়, আই সি আই, মে এণ্ড বেকার (বি পি আই) প্রভৃতি বহুজাতিক কোম্পানীগুলোও একইভাবে যৌথ মালিকানায় ব্যবসা করছে। এদেশের টাকা দিয়ে এদেশের মানুষকে প্রতারণা ও শোষণের এমন নোংরা দৃষ্টান্ত আর কোথাও নেই। উল্লেখযোগ্য যে, স্কুইব আমেরিকায় 'ভারডিভিটন' বা 'রুব্রাটন' তৈরি করে না। কারণ আমেরিকার ওষুধ নাম করে মদ খাওয়ানো নিষিদ্ধ। লক্ষণীয় যে, যেসব ওষুধ স্কুইবের সত্যকারের ওষুধ সেগুলোর মোড়ক ভিন্ন। তার রং থাকে হলুদ, অথচ এইসব ফক্করের ওষুধের মোড়ক অত্যন্ত রং-চঙে। 'ভারডিভিটনের' মোড়ক লাল আর সবুজে করা করা হয়েছে। 'রুব্রাটন' কমলা আর মেরুনের মিশ্রণ।

বাংলাদেশে টনিক নামক মদের বাজার দু'রকম। এক, বাংলা মদ—যাকে মৃত-সঞ্জীবনী, মৃতসঞ্জীবনী সুরা বা মৃতসঞ্জীবনী সুধা নামে আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়গুলো চালায়। সম্প্রতি এদের সংগে ওষুধের কারখানার সাইন বোর্ড টানিয়ে নির্ভেজাল বাংলা চোলাই মদের বেশ কিছু কারবারী যুক্ত হয়েছেন। এ বাজারে মোট বিক্রীর সঠিক অংক আমাদের এখনো অজানা। দুই 'টনিক নামক মদের বাজার—বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানীগুলো যে বাজার জাঁকিয়ে বসে আছে। সরকারী সাপ্তাহিক বিচিত্রা (৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭) এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে, 'জীবন-রক্ষাকারী ওষুধের চাইতে ভিটামিন, এনজাইম ও অন্যান্য অপ্রোজনীয় ওষুধের পরিমাণ বাংলাদেশে শতকরা নব্বুই ভাগ'। অপ্রয়োজনীয় ওষুধ বলতে বিচিত্রা সেসব ওষুধও হিসাবে ধরেছে ডাক্তারী মতে যেগুলোর কোন কার্যকারিতা নেই। ভিটামিন, টনিক এবং এনজাই-মের বাজারকে যদি আমরা আলাদা করে ধরি তাহলে তার পরিমাণ শতকরা পঞ্চাশ থেকে ষাট ভাগ হবে বলে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর বিপণন বিভাগের ধারণা। এর মধ্যে ২০ থেকে ৩০ ভাগ হচ্ছে মদসর্বস্ব ওষুধ। আমরা গণস্বাস্থ্যের পক্ষ থেকে কমপক্ষে শতকরা বারো ভাগ মদ আছে এমন ওষুধের একটা প্রাথমিক জরিপ করেছি। তাতে দেখা গেছে মোট ওষুধের বাজারের কমপক্ষে দশ ভাগই হচ্ছে মদসর্বস্ব ওষুধ। এর মধ্যে আয়ুর্বেদীয় কোম্পানীগুলোর মৃতসঞ্জীবনী জাতীয় বাংলা মদ ধরা হয়নি। ওষুধের বাজার সম্পর্কে যারা বিশেষজ্ঞ তাদের অনেকেরই ধারণা যে 'টনিক' নামক মদের বাজার দশ ভাগের চেয়েও অনেক বেশী, ত্রিশ ভাগের কম হবে না। বাংলাদেশে ওষুধের বাজারের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ এর মধ্যে দশ থেকে ত্রিশ কোটি টাকার বাজারই হচ্ছে 'টনিক', এলিকসির বা এই জাতীয় মদের।

বিদেশীদের সংগে সংগে অনেক দেশী কোম্পানীও 'টনিক' বিক্রি করে। এমনকি বাংলাদেশ সরকারের মালিকানাধীন আলবার্ট ডেভিডও একটি টনিক বের করে। নাম 'টোনাম' এর মধ্যে কুচিলা ফল ও গাছের স্নায়ু উত্তেজক বিষাক্ত উপাদান ষ্ট্রিকনিন রয়েছে। যার জন্যে আলবার্ট ডেভিডকে আবার বোতলের গায়ে 'বিষ' কথাটা লাল রঙে লিখে দিতে হয়েছে। অন্যদিকে দেশী ব্যক্তিগত মালিকাধীন কোম্পানী কে, ডি, এইচ, এর নিউ রোনায় ষ্ট্রিকনিন থাকা সত্ত্বেও কোন সাবধান বাণী নেই। তবে কে. ডি. এইচ তুলনামূলক ভাবে বিদেশী কোম্পানীগুলোর চেয়ে সৎ। নিউরোনার গায়ে স্পষ্ট করে লেখা আছে যে এ হচ্ছে 'টনিক ওয়াইন'; কে ডি এইচ ওয়াইন' কথাটাকে লিখে জানিয়েই বিক্রী করতে চায়, ফলে এ কোম্পানীকে প্রতারণার দায়ে বোধ হয় অভিযুক্ত করা যায় না।

'টনিক'-এ মদ ছাড়া কি কিছু নেই?

উত্তর হচ্ছে 'না, নেই'। কিন্তু বোতলের গায়ে কোম্পানীগুলো অনেক উপাদানের নামই লিখে রাখে। সেদিক থেকে বললে, উত্তর হচ্ছে 'আছে'। কিন্তু যে কারণে

টনিকে কি কি থাকে

	মদ	ফসফরাস যুক্ত উপাদান			বি-ভিটামিন				স্নায়ু উত্তেজক		খনিজ উপাদান	
		গ্লিসারো ফসফেট	ফসফরিক এসিড	হাইড্রোজেন ফসফেট	বি—১	বি—২	বি—৬	বি—১২	ষ্ট্রিকনিন	ক্যাফিন	লোহা	কোবাল্ট
ভারডিভিটন	+	+			+	+	+	+				
টোনাম	+	+						+	+	+	+	+
বি. জি. ফস	+	+			+	+	+	+				
পলিটামিন	+		+	+	+	+	+	+		+		
নিউরোনা								+	+			

এসবকে 'টনিক' বা বলবর্ধক বলে চালানো হচ্ছে তার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। উপাদানগুলো মদের বোতলের লেবেলে লেখা এক ধরনের প্রতারণা বই কিছুই নয়। বাজারে চালু টনিকগুলো কি উপাদানে তৈরী এবং বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা কি বলে আমরা পাঠকদের জ্ঞাতার্থে যুক্ত করে দিচ্ছি, যাতে করে পাঠকরা কোম্পানীগুলো কি ভাবে প্রতারণা করছে তা বুঝতে পারেন।

১. মদ—মদের ডাক্তারী নাম ইথানল বা ইথাইল এলকহল। ওষুধ শাস্ত্রমতে একে সিডেটিভ হিপনোটিক (Sedative Hypnotic) বলা হয়। যার অর্থ হচ্ছে, এ উপাদানটি মস্তিষ্ককে থিতিয়ে আচ্ছন্নতার ভাব নিয়ে আসে, উত্তেজনা নয়। উত্তেজনা কমানোই মদের কাজ। কোম্পানীগুলো মদকে উত্তেজক ও কর্মোদ্দীপক বলে দাবী করে। এ প্রসঙ্গে ডাক্তারী শাস্ত্র বলে—"The excitement or uninhibited behavior that occurs after the use of alcohol is a manifestation of depression, not stimulation. This distinction between the manifest behavioral change and the underlying pharmacologic mechanism must always be made, specially since alcohol is still often called a stimulant.—Review of Medical Pharmacology by F. H. Meyers, E. Jawetz, A. Goldfien. P. 246, 6th Ed. 1978 Lange Publications USA.

'এলকহল (মদ) খাবার পরে যে উত্তেজনা ও অসংযত আচরণ পরিলক্ষিত হয় তা মানসিক নির্জীবতার লক্ষণ, উত্তেজনার নয়। বাইরের আচরণ আর শরীরের ভিতর ওষুধজনিত ক্রিয়ার এই তফাতটা সব সময় অবশ্যই মনে রাখা দরকার, বিশেষত, যখন এলকহলকে এখনো প্রায়ই উত্তেজক বলে মনে করা হয়।'

২. গ্লিসারোফসফেট—এ সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে ফসফরাস থাকার ফলে তা মস্তিষ্ক কোষে সহজে সংযোজিত হতে পারে। এই সংযোজনের ফলে নাকি মানুষের মাথায় বুদ্ধি খোলে। এ কারণেই গ্লিসারোফসফেটকে 'টনিক' হিসেবে অনেক আগে থেকে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু এ যুক্তির কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। ডাক্তার, ফার্মাসিস্ট ও চিকিৎসা শাস্ত্রের সংগে যাঁরা জড়িত তাঁরা—Martindale—The Extra Pharmacopeia-কে ওষুধ সম্পর্কে চূড়ান্ত অথরিটি হিসেবে মনে করেন। এই ভিত্তিহীনতা সম্পর্কে Martindale বলেছে—

"The Glycerophosphates and Glycerophosphoric acid were introduced into medicine on the grounds that lecithin contains phosphorous in the from of Glycerophosphate radical and these compounds would be more easily assimilated by the tissue, particularly by the brain. There is no evidence to support the assumption"......

Martindale, The Extra Pharmacopoeia, 27th Edition. The Pharmaceutical press 1978 Publications of the Pharmaceutical Society of Great Britain.

"লেসিথিনের মধ্যে গ্লিসারোফসফেট রূপে ফসফরাস আছে বলে ওষুধ হিসেবে গ্লিসারোফসফেট ও ফসফরিক এসিডের প্রচলন শুরু হয়েছে এই ধারণা থেকে যে এই

উপাদানগুলো সহজে টিস্যুগুলোতে সংযোজিত হতে পারে—বিশেষতঃ মস্তিষ্কে। এই ধারণা সমর্থন করার মত কোন প্রমাণ নেই।"

৩. ভিটামিন—আমাদের দেশে দুর্বলতা, অবসাদ ও স্বাস্থ্যহীনতার অন্যতম কারণ হচ্ছে সঠিক পুষ্টির অভাব। পুষ্টিকর খাদ্য না খেতে দিয়ে এদেশের সাধারণ মানুষের স্বল্প আয়ের একটা বড় অংশকে ভিটামিন কিনতে বলা নিষ্ঠুরতা ছাড়া কিছুই নয়। ভিটামিন পুষ্টিকর খাদ্যের ভূমিকা পালন করতে পারে না, অর্থাৎ খাওয়া ও পুষ্টির যত্ন না নিয়ে 'টনিক' খেলে বড় জোর মাতলামি করা যেতে পারে কিন্তু শরীরের ওজন বা বল কিছুই বাড়বে না। কিছু কিছু ভিটামিন যেমন সায়ানোকোবালোমিন (ভিটামিন বি—১২) খেলেও তা পুরো হজম হবার আগেই নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ এটা খাওয়া আর না খাওয়া সমান, অবশ্য অনেক কোম্পানী লেবেলে লিখলেও এ ভিটামিন আদৌ টনিকে যোগ করে না।

৪. লোহা ও অন্যান্য খনিজ উপাদান—রক্তশূন্যতার জন্যে লোহা (আয়রণ টেবলেট) সরাসরি খাওয়াই নিয়ম। 'টনিক' থেকে মদ ও লোহা একসঙ্গে খেলে পাকস্থলী ক্ষতি হবার সম্ভাবনা বেশী। এমনকি তা জটিলাকারও ধারণ করতে পারে। আমাদের দেশে যেখানে অধিকাংশেরই অন্ত্রনালীতে ঘা, প্রদাহ বা এই ধরণের জটিলতা রয়েছে সেখানে লোহা ও মদ একসঙ্গে খাওয়া বিষতুল্য।

৫. স্ট্রিকনিন—স্নায়ু-উত্তেজক বিষ স্ট্রিকনিন তো আজকাল ইঁদুর মারার জন্যেই ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশেষজ্ঞ কমিটি স্ট্রিকনিন সম্পর্কে বলছে —It was recommended that strychnine should only be used as rodenticide by trained pest control operators in areas to which access by unauthorised persons and useful animals could be prevented completely.' (Safe use of pesticides. Twentieth Report of the WHO Expert Committee on Insecticide Technical Report series No. 513 1973. World Health Organisation.

"শুধুমাত্র ঐসব এলাকায় যেখানে অননুমোদিত ব্যক্তি এবং উপকারী জন্তুর প্রবেশ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে কেবল সেখানেই শধু ইঁদুরজাতীয় প্রাণী মারার জন্যে অভিজ্ঞ পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণকারীর তত্ত্বাবধানে স্ট্রিকনিন ব্যবহার করা যেতে পারে।"

জন্তু জানোয়ারে স্ট্রিকনিন প্রয়োগে অত্যাধিক নিষ্ঠুরতা বলে ইংলণ্ডে স্ট্রিকনিন দিয়ে প্রাণী হত্যা আইনত নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। এ আইন The Animals (cruel poisons) Regulations Acts 1963 হিসেবে পরিচিত।

কিছু কিছু কোম্পানী বাংলাদেশের মানুষকে জন্তু-জানোয়ার বলেও গণ্য করে না।

বিভিন্ন টনিকে মদের শতকরা পরিমাণ ও দাম

টনিকের নাম	কোম্পানী	তরল পদার্থের আয়তন ধরে হিসেব করলে একশ ভাগ টনিকে যে পরিমাণ মদ থাকে	মদকে প্রুফ স্পিরিটের হিসেবে প্রকাশ করলে একশ ভাগ টনিকে মদের পরিমাণ	বোতলের গায়ে কোম্পানীর হিসেব-মতো মদের পরিমাণ	পরিমাণ ও দাম
পলিটামিন	হোয়েকস্ট (জার্মানী)	২৭ ভাগ	৪৮ ভাগ প্রুফ	৫ মিলিলিটারে ৯০%* বিশুদ্ধ মদের পরিমাণ ১'১১ গ্রাম	২০০ মিঃ লিঃ ১৮ টাকা
ভারীডিভিটন	স্কুইব (আমেরিকা)	১৭'৫ ভাগ	৩০'৬ ভাগ প্রুফ	১৭'৫ ভাগ	২২৮ লিঃ লিঃ ১৩ টাকা ৯০ প.
রুবাটন	স্কুইব (আমেমিকা)	১২ ভাগ	২১'০ ভাগ প্রুফ	১২ ভাগ	১১৪ মিঃ লিঃ ১০ টা. ২৫ প.
বি-জি ফস	এম. এস. ডি (আমেরিকা)	১৭ ভাগ	২৯'৭৫ ভাগ প্রুফ	১৭ ভাগ (২৯'৭৫% প্রুফ স্পিরিটের সমতুল্য)	২০০ মিঃ লিঃ ৪০ টাকা
নিউরোনা	কে. ডি. এইচ (বাংলাদেশী)	২১ ভাগ	৩৬'৭ ভাগ প্রুফ	ত্রিশ মিলিমিটারে মদের পরিমাণ ৬'৬ মিলিলিটার	৪৮০ মিঃ লিঃ ৪৫ টা. ৪৬ প.
টোনাম	আলবার্ট ডেভিড (বাংলাদেশী)	২১'৮ ভাগ	৩৮'১ ভাগ প্রুফ	১০০ মিলিলিটারে ১৫ গ্রাম	২২৮ মিঃ লিঃ ১১ টা. ৫০প.

* লক্ষ্যণীয় যে হোয়েকস্ট কোম্পানীর টনিক পলিটামিনে মদের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী অথচ এই অত্যধিক মদ যেন চোখে না পড়ে তার জন্য লেবেলে মদের হিসাব বেশী জটিল করে দেখানো হয়েছে, যেন সাধারণ মানুষ বুঝতে না পারে।

টনিক বোতলের গায়ে বা মোড়কে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে কোন সাবধান বাণী নেই। অন্য কোন ওষুধের সংগে একত্রে খেলে যে খারাপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে তারও কোন ইংগিত নেই। যে সব ওষুধে অন্ত্রনালীতে ঘা ও রক্তক্ষরণের সম্ভবনা থাকে, মদ সে সম্ভবনাকে আরো বাড়িয়ে তোলে।

সামাজিক দিক

কোন্ শ্রেণীর লোক 'টনিক' জাতীয় ওষুধ সবচেয়ে বেশী ব্যবহার করেন? বড়লোকেরা নন, কারণ তারা খাদ্যাভাবে কষ্ট পান না। ফলে পুষ্টিহীনতা; অবসাদ খেটে খাওয়া শরীরের দুর্বলতায় তারা ভোগেন না। তাছাড়া সরল মানুষের মতো ধর্মবিশ্বাসের কারণে মদের প্রতি বড়লোকদের অনীহাও নেই। ফুর্তি ও মেজাজ ঠিক রাখতে হলে তারা সরাসরি মদই খান, 'টনিক' নয়। ফলে তাদেরকে প্রতারিত করা কঠিন। প্রতারিত হয় খেটে খাওয়া মানুষের দল। শক্তি সঞ্চারের জন্যে, অবসাদ থেকে মুক্তির জন্যে তাঁদের এসব খেতে হয়। কারণ তারা জানে আগামীকাল তাকে কাজের ধান্ধায় কারখানায় যেতে হবে। একথা সত্যি, 'টনিকের' তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া তার কাছে ভালো লাগে। কোম্পানীগুলোর অনেক প্রতিনিধিই 'যৌন নিষ্ক্রিয়তার জন্যে মহোপকারী ওষুধ' বলে 'টনিকের' প্রচার চালায়। এ ধরনের ওষুধের প্রতি এদেশের সাধারণ মানুষের একটা দুর্বলতা আছে। তারা কেনে, কিনে ঠকেন কিন্তু ঠকেও শেখেন না, আবার কেনেন। স্কুল, কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যেও টনিক জনপ্রিয়।

আমরা পোস্তগোলা ও আদমজী এলাকার শ্রমিকদের মধ্যে এক জরিপ চালিয়ে দেখেছি, শতকরা তিরিশ জন শ্রমিক যাদের বেতন ৭০০ টাকার নীচে তাঁরা নিয়মিত 'পলিটামিন,' 'ভারডিভিটন,' 'বি-জি ফস' বা এই জাতীয় 'টনিক' সেবন করেন। অনিয়মিত বারা-সেবন করেন তাদের ধরলে শতকরা পঞ্চাশজন শ্রমিকই এই 'টনিক' ব্যবহার করেন। আর্থ-সামাজিক দিক থেকে এ পরিসংখ্যান অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। বেতনের দশ থেকে পনেরো ভাগ তাঁরা এই 'টনিক' কিনতে ব্যয় করেন। এদের অধিকাংশই 'পলিটামিন'ই বেশী খান। 'টনিক' ব্যবহার শুরু করার ইতিহাস প্রত্যেকের প্রায় একই রকম। কারখানার ডাক্তারের কাছে কোনদিন যদি তাঁরা অবসাদ, ক্লান্তি ও ক্ষুধামন্দোর অভিযোগ করেন তবে প্রায় ক্ষেত্রেই ডাক্তার তাঁদের পুষ্টিকর খাবার ও প্রয়োজনীয় বিশ্রামের উপদেশ না দিয়ে 'টনিক' খাবার জন্যে পরামর্শ দেন। খেলে মদের প্রতিক্রিয়ার জন্যে ভালো লাগে, পরে একটা আসক্তি জন্মে এবং ক্রমে টনিক খাওয়া একটা অভ্যাসে পরিণত হয়। পরবর্তীতে 'টনিক' কেনার জন্যে তাঁরা আর ডাক্তারের পরামর্শ নেন না। একজন শ্রমিক তাঁর শ্রম বিক্রী করে বেঁচে থাকেন। তাঁর শ্রমের যে মূল্য তাঁকে দেয়া হয় তা দিয়ে সাত দিনের যে শ্রমশক্তি তিনি ব্যয় করেন তা পুনরুদ্ধারের জন্যে যে পুষ্টিকর খাদ্য তাঁর খাওয়া দরকার তা তার প্রাপ্ত মজুরী দিয়ে কেনার সামর্থ থাকে না। অথচ এ মজুরীরই একাংশ তিনি

খাদ্যদ্রব্য না কিনে 'টনিকে' জন্যে ব্যয় করেন। ফলে ক্রমাগত পুষ্টির অভাবে তাঁর স্বাস্থ্যের আরো অবনতি হতে থাকে।

কোন্ টনিক বেশী চলে

পলিটামিন সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়। এর প্রধান কারণ পলিটামিনে মদের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। একটি জার্মান বহুজাতিক কোম্পানী হোয়েকস্ট এ টনিক নামক মদটি বিক্রী করে। হোয়েকস্ট এদেশে ব্যবসা শুরু করেছিলো মাত্র পনের লাখ টাকা দিয়ে। বর্তমানে এর বিক্রী বছরে সাত কোটি টাকা। এই মদ 'পলিটামিন' আর একটি নিষিদ্ধ ওষুধ 'নোভালজিন' হোয়েকস্টের মোট বিক্রয়ের সিংহভাগ আয় করে। এর পর স্কুইবের 'ভারডিভিটন'; তিন নম্বরে আছে মার্ক সার্প এণ্ড ডোমের 'বি. জি. ফস,'। 'বি. জি. ফস, বাংলাদেশে তৈরী হয় না, বিদেশে থেকে আমদানী হয়ে আসে। মার্ক শার্প এণ্ড ডোম মেসার্স এলকো ফার্মাসিউটিকেল লিমিটেডের সংগে একত্রে বাংলাদেশে কারখানা ও ব্যবসা করার কথা। 'বি. জি. ফসে'র জনপ্রিয়তা ও বাজারের জন্যেই মার্ক শার্প এণ্ড ডোম এদেশে ব্যবসা করার জন্যে উৎসাহী। এই কোম্পানীর অন্যান্য ওষুধের তেমন বাজার বাংলাদেশে নেই।

মদসর্বস্ব 'টনিক' উৎপাদন ও বিক্রী বন্ধ করে দিলে অনেক কোম্পানীই এদেশ থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নিয়ে চলে যাবে। কারণ মদ বিক্রী করা মুনাফার টাকার লোভেই এদের অনেকে এদেশে ব্যবসা করছে। বাংলাদেশ সরকারের এমন কোন আইন নেই যা প্রয়োগ করে এসব মদ বিক্রী বন্ধ করা যায়। তবে সম্প্রতি বড়লোকদের স্কুল কলেজ পড়ুয়া ছেলেমেয়েরা 'টনিক' খেয়ে মাতলামি করে বলে সরকারের ওষুধ সংক্রান্ত উপদেষ্টা বোর্ড কোন ওষুধে শতকরা দশভাগের বেশী মদ থাকা উচিত নয় বলে সরকারের কাছে সুপারিশ করেছেন। মদসর্বস্ব টনিক আর নিষিদ্ধ ও ক্ষতিকর ওষুধের ব্যবহার নিরীহ গরীব মানুষদের মধ্যেই বেশী। তারাই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে দরিদ্র মানুষের কোন অধিকার নেই। ফলে যদ্দিন পর্যন্ত গরীব মানুষ রাষ্ট্র ক্ষমতার অংশীদার না হয় আর নিজেরাই আইন প্রনয়নের অধিকার লাভ না করে তদ্দিন সরকারের কাছে সুপারিশ বা ওষুধ নিয়ন্ত্রণের দাবি তুলে কোন ফায়দা হবে বলে মনে হয় না।

আপনার কর্তব্য

আপনার নিজের স্বাস্থ্য ভাল রাখার দায়িত্ব আপনার। আপনি যদি ডঃ মার্টিন সোয়েইজারের থানা স্বাস্থ্য প্রধানের মতো না হতে চান তাহলে একটা সোজা নিয়ম অনুসরণ করুন—টনিক এলিক্সির বা ঐ জাতীয় মদসর্বস্ব ওষুধ কখনোই ব্যবহার করবেন না। অবসাদ, ক্লান্তি বা স্বাস্থ্যহীনতার মূল কারণ কেবল দুটো হতে পারে—এক, আপনি সম্ভবত কোন রোগে ভুগছেন; দুই, আপনি ঠিক মত খাচ্ছেন না।—হয়তো পেট ভরে বিচিত্র স্বাদের খাওয়া খাচ্ছেন কিন্তু প্রয়োজনীয় যে পুষ্টি

আপনার পাওয়া দরকার সে পুষ্টি আপনি পাচ্ছেন না। অতএব পুষ্টিকর খাবার খেতে চেষ্টা করুন। আর যদি রোগই আপনার স্বাস্থ্যহীনতার কারণ হয় তবে সে রোগের চিকিৎসা করে সে রোগ থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করুন। যদি কোন বিশেষ ভিটামিন বা খনিজ উপাদানের (যেমন লোহা) অভাবে আপনি স্বাস্থ্যহীনতায় ভোগেন তবে সেই বিশেষ ভিটামিন ও খনিজ উপাদানটিই শুধু খাবেন, সব ভিটামিন এক সংগে নয়। যদি ডাক্তার আপনাকে মালটিভিটামিন, অর্থাৎ সব ভিটামিন এক সংগে খাবার পরামর্শ দেন, তাহলে বুঝবেন ডাক্তার আপনাকে ফাঁকি দিচ্ছেন অর্থাৎ ডাক্তার জানেন না অথবা কষ্ট করে নির্ণয় করার চেষ্টা করছেন না দেহে কোন বিশেষ ভিটামিনটির অভাব ঘটেছে। সে ক্ষেত্রে এ ধরণের ডাক্তারের পেছনে পয়সা খরচ করা ঠিক হবে কিনা তা আপনি ভালো বুঝবেন। একমাত্র অনভিজ্ঞ ডাক্তারই মালটিভিটামিন ব্যবহার করে থাকেন। তবে অনেক সময় রোগীর পীড়াপীড়িতে অনেক দায়িত্ববান ডাক্তারও ভিটামিন লিখতে বাধ্য হন। অতএব আপনার ডাক্তারকে ভিটামিন বা টনিকের জন্যে পীড়াপীড়ি করবেন না। আপনার পুষ্টিহীনতার জন্যে তিনি যদি কোন ওষুধ না লিখে আপনাকে পুষ্টিকর খাবার খেতে পরামর্শ দেন তাহলে তাকে একজন সৎ ও সচেতন ডাক্তারই বলতে হবে। ডাক্তারকে যে সব সময়ই প্রেসক্রিপশন লিখতে হবে এমন কোন কথা নেই।

টনিক কিনে প্রতারিত হচ্ছে গরীব শ্রেণীর মানুষ। তাদের পুষ্টিকর খাবারের পরামর্শ দিয়ে পরিহাস করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তাদের পক্ষে স্বাস্থ্যসম্মত সুন্দর জীবন যাপন কেবল তখনই সম্ভব যখন তাঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারবেন। তার ক্ষমতাসীন শ্রেণী, আন্তর্জাতিক পুঁজির প্রতিনিধি বহুজাতিক কোম্পানী আর এদেশীয় শোষকরা তাদের শোষণ আর প্রতারণা চালিয়ে যেতেই থাকবে' কারণ শুধুমাত্র শ্রমিক আর গ্রামের গরীব মানুষদের শোষণ করেই আমাদের সমাজ টিকে আছে। শোষণ ও প্রতারণাই বর্তমান সমাজের ভিত্তি। এই ভিত্তিকে না ভেংগে ভালো থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

এ দুর্গ ভাঙতে হবে

বিশেষ প্রতিবেদক

এ প্রসঙ্গে আমরা অনেকবার লিখেছি। আজ আবার লিখতে হচ্ছে—নতুন করে, নতুন প্রেক্ষাপটে। যে ড্রাগনের মোকাবেলায় মাসিক গনস্বাস্থ্য এতদিন আপন শক্তিতে বলীয়ান ছিল, আজ সে ড্রাগন গৃহবন্দী। আমাদের অসচেতনতার সুযোগে এ ড্রাগন আবার বেরিয়ে আসতে পারে, বিষাক্ত নিশ্বাসে গ্রাস করতে পারে আমাদের।

এ রক্তচক্ষু ড্রাগনেরা শুধু বাংলাদেশেই নয় পৃথিবীর সব কটি উন্নয়নশীল ও অনুন্নয়নশীল দেশে বিষাক্ত নিঃশ্বাস ছড়াচ্ছে। গ্রাস করছে প্রতিটি দেশের জীবনীশক্তি। বন্দী করছে অসহায়, দুর্বল, গরীব জনগনকে অন্ধকারের দুর্গে। এই নিশ্ছিদ্র দুর্গে অসহায় মানুষদের প্রবেশাধিকার নেই—অথচ তা তৈরী হয়েছে তাদেরই রক্তের, ঘামের বিনিময়ে। শোষণের নিপীড়ণের বোঝা যারা জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয় এ দুর্গ তাদের রক্ষা করে, সাহস ও শক্তি জোগায়।

জনগণ যখন সাহসী হয়ে ওঠে, প্রতিবাদে সোচ্চার হয়, আঘাত হানে, তখন বহুজাতিক নামধারী এই ড্রাগনেরা তাদের গুটিয়ে নেয় ঐ দুর্গের ভেতর। ঐ গুটিয়ে নেয়ার অবস্থাটা সাময়িক। রণক্ষেত্রে পরাজিত সৈনিকের কৌশলী পিছুহটা। কেননা সে জানে দুর্গের বাইরে যে জগৎ, সে জগতে রয়েছে তার অসংখ্য দোসর, অসংখ্য অনুগত পরভৃত।

এ কারণেই দুর্গের অধিবাসীর যত শক্তিশালী, বাইরের আচ্ছাদনটাও তত শক্তিশালী। হাল্কা আঘাতে, সহজ শ্লোগানে একে কাবু করা সহজ নয়। এ জন্যে প্রয়োজন মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়ানো, সম্মিলিত প্রয়াসে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

ইতিহাসের অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের সংগ্রামে পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষ পর পর ড্রাগনের সঙ্গে লড়াই করেছে। এ লড়াই এক অন্তহীন লড়াই। কখনো এ লড়াইয়ে বিজয় সুচিত হয়েছে, কখনো পরাজয় এসে গ্রাস করেছে জনগণের অদম্য ইচ্ছাকে।

বাংলাদেশের জনগণ এ প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এ অঞ্চলের জনগণ যুগ যুগ ধরে মুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছানর জন্য লড়াই করছেন, জীবন দিয়েছেন। সঠিক পথনির্দেশে তাদের সংগ্রাম কখনো বিজয়ী হয়েছে, কখনো ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু পরিবর্তনের

লড়াই থেমে থাকেনি। বাংলাদেশের জনগণ তাদের লক্ষ্যে অটল থেকে এগিয়ে চলেছেন।

আমাদের জনগণের সাহসিকতার প্রমাণ মিলছে অনেকবার। অতি সম্প্রতি জাতীয় ওষুধ নীতিকে কেন্দ্র করে যে অপবিতর্কের ঝড় উঠেছিল, জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে খর্ব করার যে অপচেষ্টা চলেছিল সে অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। রক্তচক্ষু ড্রাগনরা আপততঃ দুর্গে আত্মগোপন করেছে হয়ত সময়ে তারা আবার আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করবে—সে চেষ্টা হবে আমাদের কোন দুর্বলতার সুযোগে।

জাতীয় ওষুধ নীতির প্রয়োজনীয়তা ও অপ্রয়োজনীয়তার বিতর্ক এখন অর্থহীন। সরকারী পর্যায়ে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। জনগণের কল্যাণ সাধনে যারা কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করেছিলেন, অপপ্রচারের বলগা ঘোড়া ছুটিয়েছিলেন' তারা নিবৃত হতে বাধ্য হয়েছেন। এতদিন এরা বিনা পুঁজিতে, বিনা পরিশ্রমে আমাদের রক্ত শোষণ করে মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলেছিলো। সে মুনাফা চ্যালেঞ্জ করার মত কেউ ছিল না।

বহু দেশের সচেতন মানুষ যার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, অজ্ঞানতার কারণে আমরা তার শিকার হয়েছিলাম। ওষুধের নামে আমাদের গ্রহণ করতে হয়েছে বহু অপ্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ—যার প্রতিক্রিয়া শরীরের ওপর বহুমুখী। এসব পদার্থের প্রতিক্রিয়ায় কত মানুষের জীবনী শক্তি কমেছে, কত মানুষ পঙ্গু হয়েছে সে হিসেব আমাদের নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত 'সভ্য দেশে' যে সব কারণে ওষুধ কোম্পানীকে বহু ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে, বাজার থেকে তুলে নিতে হয়েছে, বিভিন্ন ওষুধ।

বাংলাদেশের ওষুধ নীতি সম্পর্কে দেশের ভেতর এবং বাইরে যারা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল তাদের উষ্মার কারণ ছিল একটাই—মুনাফা, ঘাটতি। মুনাফার লোভে, মুনাফা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বলেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ কিভাবে একটি দেশ, একটি জাতিকে সর্বগ্রাসী শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে এদেশের মানুষ তার প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগী। দীর্ঘ দুশো বছরের ঔপনিবেশিক শাসন, সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। সাম্রাজ্যবাদ এখান থেকে বিদায় নিলেও, শোষণের অবশেষ রেখে গেছে।

যে অনুন্নয়নের কারণে তারা আমাদের কৃপা করে, সাহায্যের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে, সে অনুন্নয়ন যে তাদের কারণে এ কথা আজ নতুন করে বলার প্রয়োজন হয় না। আমাদের সম্পদ লুট করে পাশ্চাত্যের যে শহরগুলো গড়ে উঠেছে, প্রাচুর্যের বন্যা বইয়ে দিয়েছে, তার পুরোপুরি জোগান দিয়েছে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নয়নশীল দেশগুলি।

সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও শক্তিগুলো তাদের শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য তৃতীয় বিশ্বের স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলোর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, অবরোধ গড়ে তুলেছে। এ অবরোধের ইতিহাস বড় করুণ। অবরোধের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী দেশগুলো জাতীয় স্বার্থকে বিকিয়ে দেয়। শ্রীলংকা যখন আমাদের মত একটি ওষুধ নীতি কার্যকর করেছিল দশ বছর আগে তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হুমকি দিয়েছিল খাদ্য সাহায্য বন্ধ করে দেয়ার।

এবার বাংলাদেশকেও এমনি হুমকির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এ নীতিকে বানচাল করার জন্য চেষ্টা চলেছে বিভিন্ন ভাবে। সুদৃশ্য মোড়কে যেমনি এরা ওষুধের বদলে আমাদের খাইয়েছে আফিম, তেমনি সুদৃশ্য মোড়কে ঝড় তুলেছিল প্রচারণার। এ বিলাপ যারা শুনছে, প্রত্যক্ষ করেছে তারাই বুঝেছে কান্নার উদ্দেশ্য কি? যুক্তি এদের কাছে অর্থহীন। বাতিল ওষুধের স্বপক্ষে এরা যুক্তি খাড়া করেনি। খাড়া করেছে আবেগকে। কেননা যুক্তি এদের ছিল না। তাই হুমকিকে ঢাকবার জন্য প্রয়োজন হয়েছে আবেগের, মিথ্যা ভণিতার।

যুক্তি যেখানে অচল, আবেগ সেখানে প্রবল। কিন্তু জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চাই না বলেই আমরা যুক্তি নির্ভর হয়েছি। এ কারণেই আন্তর্জাতিকভাবেও আমাদের সমর্থন মিলেছে প্রচুর।

এই সাহসী পদক্ষেপ তাই জনগণ অভিনন্দিত করেছেন। নাড়িয়ে দিয়েছে অচলায়তনের ভিত্‌কে। কোন প্রশংসাই এ পদক্ষেপের জন্য যথেষ্ট নয়। জাতির ইতিহাসে এ পদক্ষেপটিকে থাকবে মাইল ষ্টোন হিসেবে। পৃথিবীব্যাপী যারা সচেতন, যারা মানুষের অধিকারে বিশ্বাসী, যারা মানুষের বঞ্চনায় বিশ্বাস করে না তারাই আমাদের এ পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে, সমর্থন দিয়েছে। যে কাজ পৃথিবীর বহু দেশে এখনো সম্পন্ন হয়নি, বাংলাদেশ সে কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

কিন্তু আত্মতুষ্টির সময় এখনো আসেনি। ওষুধ নীতির সুফল সামগ্রিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। নিরক্ষর মানুষকে জানাতে হবে সব ওষুধই প্রয়োজনীয় এবং জরুরী নয়।

একই সঙ্গে সচেতন থাকতে হবে দুর্গে আত্মগোপনকারী রক্তচক্ষু ড্রাগনদের সম্পর্কে। যারা বহুজাতিক কোম্পানীর দালাল অথচ ভেকধারী জনদরদী। লড়াইয়ের প্রথম পর্যায়ে যে বিজয় তার জন্যে তৃপ্তি বোধ করার সঙ্গে সঙ্গে আরো সচেতন হতে হবে। কেননা সামনে যে লড়াই, সে লড়াই আরো কঠিন। কারণ এবার মূল দুর্গে আঘাত হানতে হবে। যে দুর্গ এ জনবিরোধী শক্তিকে আশ্রয় দেয় সে দুর্গ ভাঙতে হবে।

সব জ্যোতিষ ভুয়া

ভাগ্য নিয়ে ব্যবসা

ত্রিকালদর্শী টাইরেসিয়াম ভবিষ্যৎ বাণী করেছিল, ইডিপাস তার মায়ের শয্যাসঙ্গী হবে। টাইরেসিয়ামের ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হয়েছিল। কিন্তু সে সত্য নাটকের সত্য। আজ আর নিয়তির রাজারা নেই। আছে ইতিহাসের রাজারা। সেখানে অতীত ও বর্তমানের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয় ভবিষ্যৎকে, যার সঙ্গে নিয়তির কোন সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক নেই ভাগ্যের। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মানুষ শুধু অনুমানই করতে পারে, তার সামান্য অংশই সত্যে পরিণত হয়।

মানুষের ভাগ্য সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করা ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ। বিজ্ঞান হিসেবে ভাগ্য চর্চা এখনো প্রাগৈতিহাসিক যুগেই পড়ে আছে। কারণ, জ্যোতিষদের মতে মানুষের ভাগ্য বারটি নক্ষত্র রাশিতেই সীমাবদ্ধ। অথচ বিজ্ঞানীরা এক হাজার মিলিয়নেরও বেশি নক্ষত্রের সন্ধান পেয়েছেন।

নক্ষত্র বা তারা হচ্ছে তেজোদীপ্ত গ্যাসীয় পদার্থের গোলক। এগুলোর নিজস্ব তাপ ও আলো আছে। মেঘশূন্য অন্ধকার রাতে অসংখ্য নক্ষত্রের উজ্জ্বল আলো আকাশের বুকে দেখা যায়। নক্ষত্রগুলো সূর্য থেকে কোটি কোটি মাইল দূরে অবস্থিত। বহু নক্ষত্র সূর্যের চেয়েও অনেকগুণ বড় এবং বেশি তাপ বিকিরণ করে। সমস্ত নক্ষত্রই গতিশীল। গ্রহগুলো নক্ষত্রের চারদিকে পরিভ্রমণ করে। পৃথিবী সূর্যের একটি গ্রহ। অন্যান্য নক্ষত্রের গ্রহ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এখনো তেমন কিছু জানতে পারেননি। আর সেখানে আমাদের 'জ্যোতিষরা' নক্ষত্র-গ্রহের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করছেন।

মহাজাতক নিজেকে পরিচয় দেন বিশ্ব বরেণ্য অকণ্ট সাধক জ্যোতিষ শ্রেষ্ঠ হিসেবে। 'প্রফেসর' হাওলাদার দাবী করেন তিনি বিশ্ব জ্যোতিষী সমিতির চেয়ারম্যান, জ্যোতিষী গুরু ও বহুবার স্বর্ণপদকে ভূষিত। বিভূতি ভূষণ নিজেকে মনে করেন 'জ্যোতিষ ভাস্কর ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জ্যোতিষী। সার্টিফিকেট নকল করলে শাস্তির ব্যবস্থা আছে, কিন্তু যারা জ্যোতিষ শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন, জ্যোতিষ সম্রাট, প্রফেসর ইত্যাদি খেতাবে নিজেদেরকে ভূষিত করে মানুষকে প্রতারণা

করেন, তাদের জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা নেই। বরঞ্চ তাদের সমাবেশে মন্ত্রী উপস্থিত হয়ে আশ্বাস দেন মানমন্দির প্রতিষ্ঠার। জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রাথমিক অঙ্কগুলোও তাদের জানা নেই অথচ তারা 'বিজ্ঞানী'র মুখোস পরেন। আর সারা দেশে এদেরকে নিয়ে গড়ে উঠেছে একটি চক্র, যা মূলতঃ চক্রান্ত। এই চক্রান্ত সাধারণ মানুষের ভাগ্য নিয়ে, সাধারণ মানুষকে কর্মবিমুখ ও নির্ভরতানির্ভর করে তোলার জন্যে কাজ করে যাচ্ছে এই চক্রটি। জ্যোতিষী মুহম্মদ আনিসুল হক মনে করেন আসল জ্যোতিষীর সংখ্যা বারজনও হবে না। খাজা সুজন মনে করেন, জ্যোতিষীদের মধ্যে শতকরা নব্বই জনই ভুয়া। অথচ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাদের সম্পর্কে নীরব। বশির উল্লাহ্ নামে একজন জ্যোতিষী নিজেই স্বীকার করেছেন, পুঁজি নেই, ডিগ্রী নেই। কোথাও চাকরি পাননি। তাই বাধ্য হয়ে ভাগ্য গণনার ব্যবসায় নেমেছেন। তিনি তার নামের সামনে লেখেন 'জ্যোতিষ শ্রেষ্ঠ,' 'ভাগ্যবিদমনি' ইত্যাদি। জ্যোতিষীরা ভাগ্য গণনার জন্যে নেন এক টাকা থেকে পাঁচ হাজার এক টাকা পর্যন্ত। এই ৫০০১ টাকার সর্বোচ্চ ফি হাঁকেন মহাজাতক সাহেব। তাদের মূল ব্যবসা গ্রহরত্ন নামে পাথর বিক্রি করা। জ্যোতিষ মুহম্মদ আনিসুল হক জানান, একটি গ্রহরত্ন লক্ষাধিক টাকায় পর্যন্ত বিক্রি হয়। তিনি নিজেও এই দামে গ্রহরত্ন বিক্রি করেছেন।

বিজ্ঞাপন সমাচার

পত্রিকার পাতায় বিভিন্ন জ্যোতিষীর বিজ্ঞাপন নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। পত্রিকার পাঠকরা কম-বেশি সকলেই এর সঙ্গে পরিচিত। আমাদের দেশে একজন জ্যোতিষ সম্রাট আছেন, তরে নাম জ্যোতিষ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতজী। সঙ্গে তিনি যে ডিগ্রী ব্যবহার করেন তার মধ্যে রয়েছে এল এম পিপি কেপি (ঢাকা), কে এল এইচ (বৃটেন)। জ্যোতিষ শ্রেষ্ঠ'র সাথে সাক্ষাৎ করে জানতে চাইলেন একজন দর্শক, সম্রাট খেতাবটি কিসের ? তিনি জানালেন এটি আমার খেতাব।"

—কে দিয়েছে ?

—আমাদের ভক্তরা।

—অন্য ডিগ্রীগুলো কার দেওয়া ?

—ওটা বুঝতে কমপক্ষে দু'দিন সময় লাগবে।

আসলে জ্যোতির্বিজ্ঞানে তার কোন ডিগ্রী নেই। আগে কোন রকম রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই ব্যবসা করতেন এ জন্যে তাকে একবার থানায় ধরে নেওয়া হয়েছিল। তিনি খত দিয়ে এসেছেন, আর ভাগ্য নিয়ে ব্যবসা করবেন না। তিনি আবার রেজিস্ট্রেশন পেয়েছেন। আবার পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করেছেন। তার বিজ্ঞাপনে লেখা, "জার্মানদের দ্বারা পুরস্কৃত। বহুবার বিদেশ করার পর গবেষণা চালাইতেছেন। হস্তরেখা ও জ্যোতিষবিদ্যা প্রকাশের পথে। সর্বদাই চেম্বারে থাকিয়া যে কোন হতাশা ও সমস্যা সমাধানের জন্যে ব্যবস্থাপত্র দিতেছে।" তিনি নিজেকে পরিচয় দেন জ্যোতিষ শ্রেষ্ঠ হিসেবে। একজন জ্যোতিষ বলেন, "তিনি মূলতঃ একজন ভণ্ড জ্যোতিষী,

ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে তার কোন একাডেমিক ডিগ্রী নেই। প্রতারণার দায়ে তাকে একবার গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাই কিছুদিন নীরব ছিলেন। আবার খবর হয়েছেন। তিনি আমাদের ব্যবসার যথেষ্ট ক্ষতি করেছেন।''

প্রফেসর হাওলাদার জ্যোতিষ জগতে একজন পরিচিত ব্যক্তি। প্রকৃত পক্ষে তিনি কোন কলেজেই প্রফেসর ছিলেন না। এখনও প্রফেসর নন। তবে তার নিজের ভাষ্য, "কিছুদিন মফস্বলে অধ্যাপনা করেছি।'' তার নামের শেষে ব্যবহৃত হয় এম, এ, এল, এল, বি (মনো বিজ্ঞানসহ স্নাতক ডিগ্রীধারী)। তার বিজ্ঞাপনে লেখা হয়ঃ

জ্যোতিষ গ্রন্থ ও নামের বিভ্রান্তি

বিশ্ব জ্যোতিষ সমিতির সভাপতি, পৃথিবীর বহু দেশের পত্র-পত্রিকায় যাঁর সচিত্র প্রতিবেদন ছাপা হচ্ছে, হস্তরেখার রোগ নির্ণয়ের গবেষক, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বর্ণ-পদকপ্রাপ্ত, বাংলাদেশ ডিগ্রী কলেজ অব এ্যাস্ট্রোলজি এ্যান্ড অকাল্ট সায়েন্সেস-এর প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ, জ্যোতিষ চর্চার সর্বোচ্চ 'জ্যোতিষ-গুরু' খেতাবে ভূষিত, প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী জ্যোতিষী প্রফেসর হাওলাদার M.A. (Eng) LL.B A.M.A. F.A. (US.A)-এর আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ (ক) জেম স্টোন ফর থেরাপী (খ) কোষ্ঠী বিচার পদ্ধতি (গ) রাশিফল ইত্যাদি পাঠে আপনার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। (মনে রাখুন তাঁর ছোট ভাইয়ের নামও পত্রিকায় প্রায় অনুরূপ)। আপনার হতাশা, সামান্য কারণে ব্যর্থতা, অমনোযোগিতা, উগ্রমেজাজ, আত্মহত্যার প্রবণতা ও অন্যান্য উপসর্গের জন্য মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শ এবং রেখা-রাশি বিশ্লেষণ করে গ্রহ-রত্ন ধারণ করে সুখী-সমৃদ্ধ জীবন গঠন করুন। মূলতঃ মানুষ প্রচেষ্টার দ্বারাই তার ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে। সাক্ষাৎ বিকাল ৫টা—৮টা, মঙ্গলবার বন্ধ। ফোনঃ ৫০৮৭৮৯, ৫০৮৯৩, ৫০১৪৪৯, ৫০৮৪৭৩, চেম্বারঃ ১৮, নুর-পি—১২৪ ম্যানসন, নিউ মার্কেট ওভারব্রীজ, ঢাকা।

এক কথায় চাকরি পাওয়ার চিকিৎসা পর্যন্ত তিনি করেন। এটা কি ধরনের উদ্ভট চিকিৎসা আমাদের বোধগম্য নয়। এই বিজ্ঞাপন থেকেই বোঝা যায়, মানুষের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে ব্যবসা করছেন তিনি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াও তিনি নামের সঙ্গে ব্যবহার করেন, এম, সি, এফ, এস (আইটি আরটি), এম, এম, এ, এফ, এ (আমেরিকা)। এর মানে কি? উত্তরে তিনি জানান, এসোসিয়েট মেম্বার অব আমেরিকান এস্ট্রোলজিক্যাল সোসাইটি। এগুলো নামের সঙ্গে ব্যবহার করেন কেন? এর উত্তরে এক সাংবাদিককে বলেন, ''এটাতো সবাই লেখে, তাই আমিও লিখি।'' আগে তিনি বিনামূল্যে গ্রহরত্ন দেয়া হয় বলেও পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতেন।

নয়া পল্টনে বশির আহমেদ কাজমী নামে একজন জ্যোতিষ রয়েছেন। তার বিজ্ঞাপনের ভাষা বেশ অভিনব। যদিও বিজ্ঞাপনের ভাষা থেকে বোধগম্য হয় না, তিনি কি ধরনের জ্যোতিষী, তবে একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না বিজ্ঞাপনের ভাষায়

	ত্রিযোজী ধাতুর মিশ্র সিলিকেট)	$3SiO_2$				
চন্দ্রকান্ত মণি (Moon Stone)	ফেল্‌স্‌পার (সোডিয়াম ক্যালসিয়াম	CaO/Na_2O $K_2O.Al_2O_3$	২·৬—২·৮	ধূসর	১·৫৩ ১·৫৮	খনিজ পদার্থ
সূর্যকান্ত মণি (Sun Stone)	পটাসিয়াম অ্যালু-মিনিয়াম সিলিকেট)	$4/6\ SiO_2$				
পোখরাজ •(Supphire)	টোপাজ (অ্যালু-মিনিয়াম সিলিকেট)	$Al_2SiO_4(OH/F)_2$	৩·৪—৩·৬	স্বচ্ছ, হালকা হলুদ. হালকা নীল	১·৬৩	খনিজ পদার্থ
নীলিকান্ত মণি বা তুরস্ক মণি	টারকোয়েস (কপার অ্যালু-মিনিয়াম ফসফেট)	$CuO_3Al_2O_2$ $2P_2O_5.9H_2O$		অস্বচ্ছ নীল ও নীলাভ সবুজ	১·৬২	খনিজ পদার্থ
বৈক্রান্ত মণি	জারকন (জারকোনিয়াম সিলিকেট)	$ZrO_2.SiO_2$	৪·৭	অস্বচ্ছ	১·৯৪	খনিজ পদার্থ
উপল	ওপাল	SiO_2nH_2O	১·৯—২·২	দুধের মতো সাদা ও জ্যোতির্ময়	১·৪১	খনিজ পদার্থ
মুক্তা (Pearl)	পার্ল (পটাসিয়াম বা ক্যালসিয়াম কার্বনেট)	K_2CO_3বা$CaCO_3$	১·১—১·৪	সাদা		ঝিনুকের মধ্যে কণা ঢুকে গেলে তার চারপাশে লাল জমতে থাকে ; ক্রমে গোল ও শক্ত মুক্তো পাওয়া যায়। এটি একটি সমুদ্রজ পদার্থ
প্রবাল বা পলা	কোরাল (ক্যাল-সিয়াম কার্বনেট)	$CaCO_3$	২·৭	গাঢ় রক্তবর্ণ, হলুদাভ রক্তবর্ণ, সাদা		সমুদ্রজ পদার্থ

পাথরের বৈজ্ঞানিক তথ্য

রত্নের নাম	খনিজ/বৈজ্ঞানিক নাম	রাসায়নিক সংকেত পরিচয়	আপেক্ষিক গুরুত্ব (Sp. gr)	বর্ণ	প্রতিসরাঙ্ক (Refractive index)	বৈশিষ্ট্য
হীরা (Diamone)	কারবন	C	৩·৫২	স্বচ্ছ	২·৪২	এর আলো বিচ্ছুরণের মান ০·০৬৩; হীরে কাটার পর নানা রঙের বিচ্ছুরণে অপূর্ব মনোরম রং দেখা যায়। এটি খনিজ পদার্থ।
চুনি (Ruby) নীলা (Blue Sapphirc)	কোরান্ডাম (অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড)	Al_2O_2	৩·৯—৪·১	লাল, নীল, হলুদ	১·৭৭	অল্প পরিমাণ লোহা, টাইটানিয়াম অথবা ক্রোমিয়াম অক্সাইডের উপস্থিতি একে বিভিন্ন রূপ দেয়—পীতাম্বর, নীলা, রক্তমুখী নীলা ইত্যাদি। এটি খনিজ পদার্থ।
পান্না (Emerald)	বেরিল (বেরিলিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট)	$3BeO\ Al_2O_2\ 6SiO_2$	২·৬—২·৮	স্বচ্ছ, সবুজ,	১·৫৮	খনিজ পদার্থ। শুদ্ধ বেরিল বর্ণহীন ক্রোমিয়াম অক্সাইড সামান্য পরিমাণ থাকলে সবুজ পান্না পাওয়া যায়।
বৈদূর্য মণি (Cat's eye)	ক্রাইসোবেরিল (বেরিলিয়াম ও অ্যালুমিনিয়াম-এর মিশ্র অক্সাইড)	$BeO.Al_2O_2$	৩·৫—৩·৮	হলুদ, সবুজ, খয়েরী	১·৭৫	খনিজ পদার্থ।
গোমেদ	গারনেট (একটি দ্বিযোজী ধাতু এবং একটি	$3Mgo/CaO/$ $MnO.Fe_2O_2/$ Cr_2O_2/Al_3O_3	৩·৪—৪·৩	লাল, বাদামী কমলা	১·৮৯	খনিজ পদার্থ। বিভিন্ন ধাতুর সমন্বয়ে এদের বর্ণ ও রাসায়নিক ধর্ম পরিবর্তিত হয়।

স্ট্যান্ট রয়েছে। বিজ্ঞাপনে লেখা রয়েছে, "সমরেশ বসুকে মহাকাব্য রচনার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তিনি, তাতে তিনি সফলকাম হচ্ছেন এবং আরো অনেক ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন।" প্রকৃতপক্ষে সমরেশ বসু কোন মহাকবি নন, একজন উপন্যাসিক। তার লেখা কোন মহাকাব্য প্রকাশিত হয়নি। তাই এ বিষয়ে সফলকাম হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

মুজিব চৌধুরী নিজেকে পরিচয় দেন একজন ফিজিওলজিস্ট হিসেবে। তিনি দাবী করেন, মানুষের চেহারা দেখে তার ভাগ্যের কথা বলে দিতে পারেন। এ জ্ঞান অর্জনের উৎস কি? এর উত্তরে একজন দর্শককে বলেন, "মায়ের দোয়া ও স্বপ্নে এই জ্ঞান আমি পেয়েছি।"

জ্যোতিষ শাস্ত্রে চর্চার নামে মহাজাতক, হাওলাদার, টি. আহমেদ ও আনিসুল হক প্রতিষ্ঠিত করেন ইনস্টিটিউট ও কলেজ। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হওয়ার জন্যে নির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রয়োজন, অথচ জ্যোতিষ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ হওয়ার জন্য কোন যোগ্যতা প্রয়োজন হয় না। নিজেরাই হয়ে যান স্বঘোষিত প্রফেসর কিংবা অধ্যক্ষ। অথচ এদের ইনস্টিটিউটে পড়া-শোনা করে কিছু উচ্চ শিক্ষিত বেকার তরুণও।

ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা কতটুকু?

সম্রাট শাহজাহানের প্রিয়তম পত্নী আরজুমন্দ বানু (পরবর্তী নাম মমতাজ মহল) ১৬৩১ খ্রীঃ চতুর্দশ সন্তান প্রসবের সময় মারা যান। তাদের প্রেমকে অমর করে রাখার জন্য ১৬৩২ থেকে ১৬৫৩ খ্রীঃ পর্যন্ত বাইশ হাজার শ্রমিকের অবিরাম শ্রমে শাহজাহান সৃষ্টি করেন আগ্রার তাজমহল। তাজমহলে ফিরোজা, হীরা, ঘোরী, খট্টু, প্রবাল, মুক্তা, নীলা, জেড, পোখরাজ, রুবি, জেসপার, এমারেল্ড প্রভৃতি ২০ রকমের রত্ন ছাড়াও ৪৬৬.৫৫ কিলোগ্রাম সোনা ব্যবহার করা হয়েছিল সৌন্দর্য ও স্থায়িত্বের জন্য।

তাজমহলের উদ্বোধনকালে ভারতীয় জ্যোতিষবর্গ সম্রাট শাহজাহানকে বলেছিলেন যে, এ সমাধির রত্ন ও পাথরগুলোর প্রভাবে তার পুত্রগণের সব বিপত্তি কেটে যাবে এবং তিনিও তার পরিবারবর্গ চিরসুখী হবেন। এমনকি যারা একবার তাজমহল স্পর্শ করবে তাদেরও সমস্ত বিপদ কেটে যাবে।

কিন্তু ইতিহাস ভারতের বরণ্যে রাজ জ্যোতিষদের ভবিষ্যদ্বাণীকে বড় পরিহাস করেছে। শাহজাহান তার জীবদ্দশায় ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পুত্র ঔরঙ্গজেবের হাতে আগ্রা দুর্গে বন্দী হন। শাহজাহানের পুত্র দারাশিকোহ ও মুরাদ ভারতেই ঔরঙ্গজেবের হাতে বন্দী ও নিহত হয়। পরাজিত অপর পুত্র সুজা আরাকানে নিহত হয়।

● অষ্টাদশ শতাব্দীর দু'জন সবচেয়ে খ্যাতিমান ইউরোপীয় জ্যোতিষ প্রখ্যাত ফরাসী দার্শনিক ভলতেয়ারকে বলেছিলেন, তার আয়ু বড়জোর ৩০/৩২ বৎসর। ভলতেয়ার বেঁচেছিলেন ৮৪ বৎসর।

● ১৫৫৫ সালে তৎকালীন বিশ্বখ্যাত ইংরেজ গনক বলেছিলেন কিশোর রাজা এডওয়ার্ড অনেক দিন বাঁচবেন, যদিও ৫৫ বৎসর বয়সে রোগাক্রান্ত হবেন। রাজা ষষ্ঠ এডওয়ার্ড তার পরের বৎসরই মাত্র ষোল বৎসর বয়সে মারা যান।

● ভারতীয় ও ইউরোপীয় জ্যোতিষদের বিচারে ১৯৪০ সনেই হিটলারের নিহত হবার কথা। কিন্তু ইতিহাস তা ভুল প্রমাণ করেছে।

● পাটনার ভারত বিখ্যাত জ্যোতিষী গণেশ কান্ত ঝা ৮ই এপ্রিল ১৯৭৯ সনে ঘোষণা করেছিলে ভারতের প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ জয়প্রকাশ নারায়ণ ৯৩ বৎসর পর্যন্ত বাঁচবেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ ৭ই অকটোবর, ১৯৭৯ সনে ৭৭ বৎসর বয়সে মারা যান।

● ১৯৮১ সনে জুলাই মাসে পেরুর গনক স্যানটোস পারডেস বলেছিলেন, পেরু বিশ্বকাপ ফুটবলে দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগে খেলবে। তার ভবিষ্যদ্বাণী না মিললে সে মাথা মুড়াবে। শেষ অবধি স্যানটোসের মাথা মুড়োতে হয়েছিল।

কিন্তু মহাজাতক পার পেয়েছেন। মহাজাতক ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পরে বলেছিলেন, তিনি ১৯৮৪ সনেই জানতেন (এবং কথার আবডালে পত্রিকান্তরেও বলেছেন) ইন্দিরার বিপদ আসছে। সম্ভবতঃ তার বা ইন্দিরার ফোন খারাপ থাকায় খবরটা মহাজাতক ইন্দিরা গান্ধীকে পেঁছাতে পারেননি।

টিয়ার ঠোঁটে ভাগ্য, কিছু প্রমাদ

প্রাচীনকালে ত্রিকালদর্শী বলে পরিচিত একদল জ্যোতিষী ছিলেন, যারা রাজ-রাজরাদের ভাগ্য গণনা করতেন। এখনো বিভিন্ন মাজারে, মেলায়, তীর্থস্থানে সাঁই বাবা, বাবা ঠাকুর নামে এক শ্রেণীর গনক দেখা যায়। এরা অধিকাংশই গাঁজাখোর। তারা চমকে দেয়ার মতো অনেক কথাই বলেন,যা শুনে সাধারণ লোক প্রতারিত হয়। কারণ, এই গনকদের ঘিরে থাকে একদল গাঁজাখোর।

ভাগ্য নিয়ে ব্যবসা করার মহামিলন ক্ষেত্র ফুটপাত। একদল গনক টিয়া, ময়না কিংবা তোঁতা পাখি নিয়ে বসেন ফুটপাতে। তিন/চারটি টিয়া কিংবা তোঁতা ছাড়াও থাকে কিছু খাম। গনকের নির্দেশে একটি টিয়া কিংবা তোঁতা ঠোঁটে তুলে একটি খাম। সেই খামের মধ্যে থাকে একটি চিরকুট। চিরকুটে লেখা থাকে আপনার বিদেশে যাওয়ার যোগ দেখা যায়, বিপদ কাটিয়া যাইবে সুদিন সামনে, সাবধানে চলুন ইত্যাদি ধরনের কিছু কথা। এ ছাড়া লেখা থাকে 'কেতাব দেখিতে এক টাকা'। অর্থাৎ চিরকুটে লেখা মন্তব্যের অতিরিক্ত কিছু জানতে চাইলে আরো এক টাকা দিয়ে একটি বই দেখতে হবে। সেখানেও লেখা থাকে আরো কিছু মুদ্রিত বক্তব্য। একজন সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন লোকও জানেন, এ ধরনের মন্তব্যের কোন যুক্তি নেই। একটি সামান্য পাখির ঠোঁটে নিজের ভবিষ্যৎ জানার জন্যেও লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন মানুষ। টিয়ার ঠোঁটে ভাগ্য গণনা করেন আমির আলী। তিনি বলেন, "বহুদিন চাকরি খুঁজেছি। মামুর জোর নেই বলে চাকরি পাইনি। তাই মাস তিনেক আগে এই ব্যবসায় নেমেছি। সংসার চালাতে হবেতো।" তিনিই জানান, এখন তার দৈনিক আয় ১০০/১৫০ টাকা।

এ বছর বেশ কয়েকটি সাপ্তাহিক পত্রিকা রাশিচক্র প্রকাশ করেছে। অথচ একটি পত্রিকার বক্তব্যের সঙ্গে আরেকটি পত্রিকার বক্তব্য মেলে না। বিভিন্ন জ্যোতিষী বার্ষিক ভাগ্যের ওপর পুস্তক প্রকাশ করেছে। সেখানেও রয়েছে একজনের সঙ্গে আরেকজনের গড়মিল। এসব বক্তব্যের পরস্পর বিরোধিতাই প্রমাণ করে ভাগ্য গণনার অন্তঃসার-শূন্যতা।

উপসংহার

প্রিয় পাঠক, টিয়া পাখীর ঠোঁটে আপনার যে ভাগ্যলিখন উঠে আসে, তা কি আপনি বিশ্বাস করেন? উত্তরটা খুবই সহজ এবং আপনিও জানেন টিয়া পাখীর ঠোঁটে বা কারও (জ্যোতিষ) আঙ্গুলি হেলনে মানুষের ভাগ্য দোদুল্যমান থাকতে পারে না। জ্যোতিষের ভবিষ্যদ্বাণীতে মানুষের ভাগ্য যেমন গড়ে ওঠে না, তেমনি তাদের দেয়া (অর্থের বিনিময়ে) মাদুলী বা পাথরে আপনার জীবনের সাফল্য অথবা রোগমুক্তিরও কোন সম্ভাবনা নেই।

মানুষ তার ভবিষ্যৎ গড়ে তোলে কর্মের দ্বারা, কষ্টলব্ধ শ্রমের বিনিময়ে। আর খুব বেশী ভাগ্যবান হলে পূর্ব পুরুষের সঞ্চিত অর্থে আপনি নির্বিঘ্ন জীবন কাটাতে পারেন। তবে এটা পরিষ্কার যে মানুষের কষ্টার্জিত শ্রমই হচ্ছে ভবিষ্যৎ গড়ার প্রথম ও প্রধান সোপান। ভাগ্যরেখা একটা অবাস্তব থিওরী। এ প্রসঙ্গে ফরাসী বীর নেপোলিয়ানের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। জনশ্রুতি আছে যে, কোন এক যুদ্ধযাত্রার আগে তিনি এক জ্যোতিষের কাছে যুদ্ধ ফলাফল সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। জ্যোতিষ নেপোলিয়ানের হাতের একটি বিশেষ রেখা দেখিয়ে বলেছিলেন, "এই রেখাটা এভাবে থাকলে যুদ্ধের ফলাফল আপনার পক্ষে যেত।" নেপোলিয়ান তৎক্ষণাৎ কোষ থেকে তরবারি বের করে হাতের রেখা সেভাবে কেটে প্রশ্ন রাখেন, "এবার ঠিক আছে?" জ্যোতিষ বললেন, "হ্যাঁ, এবার ঠিক হয়েছে।" জনশ্রুতি এই যে, অতঃপর নেপোলিয়ান উক্ত জ্যোতিষের শিরচ্ছেদ করেছিলেন।

বাংলাদেশের সমাজজীবনে এক শ্রেণীর লোকের ভাগ্য নিয়ন্তা হিসেবে বিচিত্র নাম ও উপাধীধারী অসংখ্য জ্যোতিষ (?) সরবে বিরাজ করছেন। এদের কেউ আবার ২৬/২৭ বছরের অভিজ্ঞ। জানতে ইচ্ছে করে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন'? প্রশ্নটা এই কারণে যে, প্রাক স্বাধীনতা আমলে সংবাদপত্রের পাতায় এদের ঠাঁই ছিল না। স্বাধীনতা পূর্ব ও পরবর্তী সময়ের বিভিন্ন তারিখের কতগুলো দৈনিক সংবাদপত্রের পাতা আমরা উল্টিয়ে দেখেছি। কী পেলাম? আজকের দিনে যারা 'মহাজাতক', 'জ্যোতিষ সম্রাট', 'জ্যোতিষতীর্থ', 'জ্যোতিরাক্ষ' ইত্যাদি নাম নিয়ে ঠগবাজীর ব্যবসা করছেন, একদশক আগের সংবাদপত্রের পাতায় তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত নেই। এরা কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলেন? এবং এদের সংখ্যা দিনকে দিন বাড়ছেই বা কেন? এক কথায় এর উত্তর দেয়া দুষ্কর।

তবে সামাজিক, নৈতিক অবক্ষয়ের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এর উত্তর। হতাশা থেকে, বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তিকামী একদল মানুষ এদের পেছনে ছোটে। সরকারী পৃষ্ঠপোশকতা এবং মন্ত্রীদের প্রশংসাও এদের জোটে। সর্বোপরি এক ধরনের

অন্ধ বিশ্বাস কুসংস্কার এবং অশিক্ষা জ্যোতিষদের ব্যবসার বলয়কে প্রসারিত করতে সহায়তা করছে।

নেশাসক্ত মানুষ দেখেছেন? দেখবেন কেউ যখন নেশা করে কেমন বুঁদ হয়ে থাকে। নেশা ছুটলেই স্বাভাবিক এবং অন্য মানুষ হয়ে যান। এক সময় আমরা ওষুধের নামে মদ ও আফিম খেয়েছি। কেন? ওতে যে আফিম ও মদ থাকে তা আমাদের জানা ছিল না। জানবার পর ওসব খাওয়া ছেড়েছি। কোন ক্ষতি হয়নি আমাদের। চ্যাঁচাল কারা? যাদের বাড়া ভাতে ছাই পড়েছে তারা। কাঁচা পয়সার আমদানী খুবই লোভনীয় ব্যাপার কিনা।

ঠিক একইভাবে এক শ্রেণীর মানুষ ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা জ্যোতিষদের খপ্পরে পড়েছে। কেন? বিজ্ঞাপনের মোহে (অনেকটা ওষুধের বিজ্ঞাপনের মতো ব্যাপার)। এই মোহটাই জ্যোতিষ ব্যবসাকে (যা মূলতঃ প্রতারণা) রমরমা করে তুলেছে। এই মোহ ভাংতে হলে মানুষকে এই ঠকবাজীর ব্যবসা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে, বলতে হবেঃ এটা ভুল, এটা মিথ্যা। জ্যোতিষ ব্যবসা স্রেফ প্রতারণা। এদের চ্যালেঞ্জ করলেই এরা গা ঢাকা দিতে বাধ্য। কারণ আত্মপক্ষ সমর্থন করার কোন যুক্তি এদের নেই।

এ প্রসঙ্গে '৮৪-র বাংলা একাডেমী বই মেলার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে মহাজাতক তার রাশিফল বই বিক্রি এবং হস্তরেখা বিচারের জন্যে একটি স্টল খুলেছিলেন। এর বিরুদ্ধে ঢাকার অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞান চক্র 'বাংলা একাডেমী বই মেলায় ভূত' শিরোনামে একটি লিফলেট বিতরণ করেছিল। এর ফলে ফর্সা দেহে কালো আলখেল্লাধারী মহাজাতক সাহেব বড়ই পেরেশান হয়েছিলেন। মুখ গুঁজে থেকে বই মেলা শেষ না হওয়া অবধি স্টলটি অক্ষত অবস্থাতেই রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু চলতি বছরের (১৯৮৫) বই মেলায় মহাজাতক সাহেব (রাশিফল '৮৫ বের করেও) তসরিফ আনতে সাহস পাননি। বই বিক্রির এবং হস্তরেখা বিচারের এমন লোভনীয় তীর্থ মহাজাতক সাহেব হাতছাড়া করলেন কেন? এর উত্তর নিষ্প্রয়োজন। তবে প্রবাদ আছেঃ ন্যাড়া নাকি বেলতলায় একবারই যায়।

শেষ কথাটি এই যে, মানুষ সচেতন হলে, এদের উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত বক্তব্যকে (তথা ভাগ্য গণনা) চ্যালেঞ্জ করলে তারা শামুকের খোলের মতো নিজেদের গুটিয়ে নিতে বাধ্য হবেন। এদের এই ঠগবাজীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশে কোন প্রতিরোধ গড়ে ওঠেনি, বরঞ্চ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় একজন আবার (বিভূতিভূষণ) বেতারে "মণিরত্ন" শিরোনামের কথিকা প্রচারের সুযোগ পান। আজব দেশ বটে।

মানুষকে ঠকানোর এই ব্যবসার বিরুদ্ধে সচেতন হতে হবে, গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধ—এই সচেতনতা এবং প্রতিরোধের সাঁড়াশি আক্রমণে ভুয়া দেশের রাজা তথা বিভিন্ন জ্যোতিষ 'সম্রাটদের' সাধের তখতে তাউস তাসের ঘরের মত ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে বাধ্য।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"পাথরের বৈজ্ঞানিক তথ্য" এবং "হাতের রেখা কি ও কেন?" —এই লেখা দু'টি 'বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ' পুস্তক থেকে নেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য বইটি কলকাতার 'উৎস মানুষ' পত্রিকায় প্রকাশিত এতদ্‌সংক্রান্ত বিভিন্ন রচনার সংকলন।

পানির দাম পনের টাকা
প্রতারণা বহুজাতিক স্টাইল

বিশেষ প্রতিবেদক

প্রেক্ষাপট : ইউরোপ

বাংলাদেশের "জাতীয় ওষুধনীতি" ঘোষণার ছয় মাস পরের ঘটনা। ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৮৩ সনের রাত। বৃটিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশনের (বি বি সি) টেলিভিশন অনুষ্ঠান চলছে। টেলিভিশন অনুষ্ঠানটির নাম প্যানোরোমা বা দিগন্ত। উক্ত অনুষ্ঠানে ১৯৭৯ সনে আরিজোনায় অনুষ্ঠিত মার্কিন বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানী ইলি লিলির উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বিপণন বিষয়ক এক মিটিং-এর দৃশ্য দেখানো হয়। দৃশ্যটি কোম্পানীর নিজস্ব ডকুমেন্টারী ফিল্ম থেকে নেয়া। উক্ত মিটিং-এ উপস্থিত হয়েই ইলি লিলির ভাইস প্রেসিডেন্ট সুদৃশ্য বিরাট ব্ল্যাক বোর্ডে বড় বড় হরফে লিখলেন—GRAB IT—'লুটে নাও'। তারপর বলতে শুরু করলেন, "আমরা আবিষ্কার করছি এক নতুন সোনার খনি, তার নাম 'অপরেন' যা ব্যথার মহৌষধ। এ দিয়ে লোপাট হবে সবার পকেট। আমরা গড়বো সোনার খনি। এবং তোমরাও বসে আছো সোনার খনির উপর। সবাই নিজ নিজ চেয়ারের নীচে তাকাও।" সবাই অবাক হয়ে নিজেদের চেয়ারের নীচে হাতিয়ে দেখে একটি ঝকঝকে আনকোড়া নতুন সোনার ডলার নোট। তাদের আরও হকচকিয়ে দিয়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট চিৎকার করে উঠলেন, "দেখছো কি? GRAB IT—লুটে নাও।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরিজোনার 'লুটে নেওয়া'র মহড়ায় দীক্ষা নিয়ে ঐ সমস্ত কর্মকর্তারা ছুটে বেড়াতে শুরু করেন আমেরিকা, এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন রাজধানীতে। শুরু হয় ক্ষতিকর ওষুধকে মোহ জাগানিয়া বিপণনের মাধ্যমে মৃতসঞ্জীবন বলে চালিয়ে দেবার সত্যিকার নাটক। এই ক্ষতিকর ওষুধটির বাণিজ্যিক নাম অপরেন—জিনেরিক নাম বিনোক্সা-প্রোফেন। এ ওষুধকে প্রচার করা হলো বাতের অমোঘ ওষুধ হিসেবে, বলা হলো এর কোন ক্ষতিকর দিক বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। ডাক্তাররা এদের এসব কথা বিশ্বাস করে লিখলেন হাজার হাজার প্রেসক্রিপশন। ইলি লিলি সত্যি সৃষ্টি করলো সোনার খনি, ভিত্তি দৃঢ় হলো মার্কিন পুঁজিবাদের। তিন বৎসরের মধ্যেই প্রমাণিত হলো ইলি লিলি মিথ্যে কথা বলেছে—অপরেনের

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ভয়ানক, এই ওষুধের কারণে মৃত্যু হয়েছে অনেক মানুষের (মাসিক গণস্বাস্থ্য ৩য় বর্ষ ৪র্থ, ৫ম এবং ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

প্রশ্ন উঠেছে চিকিৎসকরা ভুল করলেন কি করে? তাদের বহুজাতিক ওষুধ-কোম্পানীরা প্রতারিত করলোই বা কি ভাবে? এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানীসমূহের চোরাগলির রহস্য।

বিলেতে 'অপরেন' বাজারজাত করার প্রাক্কালে বিলেতের খ্যাতিনামা চিকিৎসকদের ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রমোদ নৌবিহারে নিয়ে যাওয়া হয় জার্মানীর রাইন নদীতে। পরের বছর তারা পুনরায় খরচ করে এক কোটি টাকা প্যারিসে অনুষ্ঠিত অপরেনের এক সিম্পোজিয়ামে। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছে অন্যান্য দেশে। বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত তৃতীয় বিশ্বের চিকিৎসকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিনা ঘুষে, বিনা প্রশ্নে অনুকরণ করেছে প্রথম বিশ্বের শিক্ষাগুরুদের।

ইলি লিলি কোম্পানী যে কেবল বিশেষজ্ঞদের ঘুষ দিয়ে অন্ধ করে দিয়েছে তা নয়, তারা সাধারণ চিকিৎসক (জেনারেল প্রাকটিশনার্স) ও তাদের স্ত্রীদেরও আপ্যায়ন থেকে বাদ দেয়নি। ইলি লিলির বৃটেনস্থ সাবসিডিয়ারী কোম্পানী 'ডিসটা'র ৭০ জন মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ এক নাগাড়ে তেরদিন ধরে হোটেলে মদ ও খাদ্য দিয়ে আপ্যায়ন করেছে স্ত্রীসহ জেনারেল প্রাকটিশনার্সদেরও। কাহিনীর এখানেই শেষ নয়। অপরেন সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য প্রকাশিত হয় ইউরোপীয়ান জার্নাল অব রিউমোটোলজীতে। পরে প্রমাণিত হয়েছে পত্রিকাটির সব খরচই দীর্ঘদিন থেকে বহন করে আসছে ইলি লিলি কোম্পানী। ঠিক একই ঘটনা ঘটছে বাংলাদেশে। ঢাকা থেকে ইংরেজীতে প্রকাশিত একটি চিকিৎসা সাময়িকীও একইভাবে বহুজাতিকদের পয়সায় মুদ্রিত হয় এবং তাদের এক সাঙাৎ কোম্পানীর অফিস থেকে বিভিন্ন ডাক্তারদের কাছে ডাকযোগে পাঠানো হয়ে থাকে।

ইলি লিলি কোম্পানীর মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভরা সর্বত্র বলে বেড়াতো অপরেনের কার্যকারিতা ও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াহীনতা সম্পর্কে বিশদ গবেষণা করেছেন বিলেতের সেন্ট বার্থোলোমিউ হাসপাতালের এক্সপেরিমেন্টাল প্যাথলজীর অধ্যাপক ডেরেক উইলোবি। অত্যন্ত নামী ব্যক্তি এই উইলোবি। তাঁর বক্তব্য ও গবেষণার দ্বারা নিশ্চিতবোধ করেছেন বিলেত আমেরিকার সাধারণ চিকিৎসকরা। প্যানোরামা অনুষ্ঠানের আলোচক প্রমাণ উপস্থিত করেন যে, অধ্যাপক উইলোবি ইলি লিলির একজন বেতনভোগী বিশেষজ্ঞ মাত্র যা এতদিন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাত ছিল। এতদসত্ত্বেও উইলোবি দাবী করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অজ্ঞাতসারে তিনি ইলি লিলির টাকা নিয়ে থাকলেও তার গবেষণা নিরপেক্ষ ও সাচ্চা। ঠগের মুখে রাম-নাম আর কি। বহুজাতিকদের গবেষণা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অদূর ভবিষ্যতেই মাসিক গণস্বাস্থ্যে প্রকাশিত হবে।

প্রেক্ষাপট : বাংলাদেশ

আমাদের জাতীয় ওষুধ নীতি ঘোষণার দেড় বৎসর পরের ঘটনা। ১৯৮৪ সনের ডিসেম্বর মাস। মাসের ২০ তারিখে বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটি আয়োজন করলেন বাৎসরিক বনভোজন। বন ছেড়ে বুড়িগঙ্গার বুকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সমেত দেশের দন্ত চিকিৎসকেরা তাঁদের পরিবার পরিজনসহ ভোজন করলেন—হলো বনভোজন, হলো নৌবিহার ও প্রমোদ ভ্রমণ। সে সুন্দর সকালে বুড়িগঙ্গার বুকে জাহাজে ভেসে ভেসে যাওয়া, দম্পতিদের রোমান্টিকতা, শিশুদের চঞ্চলতা সব মিলিয়ে বেশ জমেছিল সেদিন। অভিনবত্ব ছিল অনুষ্ঠানটির। উদ্যোগকে প্রশংসা করতে হয়। যাহোক, নৌবিহার কাম বনভোজন শেষে সন্ধ্যালগ্নে জাহাজ ভিড়লো সদরঘাট ঘাটে। সবাই নামছেন। আমিও নামছি। দেখলাম নামবারকালে জাহাজের নির্গমন পথে সবাইকে এক এক করে 'কি যেন' দেয়া হচ্ছে।

যথাক্রমে আমিও পেয়ে গেলাম সেই 'কি যেন'। একটি প্যাকেটে উপহার সামগ্রী, সাথে ১৯৮৫ সনের একটি মনোরম ক্যালেন্ডার। ঘরে এসে প্যাকেট খুলে পেলাম দুটি দ্রব্য। বৃটিশ বহুজাতিক ফাইসন্স ওষুধ কোম্পানী ডাক্তারদের উপহার হিসেবে দিয়েছেন তাদের প্রডাক্টস-এর দুটি স্যাম্পল আইটেম, একটি 'পেপস ফ্লোরাইড টুথপেস্ট,' অন্যটি 'পেপ্স এন্টিসেপটিক মাউথ ওয়াস'। বেশ অভিনব কায়দা এদের সন্দেহ নেই।

পেপস এন্টিসেপটিক মাউথ ওয়াসের বোতলের বাইরের কার্টুনে দেখা যায় নীলাভ সাগরের বুকে সফেন ঢেউয়ের নাচানাচি। উদার আকর্ষণ সৃষ্টি করে বৈকি। কার্টুনের চারিদিকে গভীর নীল দিয়ে ইংরেজীতে লেখা প্রায় প্রতিটি ছত্রেই মিথ্যাচার। ঘুষ, দুর্নীতির সমাজে বসবাস করে এসব সহনীয় হয়ে গেছে। তবু চমকে উঠলাম দাম দেখে—কি আশ্চর্য এক গ্লাসের চেয়ে কম পানির দাম পনের টাকা! এক গ্লাসে সাধারণতঃ ২০০ মিলিলিটার ধরে। আর এই পেপস এন্টিসেপটিক মাউথ ওয়াসের পুরো বোতলের পানির পরিমাণ মাত্র ১৭০ মিলিলিটার—অথচ মূল্য পনের টাকা। এই বোতলের কাঁচামালের মূল্যের কথায় পরে আসছি।

প্রকৃতি প্রদত্ত বিনে পয়সায় পানির প্রতি ছোট গ্লাস সুচতুর বিপণনের মাধ্যমে পনের টাকায় বিক্রি করছে বলেই সাগরের ঢেউয়ের মাথায় কেন, এঁদো গলির নোংরা ড্রেনের পানিতেও নির্বিবাদে ফাইসন্স কর্মকর্তারা নাচতে পারছেন।

কিন্তু জাতীয় ওষুধনীতি প্রবর্তিত হবার পর এতো হবার কথা নয়। ক্ষতিকর এবং অকেজো ওষুধের হাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষার উদ্দেশ্যেই তো জাতীয় ওষুধ নীতির প্রবর্তন। অ-ওষুধকে ওষুধ হিসেবে ধাপ্পা দিয়ে দিয়ে চালাতে চাইলে তা তো ওষুধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৮২ অনুযায়ী পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড ও এক লাখ টাকা জরিমানা সমেত দণ্ডনীয় অপরাধ। যথার্থ মানের অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের মূল্য কমিয়ে জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে পেঁছে দেওয়া ছিল জাতীয় ওষুধনীতির মৌল উদ্দেশ্য।

কিছু কিছু ওষুধের মূল্য কমেও ছিল। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওষুধ কোম্পানীগুলো সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রধান আমলার বদান্যতার কারণে সরকার ও জনসাধারণকে প্রতারিত করছে। উক্ত ভদ্রলোকের সাথে বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানীগুলোর হৃদ্যতা দীর্ঘদিনের। তদোপরি তার ভাই ও অন্যান্য আত্মীয়ের 'নাম মালিকানাধীনে' রয়েছে বাংলাদেশের বড় বড় কতক আয়ুর্বেদীয় কোম্পানী। তার মদতের কারণেই অনেক ওষুধ কোম্পানী ওষুধের মূল্য না কমিয়ে সরকারী নীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠী দেখাচ্ছে। স্বাস্থ্য বিভাগের আমলাদের নিষ্ক্রিয়তার দরুন জাতীয় ওষুধ-নীতির সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে জনসাধারণ। লাভবান হচ্ছে ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও কতক মধ্যস্বত্বভোগী বড় বড় ওষুধের দোকানদাররা। ইংরেজী নামধারী বাংলাদেশের কতক দেশী কোম্পানী আমলাদের সহায়তায় বিভিন্ন এন্টিবায়োটিকের মূল্য নির্ধারণ করিয়েছে অনেক বেশী দরে। অতিরিক্ত লাভের একটা বড় অংশ তারা 'বোনসের' মাধ্যমে ভাগ করে দেয় বড় বড় দোকানদারকে। এসব বিদেশী নামের দেশী ওষুধ প্রস্তুতকারকরা ভিটামিন ও এন্টাসিডের বিক্রী বাড়ানোর জন্য প্রতি ৫০ কার্টুনে ১০ থেকে ২২ (বাইশ) কার্টুন পর্যন্ত বোনাস দিয়ে থাকেন। যে ভিটামিনের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (MRP) ২০ পয়সার বেশী হওয়া উচিত নয়, তার খুচরা মূল্য নির্ধারণ করিয়েছে ৫০ পয়সা থেকে এক টাকা পর্যন্ত। এন্টাসিডের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। ফলে ঠগ-লাভের কিছু বাটোয়ারা বোনাসের মাধ্যমে অন্যদের দেওয়াতো সোজা। বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানীগুলো এই ধরনের ব্যবসাই করছে—ওষুধের দাম কমাচ্ছে না, বোনাস বাড়াচ্ছে।

এসব খবর ওষুধ প্রশাসন পরিদপ্তরের কর্মকর্তা জানেন। কিন্তু ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠার চেয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আমলার মাসতুতো ভাই হওয়াই তিনি পছন্দ করেন।

মাউথ ওয়াস কি ?

মূল কথায় ফিরে যাওয়া যাক। মাউথ ওয়াস কাকে বলে ? কোথায় এর ব্যবহার ? কিভাবে এটি দেহযন্ত্রে কাজ করে ? মাউথ ওয়াসের প্রয়োজনীয়তাই বা কি ? এ সম্পর্কে সবাইকে বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞান দেওয়া প্রয়োজন। কারণ ওষুধ খাদ্য নয়, সখের কোন কসমেটিকও নয়। ওষুধ ব্যবহৃত হয় রোগের প্রতিকারে, প্রতিরোধে। মাউথ ওয়াস সে পর্যায়ে পড়ে কিনা বিচার করা প্রয়োজন। এর ব্যবহার যথাযথ না হলে নতুন একটি রোগ হয়ে যেতে পারে, অথবা রোগ প্রক্রিয়ায় বিরূপ ঘটনা ঘটতে পারে। সংগত কারণেই এর অনুসন্ধানের জন্য দৃষ্টিক্ষেপ করতে হয় জাতীয় ওষুধ-নীতির প্রতি। সে নীতিতে দেখতে পাওয়া যায় বাতিলকৃত কিছু দন্ত রোগের ওষুধ-সামগ্রী ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয়। এর সাথে মাউথ ওয়াসও আছে। প্রসংগক্রমে উল্লেখ্য ওষুধনীতি কেবল বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ নয়। এ সুপারিশ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞ দলেরও, যেখানে মনগড়া কোন বক্তব্য দেয়া যায় না। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আনা হয়।

মাউথ ওয়াসের সংজ্ঞা কি? আমেরিকান ডেন্টাল এসোসিয়েশনের কাউন্সিল অব ডেন্টাল থেরাপিউটিকসের ৪২ জন বিশেষজ্ঞের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'একসেপটেড ডেন্টাল থেরাপিউটিকস—ADT (Accepted Dental Therapeutics)-এর উনচল্লিশতম সংস্করণে মাউথ ওয়াশ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। কুলকুচি বা কুলির জন্য ব্যবহৃত সুগন্ধিযুক্ত পানির নামই 'মাউথ ওয়াস' বা কুলকুচির পানি। তবে সাধারণ জনগণ এবং কতক দন্ত ও সাধারণ চিকিৎসক (জেনারেল প্র্যাকটিশনার্সদের) মনে একটা অস্বচ্ছ ধারণা রয়েছে যে মুখের ঝিল্লির (Mucous Membrane) রোগে ও মুখগহ্বর পরিষ্কার করার ওষুধের নামই 'মাউথ ওয়াস'। এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা।

যদি বা কতক চিকিৎসক দন্তক্ষয় রোধের উদ্দেশ্যে 'মাউথ ওয়াস' বা কুলকুচির পানির সাথে মিশ্রিত করে 'ফ্লোরাইড' সরবরাহ করার নিষ্ফল চেষ্টা করেছেন, তবু এটা নিঃশংসয়ে বলা যাবে যে, অধিকাংশ মাউথ ওয়াস মুখ গহ্বরে মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য সুগন্ধিভাব সৃষ্টি করে—'Most mouthwashes are undoubtedly used for cosmetic purpuse……"
(ADT পৃষ্ঠা ৩৭৩)।

কখনো কখনো মুখ গহ্বরে শল্য চিকিৎসা করার পর মাউথ ওয়াস ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং এক্ষেত্রেও মাউথ ওয়াসের ব্যবহার খুবই সীমিত। এক্ষেত্রে মাউথ ওয়াস রোগীর মুখে একটা শীতল কিন্তু সতেজভাব দিয়ে থাকে মাত্র। তাৎক্ষণিক প্রদাহজনিত উপসর্গে শতকরা দুইভাগ সোডিয়াম বাইকারবোনেটের দ্রবণ অথবা ঈষৎ উষ্ণ হাবপারটোনিক সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ ব্যবহারযোগ্য। কুলির পানি, যার ইংরেজী নাম মাউথ ওয়াস তাকে জীবাণুনাশক শক্তি দেবার জন্য ওতে এন্টিসেপটিক ৩·২% ক্লোরহেক্সাডিন গ্লুকানেট যোগ করেও দেখা হয়েছে। তাতে লাভ কিছু হয়নি, তবে এক সপ্তাহ ব্যবহারের ফলে জিহ্বা ও দাঁতের রঙ হয়েছে ফ্যাকাশে এবং কতক ক্ষেত্রে মুখেও সৃষ্টি হয়েছে ঘা। মাউথ ওয়াসে জীবাণুনাশক উপাদান ব্যবহার করার কোন যুক্তি নেই। টেস্টটিউবে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি পরিবেশে জীবাণুনাশকের কার্যকারিতা কখনও মুখ গহ্বরের সত্যিকার জীবাণু পরিবেশে প্রমাণিত হয়নি। মুখ গহ্বরের জীবাণু ধ্বংস করতে মাউথ ওয়াস কোন ক্রিয়া করে না।

ডেন্টাল কাউন্সিল এই মর্মে মন্তব্য রাখেন যে ঃ

(ক) চমকদার বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে মুখ গহ্বরের কোন নির্দিষ্ট রোগে বাজারজাত মাউথ ওয়াস ব্যবস্থা পত্রে লিখবার পূর্বে এর কার্যকারিতা সম্পর্কিত ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ফল অবশ্যই দেখে নিতে হবে।

(খ) সঠিক উপায়ে দাঁত ব্রাস করার পরও যদি মুখে দুর্গন্ধ থাকে তবে আপনাকে দুর্গন্ধ হবার আসল কারণ বের করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে মাউথ ওয়াস ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষেধ। কারণ মাউথ ওয়াশ মুখের দুর্গন্ধ কমাতে পারে, এটা

সত্যের অপলাপ মাত্র। মাউথ ওয়াস মুখগহবরের রোগ না সারিয়ে রোগের কারণটিকে ঢেকে রাখে।

মনে রাখতে হবে যে মাড়ির গোড়ায় জমে থাকা পাথরের কারণে অথবা দেহযন্ত্রের অন্য কোন রোগে মুখে দুর্গন্ধ হতে পারে। এবং এ অবস্থায় বার বার মাউথ ওয়াস ব্যবহার করে মুখ দুর্গন্ধমুক্ত করলেও আসল রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।

(গ) মুখ গহবরের 'স্বাভাবিক বসবাসকারী' (Resident Flora) জীবাণু ধ্বংস করলেই যে উপকার পাওয়া যাবে তার কোন পর্যাপ্ত প্রমাণ নেই—"There is no adequate evidence that the average person benefits by a non-specific change in the oral flora." (ADT, পৃষ্ঠা ৪৭৪)

(ঘ) মুখের রোগ সৃষ্টিতে মুখের স্বাভাবিক বসবাসকারী জীবাণুদের ভূমিকা এখনও অনিশ্চিত। তাই 'কাউন্সিল অব ডেন্টাল থেরাপিউটিকস' মাউথ ওয়াস ব্যবহারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। এর ব্যবহার সম্পর্কে ডাক্তারের অথবা স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ নিতে জনসাধারণকে উপদেশ দিয়েছেন।

এন্টিসেপটিক মাউথ ওয়াস

বাজারে বহু মাউথ ওয়াস বা 'বোতলজাত কুলির পানি' আছে—বহুজাতিক ফাইসন্স, আধা দেশী আধা পাকিস্তানী গ্যাকো, বাংলাদেশী গংগা এবং আরও অনেক কোম্পানীর।

তবে বাজারে সচরাচর যে মাউথ ওয়াসটি দেখা যায় সেটি হলো পেপ্স এন্টিসেপটিক মাউথ ওয়াস। মাউথ ওয়াস এখন সর্বত্র দেখি। যেমন দেখা যায় বেদনানাশক বড়ির নিরাময়ের ক্ষমতা। ফাইসন্সের এ দাবীর ভিত্তি কি? এবং এ ডিসপিরিন। মনোহরি দোকান, কনফেকশনারী এবং ওষুধের দোকানসহ অনেক জায়গায়ই পেপস এন্টিসেপটিক মাউথ ওয়াসের বোতল দর্শনীয়। আগেই বলেছি পেপস মাউথ ওয়াস উৎপাদন করছেন বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানী ফাইসন্স এবং মাউথ ওয়াস বাজারজাত করে এর প্রচার বিজ্ঞাপনে বহু গুণগান গেয়েছেন। আসুন আমরা একটু তলিয়ে দেখি এসব কি। প্রতারণায় এরাই সবার শীর্ষে, অন্যরা ছিঁচকে চোর মাত্র।

সাক্ষাৎকার

আমাদের প্রতিনিধি ও ওষুধ প্রশাসন পরিদপ্তরের পরিচালক ডঃ জাহাঙ্গীর ও তার জনৈক সহকর্মীর সাথে সাক্ষাত করলে তারা নিম্নলিখিত তথ্য প্রকাশ করেন—

(১) ফাইসন্স বা অন্য কোন কোম্পানী এন্টিসেপটিক মাউথ ওয়াস উৎপাদনের জন্য ওষুধ-প্রশাসনের অনুমতি নেয়নি।

(২) অনুমোদন ছাড়া কোন ওষুধ বাজারজাত করা হলে ওষুধ প্রশাসন কি করে থাকে, এ প্রশ্নের উত্তরে তারা সুস্পষ্ট জবাব দেননি।

(৩) ওষুধের মূল্য নির্ধারণের বিষয়টি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে দেখে থাকেন। তবে এ ব্যাপারে ওষুধ প্রশাসনের ক্ষমতা সম্পর্কিত প্রশ্নটিও তারা এড়িয়ে যান।

(৪) পেপস সহ পত্রিকায় হাজারো বিজ্ঞাপন যেন তাদের নজরেই পড়েনি। এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন, সে প্রশ্নও তারা এড়িয়ে যান। তবে খাদ্যজাত দ্রব্য ও প্রসাধনীর উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের তারা পক্ষে।

এন্টিসেপটিক কাকে বলে? এন্টিসেপটিক একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ যা শরীরের জীবাণু ধ্বংস করে বা জীবাণুর সংখ্যা কমিয়ে প্রদাহের ক্ষতিকর দিকসমূহকে প্রতিহত বা সীমাবদ্ধ রাখে—'Chemical agent which destroys or inhibits micro-organisms on living tissue having the effect of limiting or preventing the harmful results of infection.'

'ডিসইনফেকটেন্ট' এন্টিসেপটিকের সমার্থক শব্দ। ডিসইনফেকটেন্ট বা এন্টি-সেপটিক দিয়ে সব ধরনের জীবাণু মারা বা প্রতিহত করা সম্ভব নয়। কোন কিছুকে সর্ব প্রকার জীবাণুমুক্ত করতে হলে 'স্টেরিলাইজেশন' পদ্ধতির সাহায্য নিতে হবে। স্টেরিলাইজেশন একটি বিশেষ ধরনের পদ্ধতি যা কতক রাসায়নিক দ্রব্য বা উষ্ণ তাপমাত্রার মাধ্যমে স্পোরসহ সর্বপ্রকার জীবাণু ধ্বংস করে থাকে। এ সবের কার্যকারিতা রাসায়নিক দ্রব্যাদির ঘনত্ব (Concentration), তাপমাত্রা এবং সময়ের উপর নির্ভরশীল। এন্টিসেপটিক পদার্থের ঘনত্ব বেশী (High concentration) হলে জীবাণু রোধ বা জীবাণু ধ্বংস হবে এবং অপরপক্ষে ঘনত্ব খুব কম (Very low concentration) হলে, জীবাণু প্রতিহতকরণ তো দূরে থাক বরঞ্চ জীবাণুর বংশবৃদ্ধি হতে পারে, অর্থাৎ কম মাত্রার, কম ঘনত্বের এন্টিসেপটিক দ্বারা ভালোর চেয়ে ক্ষতিই বেশী হবে।

চামড়া বা শরীরের অভ্যন্তরে ব্যবহৃত এন্টিসেপটিকের বিশোষণ (Absorption) ও কার্যকারিতা অনিয়মিত এবং প্রায়শঃ অনিশ্চিত—"Substances applied topically to skin or mucous membranes are absorbed irregularly and often un-predictably."

চামড়া বা ঝিল্লীতে ব্যবহার্য অধিকাংশ এন্টিসেপটিক ক্ষত নিরাময়ে সাহায্য না করে বরঞ্চ ক্ষত নিরাময় প্রক্রিয়া বিলম্বিত করে। সাধারণত সাবান এবং পানি দিয়ে ক্ষতের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এন্টিসেপটিকের চেয়ে অধিক কার্যকর এবং কম ক্ষতিকর —"In general, cleansing of abrasions and superficial wounds by washing with soap and water is far more effective and less damaging than the application of topical antiseptics.'

আরও উল্লেখযোগ্য যে, বিভিন্ন ধরনের জীবাণুনাশক, যা প্রথম ২৪ ঘন্টায় জীবাণু রোধে কার্যকর, তা পরবর্তী দিনসমূহে সমান কার্যকর নয়। এবং ৭ দিনে

কার্যকারিতা এত কমে যে, কতক জীবাণুনাশকে জীবাণুর পরিমাণ কয়েক সহস্রগুণ বৃদ্ধি পায়—'......that their effectiveness diminished after 7 days storage, small numbers of organisms which survived in some disinfectants multiplied to more than 10^9 per ml in 5 or 6 day.'

ফরমালডিহাইড, ফিনাইল ও ক্লোরিন গোত্রভুক্ত রাসায়নিক পদার্থসমূহ, হেক্সাক্লোরোফেন ক্লোরহেক্সিডিন, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড, সেট্রিমাইড প্রভৃতি এন্টিসেপটিক/ডিসইনফেকটেন্ট সম্প্রদায়ভুক্ত।

সেট্রিমাইড দেখতে দুধ-সাদা এবং এতে সাবানের গন্ধ ও স্বাদ রয়েছে। এটা নাকে বা মুখে ব্যবহার বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ এর দ্বারা ঝিল্লীতে জ্বালাযন্ত্রণা সৃষ্টি হয় এবং সেট্রিমাইডের মাত্রা ও ঘনত্ব বেশী হলে খাদ্যনালী (ইসোফেগাস) জ্বলে পুড়ে যেতে পারে। অনেক সময় শ্বাসনালীর মাংসপেশীসমূহে এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে অবশ করে দেয়। জরায়ুর ভিতরে ব্যবহৃত হলে রক্তের বিনাস (Haemolysis) ঘটে। বারে বারে ব্যবহারে এলার্জির (Hypersensitivity) ঘটনাও অজ্ঞাত নয়।

যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্তকরণ এবং শরীরের বাহ্যিক আবরণের জীবাণুর সংখ্যা হ্রাসের জন্যই মূলত সেট্রিমাইড ব্যবহৃত হয়। ০.৫%—১% ঘনত্বের সেট্রিমাইডে একঘন্টা চুবিয়ে রাখলে পলিইথিলিন টিউব, ক্যাথেটার প্রভৃতি জীবাণুমুক্ত হয়।

অন্ততপক্ষে দুই মিনিট ধরে ১% সেট্রিমাইড দিয়ে হাত ধুলে, হাতের জীবাণুর পরিমাণ ৫৫% কমে যায়। তাই বাংলাদেশের বাজারের বহুল প্রচলিত এন্টিসেপটিক জি-এন্টিসেপটিক ও সেভলনে ৩% সেট্রিমাইড এবং ১.৫% ক্লোরহেক্সাডিনের সংমিশ্রণ রয়েছে।

মদেরও জীবাণুধ্বংসী ক্ষমতা রয়েছে। তবে মদের জীবাণুধ্বংসী ক্ষমতা কার্যকর করতে হলে মদের ঘনত্ব ৬০%—৯৫% হওয়া বাঞ্ছনীয়। 'It (alcohol) has a bactericidal action against most vegetative organisms at concentrations between 60% and 95%, but it is not effective against bacterial spores. A concentration usually 70% w/v is employed either alone or containing chlorhexidine or Iodine for the disinfection of the skin in preparation for injection, venepuncture or Surgical procedures." এবং সিরিঞ্জ ইত্যাদির বিশুদ্ধকরণের চেষ্টায় মদ ব্যবহার অনুচিত।

ফাইসন্স সম্প্রতি কুলকুচির পানি বোতলে ভরে বাজারজাত করেছে। এই বিশেষ পানির নাম পেপস এন্টিসেপটিক মাউথ ওয়াস—এর ব্যবহার নির্দেশ ও বিধিতে বলা হয়েছে, পেপস এন্টিসেপটিক মাউথ ওয়াস মুখ পরিষ্কার রাখে এবং সতেজ শ্বাস-প্রশ্বাসে মুখ ভরিয়ে দেয়। কোম্পানীর পরামর্শ মুখ ও গলগহ্বরে যেসব খাদ্যকণা থেকে যায় সেগুলো ব্রাস দিয়ে সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করা যায় না। মাউথ ওয়াস সেগুলোকে পরিষ্কার করে এবং জীবাণুঘটিত পচন প্রক্রিয়ার কারণে মুখে যে দুর্গন্ধ হয় তা দূর করে।

মাউথ ওয়াসের জীবাণুনাশক প্রক্রিয়া জীবাণুকে ধ্বংস করে এবং মুখকে সতেজ ও পরিষ্কার রাখে।

প্রতিদিন সকালে ও রাত্তে গরম পানিতে মিশিয়ে চা চামচের দুই চামচ মাউথ ওয়াস দিয়ে মুখ কুলি করতে হবে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়টি হলো— কোম্পানী তাদের মাউথ ওয়াসটিকে শ্রেণীভুক্ত করেছেন এন্টিসেপটিক গ্রুপে।

অন্যভাবে বলা চলে যে, বহুজাতিক ফাইসন্স দাবী করছে যে, তাদের বাজারজাত বোতলে ভর্তি কুলকুচি বা কুলির পানি পেপস মাউথ ওয়াসের রয়েছে এন্টিসেপটিক ক্ষমতা; যেমন থাকে অনেক ভুঁইফোর পীরের রোগ নিরাময়ের। ফাইসন্সের এই দাবীর ভিত্তি কি? এবং এই দাবীর যৌক্তিকতা কতটুকু বা তাদের দাবী কি বৈজ্ঞানিক তথ্য দ্বারা প্রমাণিত? নাকি ইলি লিলির 'অপরেন' কাহিনী'র মতই সাধারণ শিক্ষিত মানুষের পকেট সাফ করে দেবার জন্যে ফাইসন্সের ঘরে তৈরী একটি সুচতুর গালগল্প মাত্র? নাকি শুধু ভাওতা দেবার জন্যেই 'এন্টিসেপটিক' শব্দটির ব্যবহার? শব্দটি ব্যবহার করে সাধারণ পানির কলের পানিকে ওষুধে পরিণত করেনি তো? বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা যাক।

পেপস এন্টিসেপটিক মাউথ ওয়াস কি এন্টিসেপটিক না মদ?

পেপস এন্টিসেপটিক মাউথ ওয়াসে কি আছে? পেপস এন্টিসেপটিক মাউথ ওয়াসের উপাদান কি? কার্টুনের গায়েই এ সম্পর্কে একটা পরিষ্কার বক্তব্য আছে। সাহেবের কোম্পানী সাহেবের ভাষায় ঝকঝকে তকতকে ইংরেজী অক্ষরে, ইংরেজ কোম্পানীর খেদমতগার কালো ম্যানেজার পরিচ্ছন্নভাবে 'প্রধান উপাদানসমূহ' শিরোনামে লিখে দিয়েছেন ভেতরে একই কথা লেখা আছে। কার্টুনটা খুলে বোতল হাতে নিলেই দেখা যাবে নীলাভ তরল পদার্থ এবং বোতলের গায়ে সেটে দেওয়া আছে নীলাভ লেবেল, তাতেও পরিষ্কারভাবে নীলরঙের কালিতে ঐ কথা লেখা আছে।

সাহেব যখন মিথ্যে কথা বলে তখন সুন্দরভাবে সাহসের সাথে মিথ্যে কথা বলে। মিথ্যে কথা বাঙালীকে দিয়েই বলায়, কিন্তু অন্য ভেতো বাঙালীদের মত কাঁপতে কাঁপতে নয়। হাজার হোক সাহেবের ট্রেনিং-এর গুণ আছে তো? এবং বাঙালী নিমকহারাম নয়। বহুজাতিক কোম্পানীরা যখন মিথ্যে কথা বলে তখন জোরে শোরেই বলে, তাতে বাঙ্গালী ভয়ও পায় এবং শ্রদ্ধায় মাথাও অবনত করে তাড়াতাড়ি। মরেও ম্যাকলে সাহেব বেঁচে আছেন। তাই তো সাহেব কোম্পানীর মান নিয়ন্ত্রণের সব যন্ত্রপাতি না থাকলেও শিক্ষিত বাঙ্গালীও সাদা মানুষের ভয়ে সমস্ত অশিক্ষিত মানুষের মত মনে করেন সাহেব কোম্পানীর এন্টিবায়োটিকই সবচেয়ে ভাল। হাজার হলেও সাহেবের দাদাই তো এন্টিবায়োটিকের গবেষণাটা করেছিল। বহুজাতিক কোম্পানীরা আমাদের চরিত্রের এ দিকটার খবর রাখে এবং রাখে বলেই হুংকার দিয়ে বড় গলায় মিথ্যে কথা বলে এবং মিথ্যে বলে পার পায়।

মিথ্যে বলে ধরা পড়লে বিপদে পড়ে ছোট দেশী কোম্পানীরা। বিদেশী কোম্পানীদের ভয়ের কোন কারণ নেই। তাদের মিথ্যে ধরা পড়ে গেলে তাদের পক্ষে ওকালতি করার জন্য তো ইলি লিলির বেতনভোগী অধ্যাপক উইলোবি'র মত বহুজাতিকের বেতনভোগী বা অন্যভাবে অনুগ্রহপুষ্ট দু'একজন উচ্চপদস্থ আমলা স্বাস্থ্য-মন্ত্রণালয় ও ওষুধ প্রশাসন পরিদপ্তরে রয়েছেই। ভয়টা কোথায় ?

তাই সরবে মিথ্যে কথা বলছে বহুজাতিক ফাইসন্স। সাহসের সাথে ফাইসন্স তার পেপস এণ্টিসেপটিক মাউথ ওয়াসের মূল উপাদানের নামই গোপন করেছে। ফাইসন্সের বোতলজাত কুলির পানির গালভরা নাম পেপস এণ্টিসেপটিক মাউথ ওয়াস—তার মূল উপাদানই হচ্ছে ঢাকা ওয়াসার টঙ্গীস্থ পানির ট্যাংক থেকে সরবরাহকৃত নির্ভেজাল পানি। অবশ্য পানিটা ভালভাবে ছেঁকে নেওয়া, তাই 'পেপস কুলির পানি'র বোতলে দৃশ্যত কোন ময়লা নেই। 'পেপস এন্টিসেপটিক মাউথ ওয়াসের' মূল উপাদান পানি, ওয়সার পানি কিন্তু পরিশ্রুত। তারা ভূগর্ভস্থ অন্য পানি ব্যবহার করে কিনা তা আমাদের জানা নেই। পেপস বোতলের ১৭০ মিলিলিটারের তরল পদার্থের মধ্যে ১৫০'৫ মিলিলিটারই হচ্ছে পরিষ্কার পানি অর্থাৎ শতকরা ৮৮'৫ ভাগই পানি।

'পেপস কুলির পানি' কি কেবল পানি, না এটা ওষুধ ? এ সম্পর্কে বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানী ফাইসন্স (বাংলাদেশ) লিমিটেডের বক্তব্য পরিষ্কার—পেপস এন্টিসেপটিক মাউথ ওয়াস মুখে কুলকুচি করার এণ্টিসেপটিক ওষুধ। ওষুধ বলেই ওষুধ কোম্পানী ফাইসন্স (বাংলাদেশ) লিমিটেড এটা তৈরী করছে। এবং অসতর্ক মুহূর্তে একটি সত্য কথা বলেছে—ফাইসন্সের টয়লেট্রিজ ডিভিশন বলে কিছু নেই, এটা খাতা-কলমের ব্যাপার মাত্র। টয়লেট্রিজ বিভাগের আলাদা কোন কারখানা নেই। ফাইসন্স যে মেশিনে ওষুধ তৈরী করে, সেই একই মেশিনে কসমেটিকস্ বা টয়লেট্রিজ তৈরী করে। বোতলের গায়ে উৎপাদনের তারিখ কিংবা ব্যবহারের মেয়াদের শেষ তারিখের উল্লেখ নেই। এবার আসা যাক, পেপস এণ্টিসেপটিক মাউথ ওয়াসের বিভিন্ন উপাদানের বিশ্লেষণে। দেখা যাক, এর এন্টিসেপটিক ক্ষমতা কতদূর।

ফাইসন্সের ঘোষণা অনুসারে তাদের বোতলজাত কুলির পানির মূল এন্টিসেপটিক পদার্থ হচ্ছে সেট্রিমাইড। কি পরিমাণে, কি মাত্রায় সেট্রিমাইড বোতলে আছে তার কোন উল্লেখ কার্টুনে বা বোতলের গায়ে নেই। মজার বিষয় হচ্ছে, ওষুধ কোম্পানী মুখের ওষুধ (!!) তৈরী করেছে, অথচ এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের ওষুধ প্রশাসন পরিদপ্তরে কোন তথ্যই নেই (৯৮ পৃষ্ঠার সাক্ষাৎকারের বয়ান দ্রঃ)। ওষুধ প্রশাসন পরিদপ্তরের কর্মকর্তা বলতেই পারলেন না এতে কি পরিমাণ সেট্রিমাইড আছে। তাদের কাছে কোন নথি নেই, তাই কোন হিসেবও নেই। ফাইসন্স ওষুধ কোম্পানী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ওষুধ প্রশাসন পরিদপ্তরের অনুমতি না নিয়েই

নাকি 'পেপস এন্টিসেপটিক কুলির পানি' তৈরী ও বাজারজাত করছে। বিদেশী কোম্পানীর দুঃসাহস তো বাংলাদেশ সরকারকে অস্বীকারের সামিল।

পেপস এন্টিসেপটিক কুলকুচির পানির বোতলে মোট কতটুকু সেট্রিমাইড আছে, তা জানার পূর্বে এটাও জেনে নেওয়া প্রয়োজন যে, সেট্রিমাইডের কার্যকারিতা তার Dilution এর উপরও নির্ভর করে। 'পেপস কুলকুচির পানি' কোন Dilution-এ ব্যবহার করতে হবে তার উল্লেখ ব্যবহার বিধিতে নেই—

''বড় দুচামচ অনুপাতে পেপস কুলকুচির পানি কতক ('a little') মৃদু গরম পানির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে কুলকুচি বা কুলি করতে হবে, নিয়মিতভাবে সকালে এবং সন্ধ্যায়।" কোন্ মাত্রায় কতটুকু মৃদু গরম পানির সাথে 'পেপস কুলির পানি' মিশাতে হবে, তার উল্লেখ নেই কেন? ব্যাপারটা কি? এটা কি অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি না ইচ্ছাকৃত?

ফাইসন্স তার বাংলাদেশস্থ ফ্যাক্টরীতে প্রস্তুত 'পেপস' কুলকুচির পানির বোতলে সেট্রিমাইড মিশায়। পৃথিবীর অন্য কোথাও অন্য কোন ওষুধ কোম্পানী কর্তৃক মুখের ভেতরে ব্যবহার্য পানিতে সেট্রিমাইড মিশানোর সংবাদ আমাদের জানা নেই। বলাবাহুল্য বৃটিশ বহুজাতিক ফাইসন্সের পিতৃদেশ বৃটেনে সেট্রিমাইড মিশ্রিত তথাকথিত এন্টিসেপটিক (?) কুলির পানি বোতলজাত করে বাজারজাত করার দুঃসাহস করে না। বাংলাদেশের মানুষ তো তাদের হিসেবে মানুষ নয়—বহুজাতিক কোম্পানীর পকেট ভরে দেবার জন্তুমাত্র।

সেট্রিমাইডের ব্যবহার বাহ্যিক ত্বকে, চামড়ার ক্ষতে, মুখ বা নাকের ভেতর নয়। একক সেট্রিমাইড ব্যবহার করলে, সেট্রিমাইডের ঘনত্ব (Concentration) ১% হওয়া বাঞ্ছনীয়। ১% থেকে ৩% সেট্রিমাইড ব্যবহৃত হয় চুলের স্যাম্পু ও ত্বকের পাঁচড়া পরিষ্কারের জন্য। আরও স্মর্তব্য যে ১% সেট্রিমাইড দুই মিনিট ধরে ব্যবহারের পরও জীবাণুর সংখ্যা হ্রাসের পরিমাণ ৫৫% মাত্র। সেট্রিমাইডের এসিড ফাষ্ট বেকটেরিয়া (যথা যক্ষ্মা, কুষ্ঠ রোগ) ভাইরাস, ফাংগাস, বেকটেরিয়াল স্পোর, গ্রাম নেগেটিভ জীবাণু প্রভৃতির উপর কোনরূপ কার্যকারিতা নেই।

পুরো বোতলের 'পেপস এন্টিসেপটিক মাউথ ওয়াস' বা পেপস কুলকুচির সমস্ত তরল পদার্থ একবারে একত্রে ব্যবহারও মুখ ও অন্ত্রীর রোগের ক্ষতিকর জীবাণু সিডোমোনাসকে (Pseudomonas) ধ্বংস করা দূরে থাকুক, সিডোমোনাসের বংশ-বৃদ্ধিও রহিত করতে পারেনি। মুখের জীবাণু কেনডিডা এলবিকেনস (Candida Albicans) এর উপরও কার্যকর নয়।

মুখের অভ্যস্থ অন্যান্য জীবাণুর সংখ্যা রোধেও 'পেপস কুলির পানি'র কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়নি। পেপস কুলকুচির পানির ধ্বজভংগের মূল কারণ হলো এতে যে সেট্রিমাইড রয়েছে তা অত্যন্ত নগন্য মাত্রায় রয়েছে। "পেপস এন্টিসেপটিক মাউথ ওয়াসে সেট্রিমাইডের মাত্রা হলো মাত্র ০.০২% অর্থাৎ ১৭০ মিলিলিটার পেপস এন্টি-সেপটিক মাউথ ওয়াসে রয়েছে মাত্র ৩৪ (চৌত্রিশ) মিলিগ্রাম সেট্রিমাইড যা অনেকে

খালি চোখে নাও দেখতে পারেন। এবং তাই পেপস এন্টিসেপটিক মাউথ ওয়াসের কোন এন্টিসেপটিক বা জীবাণু বিমুক্তিকরণের ক্ষমতা নেই।

সেট্রিমাইড ছাড়া পেপস কুলির পানিতে আর কি আছে? আছে ক্লোরোফরম। এখানে ক্লোরোফরমের কাজ কি? এবং ক্লোরোফরমটা কি জিনিস? ক্লোরোফরম শরীরের চেতনা বোধ রহিতকরণের জন্য অতীতে ব্যবহৃত একপ্রকার এনাসথেটিক। এটার গন্ধ কড়া এবং মিষ্টি, কিন্তু নেশার জ্বালা স্বাদ রয়েছে। 0·৫% ঘনত্বে ক্লোরোফরম স্বল্পসংখ্যক ষ্টাফাইলোকক্কাস, ই. কোলাই ও সিডোমোনাস জীবাণু ধ্বংসকরণে সক্ষম। তবে ক্লোরোফরম চামড়া ও মুখের ঝিল্লীর (Mucous Membrane) জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর, এমনকি চামড়া ও মুখের অভ্যন্তরে ত্বক পুড়িয়েও দিতে পারে। ক্লোরোফরম লিভার ও কিডনীর জন্য ক্ষতিকর এবং শ্বাসপ্রশ্বাস ও রক্তচাপ হ্রাস করে—"Chloroform is hepatotoxic and nephrotoxic. It depresses respiration and produces hypotension." এছাড়াও প্রমাণ রয়েছে যে ক্লোরোফরম প্রাণীতে ক্যান্সার সৃষ্টি করে। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, এফডিএ (খাদ্য ও ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ) ওষুধ ও কসমেটিকসে ক্লোরোফরমের সর্বপ্রকার ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন দীর্ঘকাল ধরে।

১৯৭৮ সনে প্রকাশিত বৃটিশ সরকারের কৃষি, মৎস্য ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টে "Report on the review of solvents in food" এ উল্লেখিত হয়েছে যে, ক্লোরোফরম ব্যবহারে মানুষের বিশেষ কোন সুবিধে নেই অথচ এর ক্ষতিকর দিক রয়েছে অনেক বেশী এবং অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অন্য রাসায়নিক দ্রব্য রয়েছে। সেহেতু খাদ্য, ওষুধ ও কসমেটিকসে এর ব্যবহারের কোন বিজ্ঞানসম্মত কারণ নেই। ১৯৮০ সন থেকে একমাত্র "সীমাবদ্ধ এনাসথেসিয়া" (Limited Anaesthesia) ছাড়া কোনরূপ ওষুধ বা খাদ্যে ক্লোরোফরমের ব্যবহার বৃটেনে নিষিদ্ধ হয়েছে।

একই বক্তব্য লিপিবদ্ধ হয়েছে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার "সম্মিলিত খাদ্য কৃষি সংস্থা" (FAO) এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) বিশেষজ্ঞ কমিটির তেইশতম রিপোর্টে। উক্ত তথ্য ১৯৮০ সনে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার টেকনিকেল রিপোর্ট নম্বর ৬৪৮ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে।

এসব তথ্য বহুজাতিক ফাইসন্সের জানা থাকা সত্ত্বেও ফাইসন্স তাদের বোতলজাত পেপস কুলির পানিতে ক্লোরোফরম ব্যবহার করেছে কেন? পেপস কুলির পানিতে কেবলমাত্র একটা ঝাঁঝালো মিন্ট গন্ধ দেবার জন্য ফাইসন্স ক্যান্সার উৎপাদক ক্লোরোফরম ব্যবহার করেছে এটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় নাকি? ফাইসন্স বাংলাদেশের জনসাধারণের অজ্ঞতা ও সচেতনতার অভাবের সুযোগ নিয়ে নতুন করে রোগ সৃষ্টি করছে না তো? উল্লেখযোগ্য যে, ফাইসন্স একমাত্র বৃটিশ বহুজাতিক কোম্পানী যে এদেশে আমদানী করে ক্যান্সারের ওষুধ এবং তা বাজারজাত করে থাকে।

পেপস কুলির পানিতে সেট্রিমাইড ও ক্লোরোফরম ছাড়া রয়েছে কিছু পেপারমেন্ট

অয়েল ও অয়েল অব এনিথি। উভয়ই একটি বিশেষ ধরনের তেল (Essential Oil) যা সহজে উড়ে যায় এবং মূলত মদে দ্রবীভূত থাকে। দুটো তেল মুখের ঝিল্লীতে সামান্য জ্বালা সৃষ্টি করে। বিভিন্ন স্বাস্থ্য সাময়িকীতে এ জাতীয় তেলের বাষ্পে ১২ ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত ইঁদুরদের অর্ধেক মারা যাবার তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। তবে সুখের বিষয় যে, মানুষের ক্ষেত্রে এ জাতীয় ঘটনা ঘটেনি। গন্ধ ও রঙ দেবার কারণেই সম্ভবত এই দুটো তেল পেপস কুলির পানিতে ব্যবহৃত হয়েছে। অয়েল অব এনিথি অতীতে পেটের অসুখ ও কফের জন্য কতক লোকে ব্যবহার করতো। বিজ্ঞানে এর কার্যকারিতা স্বীকৃত নয়।

পেপারমেণ্ট তেল পুদীনা বংশজাত। এতে মেনথল রয়েছে বলে গন্ধটা কড়া ও ঝাঁঝালো এবং এটা পানিতে সবুজ-হলদে আবির সৃষ্টি করে।

পেপারমেণ্ট এলার্জি সৃষ্টি করতে পারে এবং "দীর্ঘ নিয়মিত" ব্যবহারে হৃদ গতি দ্রুততর (Idiopathic Auricular Fibrillation) হতে পারে! পেপারমেণ্ট তেলের দরুন মাংসপেশীতে হঠাৎ ব্যথা সৃষ্টির রিপোর্ট ও চিকিৎসা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে।

পেপস কুলকুচির পানির ব্যবহারকারীদের ধূসর মনকে একটু রাঙিয়ে তৈলাক্ত করে দেবার উদ্দেশ্যেই সম্ভবত এই দুটো তেল পেপস কুলির পানিতে ব্যবহৃত হয়েছে। এ দুটো তেল ছাড়া পেপস এণ্টিসেপটিক (!) মাউথ ওয়াসে আরও একটি উপাদান আছে। সেটার নাম রেক্‌টিফাইড স্পিরিট—সোজা বাংলায় মদ। কুলির পানিতে মদ কেন? মদ সংযোগের কারণ একটি এবং একটি মাত্র—নেশা ধরানো। পেপস মাউথ ওয়াসে কতটুকু মদ আছে? অনেক, অনেক বেশী পরিমাণেই আছে—যে মাত্রা বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় ওষুধ নীতিতে নিষিদ্ধ সেই মাত্রার মদ আছে পেপস এণ্টিসেপটিক (হা! হা!) মাউথ ওয়াসে। জাতীয় ওষুধ নীতিতে ওষুধ সংরক্ষণের কারণে ওষুধে মদ ব্যবহারের অনুমতি আছে, তবে তার পরিমাণ অবশ্যই ৫% এর কম হতে হবে। পেপস কুলকুচির পানিতে অর্থাৎ পেপস এন্টিসেপটিক মাউথ ওয়াসে কতটুকু মদ আছে? পাঠক, চমকাবেন না—এতে মদ আছে ১১.৪%। বিয়ারে থাকে ৩-৫% মাত্র।

কুলকুচির পানির দাম পনের টাকা

অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির মূল্য নির্ধারণের জন্য সরকারী নির্ধারিত নীতিমালা রয়েছে। ওষুধের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (Maximum Retail Price—MRP) নির্ধারণ এই আইনের আওতায় পড়ে। ওষুধ প্রশাসন পরিদপ্তরের পরামর্শক্রমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ওষুধের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণ করে থাকেন। পেপস কুলকুচির পানি বহুজাতিক ফাইসন্স কোম্পানীর ভাষ্য অনুসারে মুখের ভেতরে ব্যবহার্য একটি এন্টিসেপটিক ওষুধ। ওষুধ বিধায় মন্ত্রণালয় এর মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং ফাইসন্স কোম্পানী তা অত্যন্ত সততার সাথে MRP Tk. 15.00—(সর্বোচ্চ

খুচরা মূল্য পনের টাকা) মুদ্রিত করে দিয়েছে। কোথাও কোন ফাঁক নেই, পরিষ্কার ব্যবসা।

ওষুধের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণের নিয়মটা কি? একটা সহজ ফর্মুলার ভিত্তিতে এটা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে দেয় সর্বপ্রকার ট্যাক্স, ডিউটি এবং বন্দর থেকে ফ্যাক্টরীর দরজা পর্যন্ত কাঁচামাল ও প্যাকিং দ্রব্যাদির আনা বাবদ খরচ এবং কাঁচামাল ও প্যাকিং দ্রব্যাদির আমদানীকৃত মূল্য সমেত প্রতি ইউনিটের যা খরচ হবে, তার দ্বিগুণ হবে প্রতি ইউনিট ওষুধের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য।

জাতীয় ওষুধনীতির বিশেষজ্ঞ কমিটি অবশ্য সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতিটা পরিবর্তনের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করেছিলেন। সরকার সেটা গ্রহণও করেছিলেন, দুর্ভাগ্যবশত তা এখনও কার্যকর হয়নি।

বিশেষজ্ঞ কমিটি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে, বহু কোম্পানী কেবলমাত্র ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি লক্ষ্যে অধিকতর লাভের জন্য অপ্রয়োজনেও অতিরিক্ত লেবেল, প্যাকিং ইত্যাদি যোগ করে। তাই বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ ছিল নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে ওষুধের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণ—

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য MRP = (ক × ২) + খ

১) ক = সর্বপ্রকার খরচসহ কাঁচামালের মূল্য।

খ = প্যাকিং দ্রব্যাদির সব ট্যাক্স সমেত মূল্য।

২) প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে—(ক + খ) × ২ = সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (MRP)।

বিষয়টা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে উৎসাহী পাঠকদের গণপ্রকাশনী প্রকাশিত 'প্রয়োজনীয় ওষুধ' (মূল্য বার টাকা) বইটি পড়তে অনুরোধ করি।

প্রচলিত পদ্ধতিতেই হিসেব করা যাক, পেপস এন্টিসেপটিক মাউথ ওয়াসের উপাদানগুলোর মূল্য কত দাঁড়ায়—

উপাদান	%হিসেবে উপাদানের পরিমাণ	প্রতি ১৭০ মিলিলিটারের বোতলে মোট উপাদানের পরিমাণ	সর্বপ্রকার ট্যাক্স সমেত প্রতি কিলোগ্রাম কাঁচামালের বর্তমান বাজার মূল্য (টাকায়)	প্রতি বোতলে ব্যবহৃত মোট উপাদানের মূল্য (পয়সায়)
সেট্রিমাইড	0·02%	৩৪ মিলিগ্রাম	২৩৫ টাকা	0·৮
ক্লোরোরিফম সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমাণ	0·02%	৩৪ মিলিগ্রাম	৬৬০ টাকা	২·২
পেপারমেন্ট অয়েল (তেল)	,, 0·0১%	১৭ মিলিগ্রাম	৪৪০ টাকা	0·৭
অয়েল অব এনিথি	,, 0,0১%	১৭ মিলিগ্রাম	৫৫৬ টাকা	0·৯
			মোট	৪·৬

মোট মূল্য চার দশমিক ছয় পয়সা। সোজা কথায় সাড়ে চার পয়সা।

মাত্র সাড়ে চার পয়সা ? কোন উপাদানের মূল্য হিসেব থেকে বাদ পড়েনি তো ? না, বাদ পড়েনি। অবশ্যি আপনি যদি মদকে ওষুধ মনে করেন, তবে সেটা ভিন্ন কথা। মদ মদই। মদ নেশার বস্তু, মদ ওষুধ নয়। কুলকুচির পানি পেপস এন্টিসেপটিক মাউথ ওয়াসে মদের পরিমাণ হচ্ছে ১১.৪%। আরো পরিষ্কারভাবে বলা যায় ১৭০ মিলিলিটারের ১৯.৩৮ মিলিলিটার অর্থাৎ চার চামচ মদ, যার বাজার মূল্য প্রায় এক টাকা। মাতাল ছাড়া কুলি করার জন্য এক টাকার মদ কেউ পনের টাকায় কিনবে না। আপনিই সিদ্ধান্ত নিন, আপনি কোন দলে ?

আগেই বলেছি, কুলকুচির পানি পেপস এন্টিসেপটিক মাউথ ওয়াসের জীবাণু-ধ্বংসী ক্ষমতা নেই বললেই চলে। ক্ষতিকর রোগজীবাণু সিডোমোনাস অরিজিনাসা'র উপর পরীক্ষার ফলাফল—সর্বনিম্ন ২০% (v/v) তরলকৃত দ্রবণের সিডোমোনাস অরিজিনাসাকে ধ্বংস করার ক্ষমতা প্রায় শূন্য।

জীবাণুর নাম	A_1 B_1 C_1	A_2 B_2 C_2	A_3 B_3 C_3	মন্তব্য
সিডোমোনাস অরিজিনাসা	+ + +	+ + +	+ + +	কোন কার্যকরী ক্ষমতা নেই

বিশ্লেষণ : A = ১০০% তরলকৃত দ্রবণ অর্থাৎ এক চামচ পেপস এন্টিসেপটিক মাউথ ওয়াসের সাথে এক চামচ স্টেরাইল (সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত) পানির মিশ্রণ।

B = ৫০% তরলকৃত দ্রবণ

C = ২০% তরলকৃত দ্রবণ

A, B এবং C দ্রবণে যথাক্রমে ০, ১০ এবং ২০ মিনিটের সময়ের জন্য ১ মিলিলিটার ২৪ ঘন্টাকালের কালচার যোগ করা হয়েছে এবং A_1, A_2, A_3, ইত্যাদি যথাক্রমে প্রতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংযোজিত জীবাণু ধ্বংস করার ক্ষমতা আছে কিনা তার ফলাফল।

(+) = পর্যাপ্ত জীবাণুর বহাল তবিয়তে অবস্থান।

ঠগের প্রসারে গণমাধ্যম (Mass Media)

সাড়ে চার পয়সার জিনিস পনের টাকায় বিক্রী হয় কেন ? মূলত সরকারী আমলাদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, কতক চিকিৎসকের অজ্ঞতা, জনসাধারণের অসচেতনতা ও গণমাধ্যমে ঢালাও বিজ্ঞাপনের কারণে। ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, তা সর্বজনস্বীকৃত। টিনের দুধ অনেক ক্ষেত্রে শিশুর মৃত্যুর কারণও বটে। তবু এসবের ঢালাও বিজ্ঞাপন প্রচারিত হচ্ছে সরকারী গণমাধ্যম রেডিও বাংলাদেশের বিজ্ঞাপন তরঙ্গমালা অনুষ্ঠানে, এমনকি বাংলাদেশ টেলিভিশনেও। সরকারী প্রতিষ্ঠান জীবন

বীমা করপোরেশন টেলিভিশনে তার নিজস্ব বিজ্ঞাপনে নিজ খরচে প্রচার করছে বাংলাদেশ টোব্যাকো কোম্পানীর সিগারেটের প্রাণঢালা বিজ্ঞাপন। লক্ষ্য করলে দেখবেন, বীমাকৃত বৃদ্ধলোক মনের আনন্দে ফুঁকছেন সিগারেট। যে মধুতে মধু নেই, সেই মধুর বিজ্ঞাপন প্রতিদিনই প্রদর্শিত হচ্ছে বাংলাদেশ টেলিভিশনের পর্দায়। অথচ বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ ক্ষতিকর ওষুধ এবং ওষুধের নামে মদ, ওষুধের মাধ্যমে আফিম বিক্রী (মাসিক গণস্বাস্থ্যের প্রচ্ছদ ঃ আফিম খাইয়ে একশত কোটি, এ দুর্গ ভাংগতে হবে, ফ্লোরাইডে দাঁত রক্ষা না দাঁত ক্ষয় প্রভৃতি বিজ্ঞাপন প্রদর্শনে অস্বীকৃতি জানান। বাংলাদেশ টেলিভিশনে যে সমস্ত শরবত কসমেটিকস, ঘামাচির পাউডারের বিজ্ঞাপন মিনিটের পর মিনিট প্রদর্শিত হয় তার কোনটিই বিজ্ঞান মোতাবেক পরীক্ষিত নয়। সরকারী প্রচার যন্ত্রে উপরোক্ত বিজ্ঞাপন সমূহ প্রদর্শিত হবার কারণে জনসাধারণ সহজেই প্রতারিত হচ্ছে। স্মর্তব্য ঃ বিজ্ঞাপনের খরচ তো দ্রব্যমূল্যের সাথেই যুক্ত হয় এবং মুনাফা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে।

প্রতারণাই জ্যোতিষী ব্যবসার ভিত্তি, এটা কে না জানে? তবু জ্যোতিষীদের বিজ্ঞাপন প্রতিদিনই জাতীয় দৈনিকের পাতায় প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের ভিত্তিতে রচিত "সব জ্যোতিষ ভুয়া" শিরোনামে যে প্রতিবেদন মাসিক গণস্বাস্থ্যে প্রকাশিত হয়, পর পর দু'দিন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবার পর অজ্ঞাত কারণে তৃতীয় দিনে উক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশে একটি দৈনিক অসম্মতি জানান।

সম্প্রতি বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানীর প্রচার প্রবন্ধকারে প্রকাশিত হয়েছে নিখরচায় দৈনিক বাংলাদেশ অবজার্ভারের পাতায়। একইভাবে বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানীর সুচতুর প্রচারণা 'Smoker need more Vitamin-C' প্রকাশিত হয়েছে বহুজাতিকদের মদতপুষ্ট ইংরেজী 'পালস' পত্রিকায়। বাংলাদেশের অনেক শিক্ষিত লোকই ইংরেজীতে প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রতি সশ্রদ্ধভাব পোষণ করেন বলেই বহুজাতিক এবং তাদের কিছু ক্রীড়নক দেশী ওষুধ কোম্পানীরা ইংরেজীতে সব বিজ্ঞাপন ও পুস্তিকাদি প্রকাশ করে থাকে এবং এন্টাসিডের (Antacid) এর বানান Entacyd/ Antacyd লিখে তৃপ্তি পেয়ে থাকে। সাবাস খেদমতগার।

এসব বিজ্ঞাপন কি স্বাস্থ্যসচিব বা পরিচালক, ওষুধ প্রশাসন পরিদপ্তরের নজরে পড়ে না? না, এসবে তাঁদের মাথা ব্যথা নেই। তাঁদের গাত্রদাহ 'সবার জন্য স্বাস্থ্যে'র বিজ্ঞাপন ও কার্যক্রমে। একটা বিষয় পরিষ্কারভাবে পরিস্ফুটিত যে, বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সচেতনতা সৃষ্টি এবং তাদের স্বার্থসংরক্ষণই 'সবার জন্য স্বাস্থ্য'র লক্ষ্য। স্বভাবত প্রত্যাশা ছিল, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সার্বিকভাবে 'সবার জন্য স্বাস্থ্যে'র কার্যক্রমকে সমর্থন ও সাহায্য করবেন। কার্যত ঘটছে উল্টো, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কতক কর্মকর্তা 'সবার জন্য স্বাস্থ্যে'র প্রতি অত্যন্ত বিরূপ এবং এর কার্যক্রম বন্ধ করার অজুহাত সৃষ্টির জন্য পাঁয়তারা ভাজছে। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, কতক আমলাদের মাধ্যমে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি এবং সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিকদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে। এই চক্র অত্যন্ত অশুভ। একমাত্র জনগণের সচেতনতায় ও সংগ্রামে এই অশুভ শক্তি পরাভূত হবে। এবং তখন আর সাড়ে চার পয়সার ওষুধ পনের টাকায় বিক্রি করার জন্যে আগ বাড়িয়ে থাকা বীরপুরুষদের খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তথ্যসূত্র ঃ

—Accepted Dental Therapeutics, 39th Edition, 1982, American Dental Association. USA.

—Basic and Clinical Pharmacology by B. G. Katzung, 2nd Edition, 1984 Lange Medical Publications, USA.

—Current Medical Diagnons and Treatment by M A Krupp, M. J. Chatton and D Werdegar, 24th Edition, 1985 Lange Medical Publications, USA.

—Martindale : The Extra Pharmacopoeia, 28th Edition, 1982, The Pharmaceutical Press, London.

—Twenty-Third Report of Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, Technical Report Series, No, 648, WHO 1980.

—Report on the Review of Solvents in food, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, HMSO, London, 1971.

—Remington's Pharmaceutical Sciences, 16th Edition 1980, Editor : Arthur Osol Mack Publishing Co, U.K,

—বৃটিশ ডেন্টাল ও ফার্মাসিউটিকেল জার্নালের বিবিধ সংখ্যা।

প্রসাধনীক সৌন্দর্য চর্চায় বিষধর সাপ

ডঃ জীবেন রায়

আধুনিক রূপচর্চা

চোখে কাজল, ওপরের পাতায় আই শ্যাডো এবং চকচকে ভেজলিন, ভুরুতে আঁকা চিকন রেখা। দু'গালে ফাউণ্ডেশনের ওপর ব্লাশারের আভা, তার ওপর আবার পাউডারের প্রলেপ, ঠোঁটে রঙিন লিপষ্টিক, তার ওপর লিপ গ্লস লিপষ্টিকের জৌলুস আরো বাড়াবার জন্য। সেই সাথে রয়েছে হেয়ার ষ্টাইলিং, শ্যাম্প, পার্মিং, ডাইয়িং, উইগ সেটিং, তেমনি আছে হাত পা নখের ওপর রঙের ঘষামাজা। সর্বোপরি ওডি-কোলন বা পারফিউমের সুশীতল মাখামাখি।

অনেকের কাছে ওপরের কিছু কিছু শব্দ লাতিন বা হিব্রু বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আজকাল বঙ্গ ললনারা এই শব্দগুলোর অনায়াস চর্চা করেন—অবশ্য চর্চাটা বিদ্যার নয়, মুখ মণ্ডলের ওপর দিয়েই যায়। ওপরের বর্ণনাতেই সুস্পষ্ট যে একটি মুখে সাজাতে রীতিমত যজ্ঞের আয়োজন করতে হয়। সৌন্দর্য পিপাসু মানুষ সৌন্দর্যের সোনার হরিণের পেছনে ধাওয়া করবেন—এতে নতুন কিছু নেই। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছেন প্রসাধনীক সৌন্দর্য চর্চায় সৌন্দর্য বৃদ্ধি কতটুকু আর সময় ও অর্থের অপচয়ই বা কতটুকু? কিংবা প্রকৃতিদত্ত সৌন্দর্যের ক্ষতি সাধনাই বা কতটুকু।

প্রসাধনীক সৌন্দর্যকে সুন্দর বলা হয়—তেমন নীতি বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতাতেও বিবেচ্য বিষয় নয়। প্রকৃতিদত্ত পরিবেশ বিনষ্ট করার পরিণাম আমরা ইতিমধ্যে টের পাচ্ছি পরিবেশবিদদের চিৎকারে। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং প্রকৃতিকে প্রাকৃতিক নিয়মেই চলতে দেয়া উচিত—এটাই আজ বিজ্ঞান-সম্মত। রূপচর্চার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। শিশির ভেজা প্রাক সকাল কার না ভালো লাগে? কাগজের ফুল বা প্লাষ্টিকের তৈরী ফুলগাছ থেকে ঘরের আঙ্গিনায় সতেজ বেলী ফুলটা অনেক বেশী কাম্য। সে যাই হোক, কবিতা বা সাহিত্যের প্রসঙ্গ টেনে সৌন্দর্য বিশ্লেষণ আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এই লেখা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সৌন্দর্য চর্চায় ব্যবহৃত আধুনিক প্রসাধন সামগ্রীর মূল্যায়নের প্রয়াস।

প্রসাধনী কি ?

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা অনুযায়ী যে সকল দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহারে সাধারণভাবে মানবিক চেহারাকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে সেগুলোকেই প্রসাধনী আখ্যা দেয়া হয়েছে। আমেরিকার ফুড, ড্রাগ এবং কসমেটিকস্-এর আওতায় সাবানকে ধরা হয়নি। আবার এন্টিডান্ড্রাপ অর্থাৎ মাথার খুশকিরোধক শ্যাম্পুকে কসমিটিকস-এর আওতায় না রেখে ওষুধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ওষুধ (ড্রাগ) এবং কসমেটিকস এর মাঝে প্রধান পার্থক্য হলো ঃ ড্রাগ বাজারজাত করার আগে এর নিরাপত্তা এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে পরীক্ষিত প্রমাণ প্রয়োজন, কিন্তু কসমেটিকস্-এর বেলায় বাজারজাতকরণের পূর্বে পরীক্ষিত প্রমাণের প্রয়োজন নেই। সেইজন্য কসমেটিকস বা প্রসাধনীর বাজার প্রধানত নির্ভর করে চমকপ্রদ, চোখ ধাঁধানো ও উত্তেজক বিজ্ঞাপনের ওপর। ইদানিং অধিকতর ব্যবসায়িক লক্ষ্যে ওষুধের বিজ্ঞাপনে নারীর শারীরকে যথেচ্ছভাবে দেখানোর প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

প্রসাধনীক রূপচর্চার ইতিহাস

রূপসাধনা নারীত্বের ভূষণ। বলা যেতে পারে, প্রাচীন কাল থেকেই নারী এই রূপসাধনায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছে। রূপ সাধনায় ব্যবহৃত উপাদান বদলেছে কিন্তু লক্ষ্য রয়ে গেছে অভিন্ন। সেই প্রাচীন যুগে মানুষ প্রকৃতি থেকে আহরিত পদার্থ দিয়ে নিজেদের চেহারাকে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করত। প্রায় ৫০০০ বছর আগে মিশরিয়রা গুড়ো এন্টিমনি এবং তামার আকরিক—সবুজ ম্যালাকাইট চোখের কাজল হিসেবে ব্যবহার করত। তাছাড়া নানাবিধ পারফিউম ও চুলের জন্য সুগন্ধময় তেলের ব্যবহার মিশরেই প্রথম শুরু হয়। এক সময়কার (খ্রীষ্ট পূর্ব ১৩৫০ সালে) মিশরের অধিপতি টুটানখামেন-এর সৌধে সুগন্ধদানীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া প্রসাধন ব্যবহারে ক্লিওপেট্রা ছিলেন অদ্বিতীয়। অন্যদিকে কথিত আছে, গ্রীক পদার্থবিদ ক্লডিয়াস গ্যালেন দ্বিতীয় শতাব্দীতে কোল্ড ক্রীম আবিষ্কার করেন। ইউরোপে আঠারশ' শতাব্দীতে মহিলারা সমগ্র মুখমন্ডলে লেড কার্বনেটের সাদা পাউডার ব্যবহার করতেন। লেড বিষাক্ততার কথা তখন তাদের জানা ছিল না—তাই লেড কার্বনেট ব্যবহারের ফলে অনেককেই মত্যুবরণ করতে হয়। অতীতে প্রসাধনীর সীমিত ব্যবহার বর্তমান বিশ্বে এমন মহামারী আকারে সংক্রামিত হয়েছে যে ভাবল অবাক হতে হয়। প্রসাধনীক উপাদান হিসেবে বর্তমানে এক হাজারেরও অধিক রাসায়নিক যৌগ ব্যবহৃত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রসাধনীর মোট বিক্রয় বছরে প্রায় ১১ বিলিয়ন ডলার। তার চাইতেও বড় কথা প্রসাধন সামগ্রীর চড়া দাম। ব্যবহৃত উপাদান গুলো যত না সস্তা—প্রসাধনী হিসেবে সেটার মূল্য ততই যেন বেশী। আর সেই জন্যই দেখতে পাই টিভি, বেতার এবং ম্যাগাজিনগুলোতে প্রসাধনী দ্রব্যের বিজ্ঞাপনের জোয়ার।

রাসায়নিক যৌগের গুণাগুণ থেকেই ওষুধের আবিষ্কার, আর ওষুধ মানেই শরীরের উপর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। রূপ চর্চায় ব্যবহৃত প্রসাধন সামগ্রীসমূহ মূলত হরেক রকমের রাসায়নিক যৌগের মিশ্রণ। ওষুধের মতই বলা যায়---এসব রাসায়নিক যৌগের শরীরের ওপর বিশেষ করে চামড়ায় কিছু না কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রয়েছে। চর্মরোগ বিশেষজ্ঞগণ তাই প্রসাধনীক রূপ চর্চার বিরুদ্ধে।

শারীরিক প্রতিক্রিয়া ছাড়াও কিছু প্রসাধনীর পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া প্রমাণ মিলেছে। এরোসোল প্রসাধনী যেমন, পারফিউম স্প্রে, চুলের স্প্রে, ফোম ইত্যাদিতে প্রপিলেন্ট হিসেবে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন ব্যবহার করা হয়। স্প্রে ব্যবহারের সময় এই নিষ্ক্রিয় গ্যাসটি বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্রমান্বয়ে স্ট্রাটোস্ফিয়ার নামক বায়ুস্তরে গিয়ে ওজোনের সাথে বিক্রিয়া করে ওজোন স্তর বিনষ্ট করে। ফলে -ভূপৃষ্ঠের অতি বেগুনী রশ্মির পরিমাণ (ওজোন সাধারণত অতি বেগুনী রশ্মির প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে থাকে) বেড়ে যায়। আর তার ফলে চামড়ার ক্যান্সারও বেড়ে যাবে।

ক্লোরোফ্লোর কার্বনের বিক্রিয়াগুলো নিম্নরূপ ঃ

$CF_2Cl_2 + UV - CF_2Cl. + Cl.$

ক্লোরোফ্লোরো কার্বন

$Cl + O_3 - ClO + O_2$ ওজোন $ClO + O - Cl. + O_2$

বর্তমানে আমেরিকাসহ বেশ কিছু পশ্চিমা দেশে তাই এরোসোল গ্যাসটির ব্যবহার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

প্রসাধনী নিয়মিত এবং অতি এবার আসা যাক শারীরিক প্রতিক্রিয়ার কথায়। মাত্রায় ব্যবহারের ফলে মূলত তিন ধরনের সংযোগ চর্ম প্রদাহ (Contact dermatitis) দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রথমত জ্বালা করা, দ্বিতীয়ত এলার্জিক প্রতিক্রিয়া এবং তৃতীয়ত আলোকে প্রতিক্রিয়াশীলতা।

আলো সংবেদনশীল রাসায়নিক যৌগসমূহ সাধারণত অতি বেগুনী রাসায়নিক রশ্মি কিম্বা দৃশ্যমান আলো কোন নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য শোষণ করে এবং ফলে যৌগটি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় যৌগটি শরীর রসায়নের সাথে বিক্রিয়া করতে পারে আবার অন্যভাবে তার শক্তি অন্য অণুতে পৌঁছে দিয়ে ফটোসেন্সিটাইজার হিসেবে কাজ করতে পারে। আলো ঘটিত এলার্জিক বিক্রিয়ার প্রধানত আলো শক্তি রাসায়নিক দ্রব্যের পরিবর্তন এবং চামড়ার প্রোটিনের পরিবর্তন ঘটিয়ে একটি এন্টিজেন তৈরী করে।

রোদ্রালোক→ আলো সংবেদনশীল→ উদ্দীপ্ত অণু
↓
রাসায়নিক যৌগের অণু ↙ শক্তি সরবরাহ অন্য অণু
চামড়ায় প্রতিক্রিয়া→ সরাসরি

তার ফলে একজিমা, আরটিকেরিয়া, রোদে পোড়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিতে পারে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় ছকাকারে প্রসাধনীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদান ও তাদের প্রতিক্রিয়া উল্লেখিত হলো।

প্রসাধনী	উপাদান	প্রতিক্রিয়া		আলোকে প্রতিক্রিয়াশীলতা
		জ্বালাকারী	এলার্জি	
লিপস্টিক	ইওসিন			+
	এজোডাই	+	+	
	লেনোলিন			
আই শ্যাডো	এজোডাই	+		
মাসকারা	এজোডাই		+	
	কোলোকোনি			
নখের পালিশ	ফরমালডিহাইড প্লাস্টিক			চোখের পাতায় ইরিথেমা ও ইডিম। এলার্জিরূপে দেখা দিতে পারে।

পারফিউম

প্রসাধনীর মাঝে আলোকে সব চাইতে বেশী প্রতিক্রিয়াশীল পদার্থ হচ্ছে পারফিউম। বাণিজ্যিক পারফিউমগুলো কমপক্ষে কুড়িটি বিভিন্ন উপাদান নিয়ে গঠিত। এদের মাঝে রয়েছে এসেনসিয়েল তেলের মিশ্রণ এবং কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষিত রাসায়নিক যৌগ। প্রকৃতপক্ষে সুগন্ধটা নির্ধারণ করা হয় উদ্বায়ী যৌগের মিশ্রণ দিয়ে। উদ্বায়ী যৌগসমূহ যাতে সহজে উবে যেতে না পারে সে জন্য কিছু কিছু আঠালো জিনিস (Fixative) যেমন—বালসাম, বেনজাইল, বেনজয়েট এবং বেনজাইল স্যালিসাইলেট ইত্যাদি যুক্ত করা হয়। এসেনসিয়েল তেল এবং ফিক্সেটিভ দুটোই আলোকে খুবই প্রতিক্রিয়াশীল। ফলে ব্যবহৃত স্থানে একজিমা এবং ইরিথেমা (Erythema) ও শোথ (ইডিমা) দেখা দিতে পারে। পারফিউম ব্যবহারে আরো ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হলো বারলক চর্ম প্রদাহ (Berlock dermatitis)। পারফিউম এবং অডি কোলনে ৮-মিথোক্সিসোরালেন নামে একটি রাসায়নিক যৌগ থাকে যা সূর্যালোকের উপস্থিতিতে শরীরের ব্যবহৃত স্থানে বাদামী থেকে কালচে রং (Melanogenesis) তৈরী করে।

ছক—১ ঃ প্রসাধনীতে ব্যবহৃত উপাদান ও তাদের প্রতিক্রিয়া

প্রসাধনী	উপাদান	প্রতিক্রিয়া		আলোকে প্রতিক্রিয়াশীলতা
		জ্বালাকারী	এলার্জি	
পারফিউম	এসেনসিয়েল বারগামট তেল			ফটোপিগমেনটেশন
	ফিক্সেটিভস			
	বালসামস		+	
	বেনজাইল বেনজয়েট	+	+	
	বেনজাইল স্যালিসাইলেট	+		
চুলের প্রসাধনী ঃ				
চুলের রং	প্যারা ফিনাইলিন ডাইঅ্যামিন		+	
	প্যারা টলুইন ডাইঅ্যামিন		+	
শ্যাম্পু	এন্টিমাইক্রোবিয়েল যৌগ	কখনও কখনও জ্বালাকারী		
	এজোডাই			
চুলের ক্রীম	লেনোলিন প্যারাবেন	+	+	+
মুখের প্রসাধনী ঃ				
ক্রীম	পারফিউম		+	
	এজোডাই	+		
	লেনোলিন		+	
	প্যারাবেন			+
পাউডার	এজোডাই		+	
রুজ	এজোডাই		+	

চুলের প্রসাধনী

চুল সম্পর্কিত প্রসাধনী সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে হেয়ার ডাই, বিরঞ্জক, ক্রীম, শ্যাম্পু ইত্যাদি। হেয়ার বা চুলে কলপ দেবার জন্য যে দ্রবণ ব্যবহার করা হয় রাসায়নিক যৌগ হিসেবে সেগুলো হলো—প্যারাফিনাইলিন ডাই-অ্যামিন, রিসরসিনল অথবা অর্থো-নাইট্রো-প্যারা-ফিনাইলিন ডাই-অ্যামিন বা প্যারাটলুইস ডাই-অ্যামিন। এগুলো সবই আলোকে প্রতিক্রিয়াশীল। ফলে ব্যবহারে চামড়ায় মারাত্মক একজিমা দেখা দিতে পারে।

কিছু কিছু চুল বিরঞ্জকে এমোনিয়াম পারসালফেট ব্যবহার করা হয়—যার ফলে সংযোগ আরটিকেরিয়া (Contact Urticaria) দেখা দিতে পারে।

চোখের প্রসাধনী সুরমায় বিষাক্ত ধাতু

চোখের পাতা অংকনের (Eyeliner) একটি ঐতিহ্যবাহী এবং জনপ্রিয় উপাদান হচ্ছে সুরমা। এশিয়া, আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ব্যবহৃত এই সুরমায় দূষণ মাত্রায় (Toxic level) সীসা রয়েছে বলে জানা যায়। সুরমা ভারত, বাংলাদেশ এবং বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলিম মেয়েদের প্রিয় প্রসাধনী। এমনকি, শিশুদের চোখেও সুরমা লাগান হয় এই বিশ্বাসে যে, এর কিছু ঔষধীয় গুণ আছে।

ভারত বাংলাদেশ এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলিম মহিলাগণ কর্তৃক ব্যবহৃত এই সুরমায় এমন মাত্রায় সীসার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেছে যা এর ব্যবহারকারীদের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে, চোখের চূড়ান্ত ক্ষতি হবার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না।

চোখের সৌন্দর্য বৃদ্ধির উপকরণ হিসেবে সুরমা বহুকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মহিলাদের এটি একটা প্রিয় প্রসাধনী। শিশু এবং ছোট ছেলেমেয়েদের চোখে এটা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। মায়েরা বিশ্বাস করেন সুরমা চোখে লাগালে সন্তানদের প্রতি অশুভ দৃকপাত হবে না। তারা আরো বিশ্বাস করেন সুরমাতে রয়েছে চোখ শীতলীকরণ উপাদান ও ঔষধীয় গুণ।

মালয়েশিয়ায় মুসলিম মেয়েরা নিয়মিতভাবেই সুরমা ব্যবহার করেন। সুরমা ব্যবহারের ব্যাপকতা লক্ষ্য করে কনজুমারস এসোসিয়েশন অব পেনাং (ক্যাপ) তিনটি ব্র্যাণ্ডের সুরমা পরীক্ষা করে তাতে মালয়েশিয়ার অনুমোদিত মাত্রার তুলনায় ১২,০০০ থেকে ১৮,০০০ গুণ অধিক সীসার উপস্থিতি লক্ষ্য করেন। মালয়েশীয়-সরকার প্রসাধন দ্রব্যে সর্বোচ্চ ৩০ পিপিএম (পার্ট পার মিলিয়ন) সীসা অনুমোদন করেন।

পরীক্ষিত একটি ব্র্যাণ্ডের সুরমায় ৫৩৭,১২০ পিপিএম (পার্ট'স পার মিলিয়ন) অথবা ৫৪% সীসা পাওয়া যায়। এটা ছিল অনুমোদিত মাত্রার তুলনায় ১৮,০০০ গুণ অধিক। অন্য আর একটি ব্র্যাণ্ড পাওয়া যায় ৪৮৬,৭৫০ পিপিএম সীসা অথবা নিরাপদ মাত্রার ১৬,০০০ গুণ অধিক। তৃতীয় ব্র্যাণ্ডে পাওয়া যায় ৩৮১,৬৮০ পিপিএম সীসা। অথবা নিরাপদ মাত্রার ১৩,০০০ গুণ অধিক।

এসব পরীক্ষার ফলাফল স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলে মালয়েশিয়ার ভোক্তারা (Consumer) হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। ২৩ বৎসর বয়স্কা একজন মুসলিম মহিলা, রাবিয়া, যিনি বেশ কিছুকাল থেকেই সুরমা ব্যবহার করে আসছিলেন তিনি বলেন, "আমার বাসার সবাই এটা ব্যবহার করে। আমাদের জানা ছিল না যে এটা ক্ষতিকর হতে পারে। আমি সব সময় বিশ্বাস করে এসেছি যে, এটা চোখ পরিষ্কার করে এবং চোখকে ঔজ্জ্বল্য দান করে।"

সুরমা ব্যবহারকারী আর একজন মহিলা। ভি ম্যাগসওয়ারী সুরমাতে মাত্রাতিরিক্ত সীসা থাকার সংবাদে ভয় পেয়ে যান। তিনি বলেন, 'চোখে সুরমা লাগান একটা ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি এটা অশুভকে দূর করে। আমিও দেখেছি এটা আমাকে বেশ ঝরঝরে রাখে। সুরমা চোখে না দিলে আমি অস্বস্তি বোধ করি, আমাকে ঘুমকাতর দেখায়।'

মালয়েশিয়ায় যে সুরমা পাওয়া যায় তা আমদানী করা হয় ভারত থেকে। একই সুরমা মালয়েশিয়া আবার বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করে।

কনজুমারস এসোসিয়েশন অব পেনাং-এর (ক্যাপ) পরীক্ষা ফলাফল দৃষ্টে মালয়েশিয়া সরকার নিজস্ব পরীক্ষাগারে 'ক্যাপ' কর্তৃক পরীক্ষিত সুরমার ৩টি ব্র্যাণ্ডের একটা পরীক্ষা করান এবং তাতে মাত্র ৪০৬ পি পি এম সীসার উপস্থিতি ধরা পড়ে যা 'ক্যাপ'-এর পরীক্ষিত মাত্রার তুলনায় অনেক কম। তৎসত্ত্বেও এটা ছিল অনুমোদিত মাত্রার ২০ গুণ অধিক। এমতাবস্থায় মালয়েশিয়া সরকার পরীক্ষিত ব্র্যাণ্ডের সুরমাটি নিষিদ্ধ করে মহিলাদের তা ব্যবহার না করার পরামর্শ দেন।

চোখে সুরমা ব্যবহারের ক্ষতির কথাটা বেশ কিছুকাল থেকেই জানা। ১৯৮১ সালে কুয়েতের ৮ জন লোক সীসা দূষণের কারণে হাসপাতালে ভর্তি হন। জানা যায় যে, তারা সুরমার অনুরূপ অ্যালকোহল (AlCohl) নামক এক ধরনের গ্রে আই লাইনার ব্যবহার করেছেন।

ইংল্যাণ্ডের নটিংহামে ৩ বছর বয়েসের একটি পাকিস্তানী বালিকাকে খিচুনী এবং সীসা দূষণের অন্যান্য লক্ষণসহ হাসপাতালে আনা হয়। রক্ত পরীক্ষায় নিশ্চিতভাবে ধরা পড়ে যে, নিয়মিত আইলাইনের ব্যবহারে এই দূষণ ঘটেছে। এ বইয়ের প্রথম প্রবন্ধ 'সুর্মার চোখে' দ্রষ্টব্য।

আইলাইনার (তথা সুরমা জাতীয় প্রসাধন) ব্যবহারে যেসব দূষণের ঘটনা ঘটেছে ওপরের উদাহরণগুলো তার কয়েকটি। এগুলোর ওপর সমীক্ষা করেছিলেন রসায়নবিদ মাইকেল হেলি এবং ফার্মাসিস্ট মোহাম্মদ আসলান। এদের দু'জনেরই কর্মক্ষেত্র ইংল্যাণ্ড।

মাইকেল এবং আসলান ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, সৌদ আরব, সুদান, মিসর এবং লেবাননের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী চোখের প্রসাধন (আই লাইনার) যেমন সুরমা, টাইরো এবং অ্যালকোহল পরীক্ষা করেন। পরীক্ষার ফলাফলে ধরা পড়ে যে, এগুলোর

অধিকাংশই প্রাকৃতিকভাবে পাথরে প্রাপ্ত এক ধরনের সীসা লেড সালফাইড (Lead Sulphide) অথবা গ্যালেনা (Galena) থেকে তৈরী।

আসলান ও মাইকেল বলেন, চোখে যারা সুরমা ব্যবহার করেন তারা চোখে হালকা চুলকানি (Mild irritation) অনুভব করেন এবং স্বাভাবিক কারণেই হাত দিয়ে চোখ রগড়ান। পরে হাতে লেগে থাকা সীসা আমাদের খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে।

খাদ্যের মাধ্যমে গৃহীত ঐ সীসা ক্রমে আমাদের শরীরে জমা হতে থাকে এবং এটা মস্তিষ্ক, কিডনী এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতির কারণ হয়ে খিচুনী, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া (Coma) এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে সীসার দূষণ তাদের মানসিক ধীরতার (বৈকল্যের) কারণ হতে পারে।

শুধু যে সুরমার মত ঐতিহ্যবাহী চোখের প্রসাধনীতেই সীসা রয়েছে তা নয়। পাশ্চিমী দেশসমূহ এবং জাপানে চোখের জন্য যেসব বাণিজ্যিক প্রসাধনী তৈরী হয় এবং যা আমরা প্রতিনিয়ত সৌন্দর্য বৃদ্ধির স্বার্থে ব্যবহার করে আসছি তাতেও এই বিষাক্ত ধাতুটি অবধারিতভাবেই রয়েছে। অতীতে 'ক্যাপ' (CAP) বিভিন্ন ব্র্যান্ডের আইলাইনার পরীক্ষা করে তাতে ব্যাপক পরিমাণ সীসা এবং অন্যান্য ধাতু যেমন ক্রোমিয়ামের উপস্থিতি লক্ষ্য করেন।

সুতরাং অনেক মহিলাই এখন হয়ত প্রশ্ন করবেন : চোখের জন্য নিরাপদ কোন প্রসাধনী কি পাওয়া যায় ?

শ্যাম্পু—পানির দরে নিজেই তৈরী করে নিন

চুল হলো খুব শক্ত প্রোটিন—কেরাটিন এর আঁশ। চুলের দৃশ্যমান অংশটুকু আসলে মৃত : সে জন্যেই চুল কাটলে ব্যথা লাগে না। তৈলাক্ত পদার্থ, সিবাম (Sebum) চুলকে তেল তেলে করে রাখে।

মাথা পরিষ্কার করা বা শ্যাম্পু করা মানে এই তৈলাক্ত পদার্থের এবং এর সাথে সংযুক্ত ময়লার অপসারণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে শ্যাম্পুর মাঝে মূল পরিষ্কারক বস্তুটি ছিল সাবান। সাবান মৃদু পানিতে ভালই কাজ করে কিন্তু খর পানিতে চুলের উপর একটা ফিল্ম পড়ে।

আধুনিক শ্যাম্পুতে রাসায়নিক সংশ্লেষিত ডিটারজেন্ট ব্যবহার করা হয়, যেমন —সোডিয়াম ডোডেসাইল সালফেট। এক কথায় বলা যায়, শ্যাম্পুর একমাত্র কার্যকর উপাদানটি হলো এক ধরনের ডিটারজেন্ট। পাঠকদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে—তাহলে প্রতিদিনের টিভি কিংবা ম্যাগাজিনে শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপনে এত চমক কেন ? হারবাল, এগ প্রোটিন, কিংবা হানি, লেবুর রস ইত্যাদি যত গন্ধ, বর্ণ, তরল, তেল যাই হোক না কেন—কোন কিছুই শ্যাম্পুর কার্যকারিতা মোটেই বাড়ায় না।

শ্যাম্পুর তৈরীর সহজ ফরমুলাটা দিয়ে আপনার নিজের শ্যাম্পু নিজেই বানিয়ে নিন—এবং সেই সাথে হিসেব কষে দেখুন কত অল্প খরচ।

উপাদান	পরিমাণ
ট্রাইইথানল অ্যামিন ডোডেসাইল সালফেট	৩৮ মিঃ লিঃ
সোডিয়াম এলজিনেট	২.৫ গ্রাম
ইথাইল এ্যালকোহল	১০ মিঃ লিঃ
পানি	৬২.৫ মিঃ লিঃ

আপনার শ্যাম্পুর জন্য এই ফর্মুলাই যথেষ্ট। তবে এতে যদি আপনি প্রোটিন চান, তাহলে কিছু পরিমাণ জিলাটিনের গুঁড়ো মিশিয়ে দিন, খুব সুন্দর জেল তৈরী হয়ে যাবে।

মুখমণ্ডলের ক্রীম ও পাউডার

ক্রীমে পারফিউম ছাড়াও কিছু জৈব রং (এজোডাই), লেনোলিন এবং সংরক্ষক হিসেবে প্যারাবেন ব্যবহার হয়। ক্রীমের প্রতিক্রিয়া প্রায়শই দেখতে পাওয়া যায় এবং এর প্রকৃতি জ্বালাকরা ও এলার্জিমূলক। মুখমণ্ডলে ক্রীমের প্রতিক্রিয়া অনায়াসে বুঝতে পারা যায়। খোঁচানো অনুভূতি, চুলকানি, শুষ্ক হয়ে যাওয়া থেকে ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে মারাত্মক চর্মপ্রদাহ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

মুখে ব্যবহারের জন্য যে পাউডার এবং রুজ ব্যবহার করা হয় তাতেও এজোডাই থাকে যা চুলকানি ও সংযোগে চর্মপ্রদাহ দেখা দিতে পারে।

'গায়ে মাথার কোমল পাউডারের মূল উপকরণ হচ্ছে ট্যালক (Talc)। এক জাতীয় সাদা নরম পাথরের নামই ট্যালক। পাউডার ট্যালক পাথর থেকে (অবশ্য সঙ্গে অন্যান্য উপাদানও মেশানো হয়) তৈরী হয় বলে একে ট্যালকম পাউডার বলা হয়। মূলত কোমল (নরম) পাউডার (বিশেষ করে শিশুদের জন্যে Baby & Bath powder) তৈরীতেই এই ট্যাল্ক ব্যবহার করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত এক সমীক্ষায় সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, জরায়ুর ক্যান্সারের একটি অন্যতম প্রধান কারণ এই ট্যাল্ক। যেসব মহিলা যোনির চারপাশে অথবা স্যানিটারী ন্যাপকিনের (ঋতুস্রাব তোয়ালে) ওপর এই পাউডার লাগান তাদের জরায়ুর ক্যান্সার হবার মারাত্মক ঝুঁকি থেকে যায়। ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে অবশ্য প্রথমোক্ত কারণে অথবা পোশাকের মাধ্যমে জরায়ুর ক্যান্সার হবার ঝুঁকি তেমন নেই।'

লিপস্টিক

লিপস্টিক তৈরী করা হয় প্রধানত ইওসিন (Eosin), এজোডাই, কারমাইন, লেনোলিন, অলাইল এ্যালকোহল ইত্যাদি দিয়ে। ইওসিন একটি আলোকে প্রতিক্রিয়াশীল রাসায়নিক যৌগ। এবং এর ফলে ঠোঁটে ইডিমা ও ইরিথেমা দেখা দিতে পারে।

'এর চাইতেও উদ্বেগজনক তথ্য আবিষ্কার করেছেন কনজ্যুমারস এসোসিয়েশন

অব পেনাং (CAP) তারা কয়েক ধরনের লিপস্টিক সম্পর্কে সম্প্রতি এ ধরনের সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

বিভিন্ন ব্র্যান্ডের লিপস্টিকে Rhodamine B নামক যে রং ব্যবহার করা হয় তাতে ক্যান্সার উৎপাদক এজেন্ট তো আছেই, এটি মারাত্মক এলার্জি সৃষ্টি জন্যেও দায়ী। Brilliant Blue নামক আর এক ধরনের বিষাক্ত রং লিপস্টিকে ব্যবহৃত হয়। এই রংটি চর্মের বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার সৃষ্টির সংগে জড়িত। লিপস্টিকের Erosin নামক উপকরণটি পীড়কা (Rashes) সৃষ্টির কারণ।

চুম্বন দেবার পরও ঠোঁটের লিপস্টিক যাতে স্বস্থানে থাকে, সে জন্যে এর উৎপাদকরা এমন কিছু রাসায়নিক ব্যবহার করেন যার ফলে লিপস্টিকের রং ঠোঁটের পাতলা আবরণ ভেদ করে মাংসের ভেতরে চলে যায়। এটা অবশ্যই ক্ষতিকর।[2]

নখ পালিশ

নখ পালিশের প্রধান রাসায়নিক উপাদানটি হলো ফরমালডিহাইড প্লাস্টিক এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণে নিকেল। ফরমালডিহাইড প্লাস্টিকের প্রতিক্রিয়া সাধারণত চোখের পাতায় চর্মপ্রদাহ আকারে দেখা দেয়। আবার নিকেলের উপস্থিতি অনেকের জন্য এলার্জিস্বরূপ।

অতএব...

ভেবে দেখুন, আপনার সৌন্দর্য চর্চায় প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবহার নিতান্তই কি অপরিহার্য? একজনের চোখে যা অসুন্দর অন্যজনের চোখে তাই অপূর্ব সুন্দররূপে ধরা দেয়। এক কথায় বলতে হয় যা কিছু প্রকৃতিজাত তাই সুন্দর। আর প্রাকৃতিজাত সুন্দরকে সুন্দরভাবে রাখার জন্য প্রয়োজন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা পরিচ্ছন্নতাই সৌন্দর্য চর্চার মূল কথা। সকাল সন্ধ্যায় কবোষ্ণ পানিই আপনাকে ঝরঝরে করে তুলবে। সেই সাথে পরিমিত ঘুম, নিয়মিত ব্যায়াম ও আহার আপনাকে সতেজ রাখবে। পরিচ্ছন্ন স্ত্রী-পুরুষের মানবিক শরীরজাত স্বাভাবিক গন্ধই একজন অন্যজনকে আকর্ষণ করার জন্য যথেষ্ট। কোন জন্তুর ফারোমোন বা রাসায়নিকভাবে সংশ্লেষিত যৌগ (বাজারে প্রচলিত সেক্স এপিল স্প্রে) দিয়ে আকর্ষণ বাড়ানো যায় না। তাছাড়া প্রসাধনী সম্পর্কিত খরচটা একবার তলিয়ে দেখুন। আপনি টেলিভিশনে একটা সিনেমা, নাটক বা ফুটবল খেলা দেখার আগ্রহ নিয়ে বসেছেন। সেই আপনিই অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন বিজ্ঞাপনের ঠেলায়। একবার ভেবে দেখুন এই বিজ্ঞাপনের পয়সাটা পরোক্ষভাবে আপনিই দিচ্ছেন। প্রতিটি প্রসাধনী প্রধানত কিছু রং ও গন্ধের জন্য আপনি চড়া দাম দিয়ে কিনছেন এবং সেই সাথে আপনি বিভিন্ন কোম্পানীর বিজ্ঞাপন খরচটাও দিয়ে দিচ্ছেন। আগেই বলা হয়েছে প্রসাধনীতে ব্যবহৃত কার্যকর উপাদান খুবই সস্তা। তাছাড়া সময়ে অপচয়ের কথা ভেবেছেন কি? স্বামী-স্ত্রী মিলে কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে যাবেন কিন্তু কার্যত দেখা গেল—সময়

গড়িয়ে যাচ্ছে তখনও আপনারা তৈরী হতে পারেননি। প্রসাধনীক রূপ চর্চা করতে গিয়ে স্ত্রী হয়ত একটু বেশীই সময় নিচ্ছেন। শুধু কি তাই! আপনার অত্যধিক প্রসাধনীক চেহারা দেখে অনেকের কটূক্তিও আপনার কানে আসবে। সর্বোপরি প্রসাধনী সত্যি সত্যিই কারো জন্যে বিষধর সর্পতুল্য। এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আজ চর্ম বিশেষজ্ঞগণ নিশ্চিত। এত কিছু জেনেও আপনি কি সাপের সাথে খেলায় মগ্ন থাকবেন?

সূত্র : The Third World Network Featares

১, ২ মাসিক গণস্বাস্থ্য ৩য় বর্ষ ১০ম সংখ্যা আষাঢ় ১৩৯১

সাক্ষাৎকার

প্রসাধনীর ব্যবহার সম্পর্কে আমরা কয়েকজন বিশেষজ্ঞের সংগে যোগাযোগ করে এতদ্বিষয়ক কিছু প্রশ্ন রাখি। আমাদের প্রশ্নমালার উত্তরে বক্তব্য রাখেন পিজি হাসপাতালের চর্ম বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ এম. এ ওয়াদুদ; অধ্যাপিকা ফিরোজা বেগম; প্রবীণ চর্ম তত্ত্ববিদ অধ্যাপক বাসেত এবং অধ্যাপক অমল সরকার, সলিমুল্লা মেডিকেল কলেজের ফার্মাকোলজী বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। তাঁদের বক্তব্য নিম্নে পত্রস্থ হলো :

প্রশ্ন ১। আপনি কি প্রসাধনীর (Cosmetics) ব্যবহার সমর্থন করেন?

ডাঃ এম. এ. ওয়াদুদ : প্রসাধন ব্যবহার করা যায়, তবে ব্যবহারিক নিষেধাজ্ঞা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। যাদের শরীরে এ্যালার্জির লক্ষণ থাকে তাদের জন্যে ব্যবহার ঠিক হবে না। যাদের এলার্জি নেই তারা ব্যবহার করলে ক্ষতি হবে না। আবার বেশী দিন ধরে ব্যবহার করলে অনেক দিন পরেও এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

অধ্যাপিকা ফিরোজা বেগম (ফি. বে) : আমি প্রসাধনী ব্যবহার পরোক্ষভাবে সমর্থন করি। তেল, সাবান, মেহেদী এ জাতীয় প্রসাধন সামগ্রী যেহেতু উপকারে আসে সে কারণে আমি প্রসাধন ব্যবহার সমর্থন করি।

অধ্যাপক এ. বাসেত : আমি প্রসাধনীর ব্যবহার পছন্দ করি না। যেহেতু এর মধ্যে অনেক ভেজাল আছে। এসব ভেজাল মিশ্রিত প্রসাধনী ব্যবহারে শরীরের চামড়া নষ্ট হয়ে যায়।

অধ্যাপক অমল সরকার : প্রসাধনী ব্যবহার আমি সমর্থন করি না, তার অনেকগুলো কারণ আছে। যেমন প্রসাধনী সামগ্রী অবৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈরী হয় এর কোন বিজ্ঞান ভিত্তি নেই। ফলে নানা রকম জীবাণু থাকে। প্রসাধনী ব্যবহারে চামড়ারও ক্ষতি হয়।

প্রশ্ন ২। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেন মানব শরীরে প্রসাধনী বিভিন্ন ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে শুরু করে নানান চর্মরোগও সৃষ্টি করে থাকে এ বিষয়ে আপনার কি অভিমত?

এম. এ. ওঃ চিকিৎসা শাস্ত্রে অনেক ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যাদের এ্যালার্জি আছে তাদের চর্ম রোগ দেখা দিতে পারে। এছাড়া এলার্জি ডারমাটাইটিস আমবাত (আর্টিকেরিয়া) এই রোগ যদি বেশী দিন চলতে থাকে তাহলে এর প্রতিক্রিয়া সমস্ত শরীরে দেখা দিতে পারে।

ফি. বে ঃ কথাটা আংশিক সত্য। পুরোপুরি সত্য নয়, কেননা রাতে যদি কোন মহিলা চুলে তেল ব্যবহার করেন তবে তা উপকারে আসে। আমি আগেই বলেছি, সাবান, তৈল, মেহেদী, চন্দন পাউডার ইত্যাদি প্রসাধন সামগ্রীর উপকারিতা রয়েছে।

এ. বা ঃ ক্ষতি হয়। চামড়ার ক্ষতি হয়। (ক) ইরিটেশন হয়, (খ) একজিমা হয়, (গ) সরিয়াসিস ইত্যাদি রোগ হতে পারে, (ঘ) Rash হতে পারে। এছাড়া শরীরে ইনফেকশনও হতে পারে।

অ. স. ঃ অবশ্যই বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। প্রাকৃতিকভাবে ঘাম নির্গত হয়ে শরীরের নানা রকম দূষিত পদার্থ বের হয়। কিন্তু প্রসাধনী, যেমন পাউডার ইত্যাদি ব্যবহার করলে ঘাম নির্গমন বন্ধ হয়ে গিয়ে শরীরের ক্ষতি হয়। সর্দি, কাশি, জ্বর, নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্ট, শরীরে ফোসকা পড়া ইত্যাদি রোগ হতে পারে।

প্রশ্ন ৩। বেশ কিছু কোম্পানী বিশেষভাবে শিশুদের জন্য প্রসাধনী (পাউডার, লোশন ইত্যাদি) বাজারে ছেড়েছে এগুলো শিশুদের শরীরে অদূর ভবিষ্যতে কোন বিরূপ ছাপ ফেলবে কি?

এম. এ. ও ঃ যদি সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুদের ক্ষেত্রে পাউডার জাতীয় দ্রব্য বেশী ব্যবহার করা হয় তাহলে অনেক সময় সেই পাউডার ঘামের সাথে মিশে শরীরের লোমকূপগুলো বন্ধ করে দেয়। তার ফলে ব্রণ জাতীয় রোগ দেখা দিতে পারে। যাকে বলে এ্যাকনি বা শিশু ব্রণ। অনেকে 'গরমি ঠোশা' বলেন এবং পরবর্তীতে এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় আরো দেখা দিতে পারে একজিমা।

পাঁচ বছরের ঊর্ধ্বে যাদের বয়স তাদের ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে পাউডার ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে এই পাউডার শরীরে যাতে বেশীক্ষণ না থাকে তা লক্ষ্য রাখতে হবে। বেশীক্ষণ রাখলে উল্লিখিত লক্ষণ দেখা দিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব পাউডারের ব্যবহার পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ শিশুদের শরীরের চামড়া খুবই পাতলা। সেকারণে পরবর্তীতে নানা প্রকার চর্মরোগ দেখা দিতে পারে।

ফি. বে ঃ প্রসাধন অতিরিক্ত এবং নিয়মিতভাবে ব্যবহার করলে অবশ্যই ক্ষতি

হয়। তবে শিশুরা বার বার পায়খানা করলে ক্রীম ব্যবহার করাতে ক্ষতি হয় না। এলার্জির জন্য এ্যান্টি এলার্জিক ক্রীম ব্যবহার উপকারী কিন্তু তা চিকিৎসকদের মতামত এবং ব্যবস্থাপত্রের মাধ্যমে ব্যবহার করতে হবে।

এ. বা ঃ প্রসধনীর ব্যবহার পরিত্যাগ করা ভাল। কেননা লোশন, পাউডার ব্যবহারের ফলে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। Drug Rash হতে পারে যা মানুষের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। ম্যান পাওয়ার কমে যায়।

অ. স. ঃ বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবেই। অনেকের চামড়ার রং বদলে যায়। অতিরিক্ত প্রসাধনী ব্যবহারের ফলে চর্মরোগ দেখা দিতে পারে এবং যে সমস্ত দূষিত পদার্থ নিয়মিতভাবে ঘামের সাথে শরীর থেকে বের হয় সেগুলো শরীরে থেকে গিয়ে নানা রকম অসুখ সৃষ্টি করে শরীরের ক্ষতি করে।

প্রশ্ন ৪। প্রসাধন চর্চিত মুখ-চুম্বনে যদি প্রসাধন চুর্ণ পেটে যায় তাহলে কি ধরনের ক্ষতি হতে পারে ?

এম. এ. ও ঃ মুখ চুম্বনের ফলে কিছু পরিমাণ প্রসাধন চূর্ণ (Dust) শরীরে শোষিত হয়। তবে মুখে নয়, ঠোঁটে। ফলত কিছু প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে—যেমন ঠোঁট ফোলা, ঠোঁট চুলকানো এই ধরনের লক্ষণ দেখা দিতে পারে। এ্যালার্জির ভাব দেখা দিতে পারে।

ফি বে ঃ এ জাতীয় ঘটনা ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই এবং সে কারণেই মন্তব্যও করবো না।

এ. বা ঃ প্রসাধন চর্চিত মুখ চুম্বনের ফলে সেই প্রসাধন চূর্ণ যদি পেটে যায় তাহলে ডায়রিয়া, আমাশয়, বমি, বদহজম এগুলো হতে পারে।

অ. স. ঃ নানা রকম পেটের পীড়া দেখা দিতে পারে। পেট ফাঁপা, বদহজম, ডায়রিয়া, ক্ষুধা মান্দ্য এমনকি শ্বাস কষ্টও হতে পারে। শ্বাস নালীর অন্যান্য জটিল রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

প্রশ্ন ৫। চোখের সৌন্দর্য বাড়াবার জন্য যেসব প্রসাধনী লেপন করা হয় তাতে চোখের ক্ষতি হয় কি ?

এম. এ. ও ঃ আইল্যাশ ব্যবহারে ক্ষতি হতে পারে। ইরিটেশন হতে পারে। এর ফলে চোখ জ্বলে যায়। চোখ দিয়ে পানি বের হয়। সুতরাং ব্যবহার না করাই উচিত।

ফি. বে ঃ আমি মনে করি চোখে কোন প্রসাধনীই ব্যবহার করা উচিত নয়। কেননা এর সামান্যতম অংশও চোখে গেলে অবশ্যই চোখের ক্ষতি হবে। চোখে ইরিটেশন হয়।

এ. বাসেত ঃ অনেক ক্ষতি হতে পারে। আমি এগুলো ব্যবহার পছন্দ করি না। বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি করতে পারে। চোখের পাতায় একজিমা হতে পারে। এসব রোগী যদি সময়মত ডাক্তার বা চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের চিকিৎসা না নিলে মারাত্মক একজিমার শিকার হবেন।

অ. স. ঃ অনেক ক্ষেত্রেই চোখের প্রসাধনী বেশী ব্যবহারে এলার্জি জাতীয় রোগ দেখা দিতে পারে। কর্ণিয়াল আলসার জাতীয় রোগ, ইরিটেশন হতে পারে। চোখ লাল হওয়া চোখের লোমকূপ পুড়ে যাওয়া ইত্যাদি রোগ হতে পারে।

প্রশ্ন ৬। প্রসাধন ছাড়া যাদের রূপ খোলে না তাদের প্রতি আপনার উপদেশ ঃ

এম. এ. ও ঃ প্রসাধন ব্যবহারে রূপ খোলে এটা ভুল ধারণা। সাময়িকভাবে রূপ খোলে ঠিকই কিন্তু পরবর্তীতে বেশী প্রতিক্রিয়া হয়। প্রসাধন সীমিত পরিমাণ ব্যবহার করাই উচিত।

ফি. বে ঃ প্রসাধনী ছাড়া যাদের রূপ খোলে না তাদের প্রতি আমার উপদেশ ঃ প্রসাধনী ব্যবহার কমানো উচিত। অতিরিক্ত ব্যবহার করলে লাবণ্য, কমনীয়তার ঘাটতি দেখা দেয়। লিপস্টিক, কাজল, ফেস পাউডার ইত্যাদি ব্যবহারে মুখমণ্ডল নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া এগুলো ব্যবহার করতে গেলে অর্থের প্রয়োজন। আর এই অর্থ ব্যয়ই হলো অপচয়। অর্থনৈতিক অপচয় রোধে সীমিত প্রসাধনী ব্যবহার করুন। রূপ প্রকৃতিদত্ত। সুতরাং অপ্রয়োজনীয় প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করে তা নষ্ট করবেন না।

এ. বাসেত ঃ প্রসাধনীর ব্যবহার পরিত্যাগ করার চেষ্টা করা উচিত। সাধারণ পদ্ধতির চিকিৎসা করার প্রয়োজন।

তাছাড়া সবার জানা উচিত যে, প্রসাধনীর ব্যবহার অর্থের অপচয় ছাড়া কিছু নয়।

অ. স. ঃ প্রসাধনী ব্যবহার ত্যাগ করাই ভালো। প্রসাধনী ব্যবহার না করে নিজেদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখলেই রূপ খোলে। প্রসাধন ব্যবহার করলেই বরং চেহারা নষ্ট হয়ে যায়।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে ঃ মীর মুর্তজা আলী বাবু